# মানব ও বিশ্বজগৎ

হ্যারি এ কুলজিয়ান

মহাজগত, মানুষের ক্রমবিকাশ এবং তার ভবিষ্যৎ ধ্যানধারণা সম্পর্কে এক সুচিন্তিত চিত্তাকর্ষক আলোকপাত।

হ্যারী এ কুলজিয়ান

# মানব ও বিশ্বজগৎ

(গ্রন্থকারের "Universe and Man" এর বঙ্গানুবাদ)
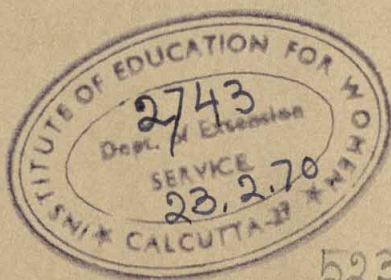
ফার্মা কে. এল্. মুখোপাধ্যায়
কলিকাতা : ১৯৬৬
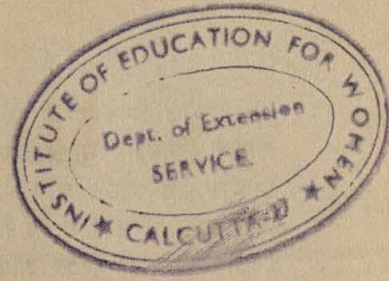
# মুখবন্ধ

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে বিশ্বজগত ও তার বিচিত্রজীবনপ্রবাহের রহস্য উন্মোচন করবার আকাঙ্খা অপরিসীম। এই মহাবিশ্বের কোনো দূরতম প্রান্তে নিজের একটি রূপকল্পের অনুসন্ধানে মানুষ সদাই সচেষ্ট। মহাজগতের বিরাট পরিবেশে মানুষের নিজের যথার্থ অবস্থান ঠিক কোথায়, তা নিয়ে আজকাল বহুতর তর্কের উদ্ভব হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানুষ একদিন জানতে পেরেছে, যে-পৃথিবীতে তার বাস, সেটি আদিকালে ছিলো জ্বলন্ত একটি অগ্নিপিণ্ড,—সেখানে জীবনের অবস্থিতি ছিলো অসম্ভব। তারপর লক্ষ লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সেই প্রজ্বলিত অগ্নিতরঙ্গ শীতল হয়েছে; পরে, একদিন কোনো এক আকস্মিক মুহূর্তে, এই পৃথিবীর মাটিতে নিতান্ত সরল প্রকৃতির জৈবপদার্থের আবির্ভাব ঘটেছে। ক্রমশঃ, মানুষ জানতে পেরেছে, আমাদের সৌরমণ্ডলের কাঠামোর মধ্যে আছে একটি সূর্য্য এবং নয়টি গ্রহ, আছে শত-শত ক্ষুদ্রতর বস্তুপিণ্ড যাদের নাম গ্রহাণুপুঞ্জ; আর আছে লক্ষ-কোটি উল্কা ও ধূমকেতু। মানুষ আরো জেনেছে, বিশ্বজগতের অগণিত নক্ষত্রের প্রত্যেকটি, আমাদের সূর্য্যের মতোই, ভান্তঃ প্রদেশে অবিরত তাপ বিকিরণ ক'রে চলেছে। আদিতে বিশ্বজগতের গঠন কেমন ছিলো, কীভাবে এই বিশ্বজগতের উৎপত্তি, এসব চিন্তায় মানুষের আগ্রহ সীমাহীন।

যদিও বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্বের বিষয়ে অনেক শতাব্দী ধ'রে বহুতর গ্রন্থ লিখিত হয়েছে, তবু উক্ত বিষয়ে কোনো কোনো প্রশ্নের আজো পর্য্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়নি। জীবনবিষয়ক মৌলিক ধারণাগুলি সম্পর্কে এবং বিশ্ব-প্রকৃতি, মানুষের নিজস্ব প্রকৃতি ও উভয়ের সম্পর্ক নিরূপনে মানুষের অসীম অধ্যবসায় সম্পর্কে আলোচনা করবার জন্যই বর্তমান গ্রন্থটির অবতারনা করা হয়েছে।

কীভাবে জীবনসহায়ক বায়ুমণ্ডলের উদ্ভব হলো আমাদের পৃথিবীতে, কীভাবে এখানে প্রথম আবির্ভাব হলো জীবনের, কোন্ পথে প্রাথমিক জৈবপদার্থের উৎপত্তি হলো সাগরে এবং কোন্ উপায়ে জলজাত সেই জীবন আশ্রয় খুজে পেলো স্থল-ভূমিতে, কোন্ বিবর্তনের পথে আদিকালের মানুষ বর্তমানকালের সুসভ্য মানবসমাজ গড়ে তুললো, আলোচ্য গ্রন্থে এ-ধরনের নানা প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। উপরন্তু, মানবসংস্কৃতির বিকাশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও বৈজ্ঞানিকদের শ্রেষ্ঠতম অবদানগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করবার চেষ্টা করা হয়েছে; আশা করা যায়, এতে ক'রে পাঠক আধুনিক জটিল পৃথিবী সম্পর্কে একটি সুসংহত ধারণা করতে পারবেন।

অতীত কোন্ কোন্ অবদানে বর্তমানকে ভূষিত করেছে, সেগুলি সম্যক জানতে পারলে আমরা নিশ্চিতভাবেই সুন্দরতর ভবিষ্যৎগঠনের প্রচেষ্টায় সমবেতভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারি। বর্তমান যুগের কারিগরি কর্মকাণ্ডের দ্রুত অগ্রগতি এবং সমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সংস্কৃতির ও বিভিন্ন আদর্শের মানুষের দ্রুত বৈপ্লবিক জাগরণ থেকে আজ সমগ্র মানবসমাজ একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে: যে ক্রমবর্ধমান জটিলতায় মানবিক সমস্যাগুলি ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, তার সন্তোষজনক সমাধানের চেষ্টায় সমগ্র বিশ্বের মানুষ সমবেত হতে পারলে সেই চ্যালেঞ্জের সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হবে।

আজ মানবসমাজের সামনে যেটি সবচেয়ে বড়ো সমস্যা, সেটি হচ্ছে জীবনাদর্শ পরিবর্তনের সমস্যা। যে প্রবল শক্তিগুলি আজ মানুষের করায়ত্ত হয়েছে বিজ্ঞানীদের নিরলস ও নিঃস্বার্থ সাধনায়, মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণের কাজে সেগুলির যথাযথ প্রয়োগের জন্য নতুনতর জীবনাদর্শ গঠনের প্রয়োজন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

মানবসমাজের অগ্রগতির প্রয়োজনে ধর্ম ও বিজ্ঞানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলা দরকার। তাদের নিজস্ব বৈপরীত্যগুলি মানিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। ধর্মের আদর্শের সংগে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান জ্ঞানভাণ্ডার যুক্ত হ'লে ক্রমশঃ মানুষ তার পূর্ণতার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। জগত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে পারলে এবং যে নিয়মগুলি জগতকে সামগ্রিকভাবে পরিচালিত করছে সেগুলি সঠিক নিরূপন করতে পারলে বর্তমান কালের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে সহজ হবে;—শান্তি ও শুভেচ্ছা-ঘেরা ভবিষ্যৎকে ত্বরান্বিত করবার অনুকূলে আমরা প্রয়োজনমতো আন্তর্জাতিক আইন ও সংগঠন গড়ে তুলতে পারবো।

যাঁরা বর্তমান গ্রন্থের প্রণয়নে নিঃস্বার্থ সহায়তা করেছেন, গ্রন্থটির প্রয়োজনীয় সমালোচনা করেছেন, এবং গ্রন্থটির উৎকর্ষবিধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি এই সুযোগে লেখক তাঁর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছেন। এই প্রসঙ্গে যাঁদের বিশেষ নামোল্লেখ প্রয়োজন, তাঁরা হচ্ছেন লেখকের আজীবন বন্ধু ও সহযোগী উইলিয়ম মেনসিং, পুজাণ্ট এইচ্ জেরিয়ান, হার্বার্ট অ্যাস্কুইথ্, ডক্টর ওয়াই এইচ্ কিউ এবং ডক্টর ধীরেন্দ্র মোহন দত্ত।

**হ্যারি এ কুর্লাজিয়ান**

আমার সহধর্মিনী

অ্যালিস এ কুলজিয়ানের করকমলে—
যাঁর নিরন্তর কৌতূহল এই গ্রন্থ রচনা
সম্ভব করেছে।

## সূচীপত্র


সৃষ্টিক্রম ... ... ... ... ১—৬

বিশ্বজগত ও সৌরজগত ... ... ... ... ৭—১৪

পৃথিবীতে জীবনের সূচনা ... ... ... ... ১৫—২৫

সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূচনা ... ... ২৬—৩৪

বিংশ শতাব্দী ... ... ... ... ৩৫—৫৭

শান্তি আনয়নে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ব্যর্থতা ... ... ৫৮—৬৪

উপসংহার ... ... ... ... ৬৫—১৩২

B. C.
$5\times10^9$
$1\times10^9$
$100\times10^6$
$10\times10^6$
$1\times10^6$
$100\times10^3$
$10\times10^3$
1,000
B. C. 100
A. D. 100
1,000
1964
A. D. 10,000
Hot Primordial Gas To Stars
Formation Of Elements Right At The Beginning
Atom
Surface Of the Earth Gradually Changed
From Molten To Hard Crust State
Water Collected In Depressions Of The Earth
Life Started In Sea
Life Migrated From Sea To Land, But Still Life In Sea.
Giant Plants Grew On Land
Coal Deposits Era
Giant Apes And Gorillas Grew On Land
Animals Grow Larger
Life In Sea
Life On Land
Primitive Man
Modern Man
Human Struggle And Developments
Primitive Man
Java Man
Chellian Man
Homo Erectus — Modern Man
Homo Sapiens — Fontechevade Thinking Man
Neanderthal Man — Used Tools
Cromagnon Man — Used Tools, Clothing, Hunting
Rhodesian Man
Amarican Indian — Old Stone Age
Middle Stone Age
Americas
Beginning Of Hebrew Religion
Forming — Writing — Egyptian Culture
Bronze Age — Farming Came To Europe — Indus Culture
Iron Age — Dark Age
Beginning Of Buddhist Religion
Medieval
Birth Of Christ And Christianity
Referred To Chart No. I
Beginning Of Islam Religion
Renaissance
Iudustrial Revolution
Atomic And Space Age
From Formation Of Stars And Planets To Life In Seas — Life On Land — Primitive Man — Modern Man — Civilization — Atomic Age— Space Age And ?
Nuclear Energy
Electric Energy
Space Technology

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## সূচনা

# সৃষ্টিক্রম

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের, অর্থাৎ চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রের মতো আকাশচারী বস্তুপুঞ্জের সৃষ্টি সম্পর্কে যে তত্ব, বা প্রকল্প, অথবা দূরকল্পনা, তাকেই বলা হয় সৃষ্টিক্রম (Cosmogony)। প্রাচীনতম কাল থেকেই মানুষের মনে এসব দূরকল্পনার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল।

আদিমকাল থেকে মানুষ বিস্মিত মনে ভেবে এসেছে, এসব গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি হলো কেমন ক'রে। কোন্ পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে এরা আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেচে? তারা এ-ও ভেবেছে, যখন আকাশে ছিল না একটিও নক্ষত্র, তখন এই বিশ্বব্রহ্মণ্ডের চেহারাটা ছিল কেমন? সেকি অসার, অন্ধকার আর ঠাণ্ডা? এই বিরাট আকাশে আদৌ কিছু কি ছিল? যদি থাকে, তো কেমন ভাবে ছিল,—টুক্‌রো টুক্‌রো বস্তুর পুঞ্জ, না বৃহৎ বস্তুর সমষ্টি? নিশ্চল, না চলমান? এজগত সসীম, না অসীম? যদি সসীম হয় তো কেন সসীম, অসীম হলেই বা, কেন? এসব প্রশ্নের সঠিক আর নির্দিষ্ট উত্তর নেই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে, অনেক যত্নে যে-সব তত্ব আবিস্কার করা হয়েছে, তাদেরই মাধ্যমে উত্তর পাবার রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে।

খৃষ্টজন্মের ছ'শো বছর আগেই সৃষ্টিক্রম কাব্য ও অতীন্দ্রিয়বাদের জগত থেকে বিচ্যুত হ'য়ে মিলেটাস্ প্রদেশের থেল্‌স্-এর (Thales of Miletus) মতো চিন্তা-নায়ক ও দার্শনিকদের রীতিবদ্ধ চিন্তার জগতে আশ্রয় নিয়েছিল। থেল্‌স্ প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, এজগতে জলই হলো একমাত্র মৌলিক বস্তু। আর সবই জলের উপাদান থেকে তৈরি। পরবর্তী যুগে, এম্‌পেডোক্‌লিস্ (Empedocles) ও অন্যান্য দার্শনিকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, সকল বস্তুর মূল উপকরণ হ'লো চারটি চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর মৌলিক পদার্থ—ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ। এদের বিভিন্ন অনুপাতের সমন্বয়ে আর সব বস্তুর সৃষ্টি। এই মত

অনুসারে, আকাশের যত চন্দ্র সূর্য তারা, মাটির যত প্রাণী ও উদ্ভিদ্, এই চারটি পরম ও জড় পদার্থ থেকে উদ্ভূত। আর, প্রকৃতির মধ্যে যত কিছু ক্রিয়াশীলতা আছে, সেগুলির উদ্ভব হয়েছে প্রাকৃতিক বস্তুপুঞ্জের মধ্যে নিহিত কতকগুলি সহজাত আসক্তি থেকে—যেমন, উষ্ণতা মিলন চায় শীতলতার, শুষ্কতা চায় আর্দ্রতার, কোমলতা কঠিনতার।

বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার এই হ'ল সূত্রপাত। যদিও এগুলি স্থূলতাদোষে দোষী, কিন্তু বর্তমান যুগের উন্নতধরনের প্রকল্পের এরাই হ'ল অগ্রদূত। এতকালপর্যন্ত সৃষ্টিক্রম একান্তভাবেই দার্শনিক দূরকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সংগে তার কোনো যোগাযোগই ছিল না।

বিজ্ঞানের নবদিগন্তের উন্মেষ হ'ল আইজাক নিউটন-এর কাল থেকে (Isaac Newton, 1642—1727)। তাঁর আগে বৈজ্ঞানিক তথ্যের চেয়ে দার্শনিকসুলভ চিন্তাই ছিল নানা প্রকল্প সৃষ্টির প্রেরণা। নিউটনই প্রথম প্রচার করলেন,—প্রকৃতির সকল নিয়মই বিশ্বজনীন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে-সব বলের প্রকাশ দেখতে পাই, সমগ্র প্রকৃতি জুড়ে সেগুলি ক্রিয়াশীল। যে বল আপেলকে মাটির দিকে আকর্ষণ করছে, সেই বলই গ্রহগুলিকে ধরে রেখেছে তাদের কক্ষপথে মহাজগতের সৃষ্টির মূলেও রয়েছে সেই একই বল। ১৬৯২ খৃষ্টাব্দে, ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক রিচার্ড বেন্ট্‌লিকে আইজাক নিউটন যে পত্রটি লিখেছিলেন, তাতে বিশ্বজগতের গঠনে অভিকর্ষজ বলের ক্রিয়া সম্পর্কে তাঁর ধারনাটি জানতে পারা যায়।

**নিউটনের পত্রের বয়ানটি নিম্নরূপঃ—**

"আমার মনে হয়, যদি সূর্যের, গ্রহপুঞ্জের এবং জগতের অন্যত্র অবস্থিত সমস্ত বস্তু সমগ্র আকাশ জুড়ে সমভাবে সর্বত্র ছড়ানো থাকে, যদি প্রত্যেকটি বস্তুর অপর প্রত্যেক বস্তুর প্রতি অভিকর্ষজ আকর্ষণ থাকে, যে স্থানে বস্তু সমভাবে ছড়ানো রয়েছে সে স্থানটি যদি সীমাবদ্ধ হয়, তবে আকাশের এই অংশের বাইরের সমস্ত বস্তুই ভিতরের বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হবে; এবং এইভাবেই গড়ে উঠবে বস্তুর এক বিরাট গোলক।

কিন্তু বস্তু-সমাচ্ছন্ন এই আকাশ যদি অসীম হয়, তবে বস্তুপুঞ্জ গোলকে একীভূত হতে পারে না। কোনো কোনো বস্তু একটি গোলক সৃষ্টি করবে, আবার অন্য কোনো কোনো বস্তু গড়ে তুলবে আরেকটি গোলক। এইভাবে অসীম আকাশ জুড়ে বহু দূর দূর অবস্থানে গড়ে উঠবে অসংখ্য গোলক। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের সৃষ্টি হতে পারে এইভাবেই।

দুই বিষয়ে নিউটনের সংগে মতৈক্য হয়েছিল ইমানুয়েল কাণ্ট-এর (Immanuel Kant, 1724—1804)। প্রথমতঃ, উভয়ের মত ছিল এইযে, এক আদি বস্তু থেকে সমস্ত আকাশচারী বস্তুর উদ্ভব হয়েছে এবং দ্বিতীয়তঃ এই গঠনকার্যের মূলে ক্রিয়াশীল ছিল অভিকর্ষ বল। তিনি কল্পনা করেছিলেন, মহাকর্ষ বলের আকর্ষণে বিভিন্ন অনু পরস্পরের নিকটবর্তী হয়েছে, এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত

হয়েছে। তাদের গতিশীলতা থেকে উদ্ভূত শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়ে তাদের গতিশীলতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে, তাদের সংঘর্ষের মাত্রাও গেছে বেড়ে। আর, এইভাবেই সুরু হয়েছে আদি বস্তুর নীহারিকার আবর্তন। ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধি পাবার সংগে সংগে তপ্ত বস্তুপুঞ্জ আদি বস্তুপিণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রহগুলির সৃষ্টি করেছে। সুতরাং, সূর্য্য নিজেই সেই সব গ্রহগুলির সৃষ্টির উৎস, যারা সূর্য্যের চারপাশে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরছে।

ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী লাপ্‌লাস্‌-এর (Laplace, 1749-1827) মতবাদের গোড়াতেও ছিল আদিবস্তুর নীহারিকার কল্পনা। তাঁর মতানুসারে, আদিবস্তু থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শক্তির বিকিরণ ঘটছে। শক্তির বিকিরণের সংগে সংগে নীহারিকা শীতল হয়ে যাচ্ছে, আর তার আয়তনও কমে আসছে। আয়তন যতই হ্রাস পাচ্ছে, নিজের অক্ষে নীহারিকার ঘূর্ণনের বেগ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঘূর্ণনের বেগ বৃদ্ধির মূলে রয়েছে প্রকৃতির এক অলংঘ্য নিয়ম-কৌণিক ভরবেগের নিত্যতা (Principle of Conservation of angular Momentum)। ক্রমবর্দ্ধমান ঘূর্ণন-বেগের জন্য ঘূর্ণ্যমান বস্তু, তরল কিংবা বায়বীয় যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার গোলাকার আকৃতি আর বজায় রাখতে পারে না। ফলে, নিরক্ষ অঞ্চল স্ফীত ও মেরুঅঞ্চল দু'টি ক্রমশ চাপা হতে থাকে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণই চলে, যতক্ষণ-না নীহারিকা এক সংকটাবস্থায় এসে উপনীত হয়। ঘূর্ণনের ফলে, নিরক্ষ অঞ্চলে সৃষ্টি হয় কেন্দ্রাতিগ বলের। এই বল বস্তুপুঞ্জকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়। অপর পক্ষে, অভিকর্ষ বল কেন্দ্রের দিকে বস্তুপুঞ্জকে ক্রমাগতই আকর্ষণ করতে থাকে। সংকটাবস্থায় এই দুই বল সম পরিমাণে কাজ করে। ফলে, ক্রমসংকুচিত নীহারিকা থেকে প্রথমে নিরক্ষীয় বলয়ের এবং ক্রমশ অন্যান্য ক্ষুদ্রতর বলয়গুলির সৃষ্টি হ'তে থাকে। প্রত্যেকটি বলয় ক্রমশ সঙ্কুচিত হ'তে হ'তে গ্যাসীয় গোলকে রূপান্তরিত হয়। আবার, গ্যাসীয় গোলকগুলিও ক্রমসংকোচনের ফলে গ্রহরূপ পরিগ্রহ করবার সময় উপগ্রহগুলির সৃষ্টি হয়।

সৌরলোকের সৃষ্টি সম্পর্কে আরেকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। এই মতবাদ অনুযায়ী, আমাদের সূর্য্যের শৈশবকালে, কোনো এক সময়ে আরেকটি নক্ষত্র সূর্য্যের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। ফলে, এই নক্ষত্রের মহাকর্ষ বল সূর্য্য থেকে এক বিরাট বস্তুর অংশ বিচ্ছিন্ন ক'রে দেয়। বিচ্ছিন্ন বস্তুর অংশ থেকে উৎপন্ন হয় সূর্য্যপ্রদক্ষিণ-রত এক সর্পিল নীহারিকা। এই নীহারিকাময় বস্তুই ক্রমশ সংবদ্ধ হ'য়ে আমাদের বর্তমান গ্রহাবস্থানের সৃষ্টি করেছে।

### ক্রমবর্দ্ধমান জগত

আমাদের সৌরজগতের মতো অসংখ্য সৌরজগত এই মহাশূন্যে ভাসমান। সাম্প্রতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্য্যবেক্ষণের থেকে দেখা যায়, এই সমস্ত সৌরজগত-গুলি ক্রমশ পরস্পরের থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে,—অর্থাৎ মহাবিশ্ব ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সাম্প্রতিক পর্য্যবেক্ষণগুলি সৃষ্টিক্রমের কল্পনায় এক নতুন উদ্দীপনা বহন ক'রে এনেছে। ফলে, কতকগুলি চিত্তাকর্ষক ও মূল্যবান্‌ প্রকল্পের সৃষ্টি হয়েছে।

ফরাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী আবে লেমায়েতার (Abbé Lemaître) এক অদ্ভুত প্রকল্পের নির্দেশ করলেন। তাঁর মতে, মহাজগতের সৃষ্টির উৎস হ'ল এক অতিকায় আদি পরমানু। এই আদি পরমানুর বিস্ফোরণ থেকে সৃষ্টিকার্য্য সুরু হয়েছে। মহাজগতের যে প্রসারণ আজও আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তার মূলে রয়েছে সেই বিস্ফোরণ।

কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জর্জ গ্যামো (George Gamow)-ও অনুরূপ এক মতবাদের স্রষ্টা। তাঁর মতে, বিশ্বজগতের নিউক্লিয়াস ছিল কোনো এক অকল্পনীয় তাপমাত্রায় ফুটন্ত, আদি বাষ্পের এক ভয়ংকর জগত। (সূর্য্যের উপরিতলের তাপমাত্রা ৫৫০০° সেণ্টিগ্রেড। অভ্যন্তরে এই তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে কেন্দ্রের কাছে প্রায় ৪০,০০০,০০০° সেন্টিগ্রেডে পেঁছেচে।) এই প্রচণ্ড তাপে অনু বা পরমানু কিংবা যে কোনো মৌলিক পদার্থের অস্তিত্বই অসম্ভব। কেবলমাত্র, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এক অতিবিশৃংখল চঞ্চল অবস্থায় বর্তমান থাকতে পারে। যখন মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জ প্রসারিত হতে সুরু ক'রলো, তাপমাত্রাও ক্রমশ হ্রাস পেতে লাগলো। তখন, এই নিউট্রন ও প্রোটন একত্রীভূত হ'ল বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জে। একত্রীভূত বস্তুপুঞ্জ থেকে নির্গত ইলেক্ট্রন কণাগুলি নিউক্লিয়াসের চারপাশেই আবদ্ধ রইলো। পরমানুর জন্ম হ'লো। আর, অতি অল্পকালের মধ্যেই সৃষ্টি হলো মহাবিশ্বের যাবতীয় মৌলিক পদার্থের।

ডঃ আর. সি. টলম্যান্ (Dr. R. C. Tolman) বিশ্বের প্রসারণ সম্পর্কে এক মর্মান্তিক ধারণা পোষণ করেন। তাঁর মতে, মহাজগতের এই প্রসারণ নিতান্তই সাময়িক। যথাকালে, আবার সংকোচণ সুরু হবে। শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই বিশ্ব-জগত সম্পর্কে এক পর্য্যায়বৃত্ত অবস্থার ধারণার পরিচয় পাওয়া গেল। সমগ্র মহাকালব্যাপী মহাজগতের সংকোচণ ও প্রসারণ চলছে পর্য্যায়বৃত্ত ভাবে। মহাজগতের স্থানে স্থানে বস্তুপুঞ্জের অবস্থানের বৈষম্যই এই চক্রাকার পরিবর্তনের মূলে কাজ করছে। এই ধারণা বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আইন্ষ্টাইন্-এর (A. Einstein) মতবাদের অনুবর্তী। আইনষ্টাইনের মতে মহাশূন্যের বক্রতা তার আভ্যন্তরীন বস্তুর উপর নির্ভরশীল। যাই হোক্, টলম্যানের মতবাদ প্রশ্নসাপেক্ষ এক প্রকল্পের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকল্প অনুসারে মেনে নিতে হয় যে, বিশ্বের কোথাও নতুন বস্তুর জন্ম হচ্ছে। সম্ভবতঃ, এই সমস্যাই টলম্যানের মনে বিশ্ববিলুপ্তিতত্ত্বের কল্পনা এনে দিয়েছে। টলম্যান মনে করেন যে, যদিও মহাজগতের বস্তুসমষ্টির মধ্যে এক অবিরত পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে, কিন্তু সকল পরিবর্তনই ঘটছে একটি নির্দিষ্ট দিকে—সে হ'লো মহাবিলুপ্তির পথ। সূর্য্য ধীরে ধীরে বিকিরণের মধ্যে দিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। নক্ষত্রপুঞ্জ রূপান্তরিত হচ্ছে অংগারে। বিশ্বজগতের সর্বত্রই তাপশক্তি নিঃশেষের পথে। বস্তুর পরিণতি ক্রমবিলয়ে, শক্তি মহাশূণ্যে বিলীয়মান। এই প্রদাহপ্রক্রিয়ার অবশেষে কোটি কোটি যুগের পর কোনো এক দূরতম ভবিষ্যতে, প্রকৃতির সমস্ত বিক্রিয়াই বন্ধ হয়ে যাবে। সারা বিশ্ব জুড়ে বিরাজ করবে সম উষ্ণতা। কোথাও শক্তির প্রাধান্য থাকবে না, কারণ মহাশূন্যের সর্বত্রই তখন শক্তির সমান আধিপত্য। কোথাও নেই আলো কিংবা উত্তাপ, নেই জীবনের চিহ্নমাত্র। সারাবিশ্বে কেবলমাত্র চিরন্তন এক অপরিবর্তনীয় বন্ধ্যাত্ব।

**পুনর্গঠনের পথে বিশ্বজগত?**

বিমোচন তত্ব (Unwinding theory) নামে একটি নতুন মতবাদের স্রষ্টা আর একদল বৈজ্ঞানিক। তাঁরা বলেন, মানুষের এই সীমিত ক্ষুদ্র জগতের বাইরে বিশ্বের নবরূপায়ন হচ্ছে। কোথায়, কেমনভাবে এই নবরূপায়ন সম্ভব হচ্ছে, তা এখনো অনুমানের বাইরে। আইনষ্টাইন তাঁর আপেক্ষিকতাবাদে বলেছেন, শক্তি আর বস্তু পরস্পর সমতুল্য। এই সমতুল্যতার নীতির আলোকে এঁরা অনুমান করছেন যে, মহাশূন্যে যে-শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সেই শক্তির রূপান্তরেই আবার ইলেক্‌ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন প্রভৃতি বস্তুকণার জন্ম। এই বস্তুকণাগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে গঠন করছে বস্তুপুঞ্জ। মহাকর্ষের প্রভাবে এই পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর সম্মিলনে গড়ে উঠছে নতুন নতুন নীহারিকা ও নক্ষত্রজগত; এবং পরিশেষে, নতুন নতুন ছায়াপথ। আবার প্রোটন ও বস্তুর সংগে বিক্রিয়ার ফলে জোড়ায় জোড়ায় ইলেক্‌ট্রন ও প্রোটন সৃষ্টি হচ্ছে, বিকীর্ণ হচ্ছে উচ্চশক্তিসম্পন্ন গামারশ্মি। এইভাবে, বস্তু থেকে শক্তির এবং শক্তি থেকে বস্তুর রূপান্তর চলছে নিরন্তর। সম্প্রতি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করেছেন যে, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বন, প্রভৃতি যে সকল মৌলিক পদার্থের পরমানু আকাশে ইতস্তত সঞ্চরমান, তারা ধীরে ধীরে অনু এবং অতিক্ষুদ্র বস্তুকণায় গ্রথিত হয়ে গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। সুতরাং সুরুতে যা ছিল, সেই অবস্থাই পুনরাবর্তিত হয়ে ফিরে ফিরে আসবে। এইভাবেই হয়তো মহাজগতের জীবনচক্র আবর্তিত হ'তে থাকবে চিরকাল।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ ফ্রেড এল্‌ হুইপ্‌ল্‌ (Dr. Fred L. Whipple) ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে 'Dust Cloud Hypothesis' নামে একটি নতুন প্রকল্প রচনা করেন। এই প্রকল্পে তিনি বলেন, মহাজাগতিক যে অতিলঘু বস্তুকণা বিরাট ভান্তঃপ্রদেশে ভাসমান, তাদের পরিমাণ বিশ্বজগতের সমগ্র দৃশ্যমান বস্তুর ভরের সমান। সুতরাং, ভাসমান বস্তুকণা কোটি কোটি যুগ ধ'রে ঘনীভূত ও গ্রথিত হয়ে নতুন নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করতে পারে।

শূন্যে ভাসমান যাবতীয় বস্তুকণার উপর সর্বদাই নক্ষত্রালোকের ক্ষীণ চাপ রয়েছে। সেই চাপের প্রভাবে বস্তুকণাগুলি পরস্পরসংবদ্ধ হ'তে পারে। অসংখ্য কণার সম্মিলনে পুঞ্জের উদ্ভব, পুঞ্জ থেকে মেঘখণ্ড, মেঘখণ্ড থেকে বিরাট মেঘ। এই মেঘ বিরাটকায় ধারণ করলে, তার ভর আর ঘনত্ব এমন একটি রূপ নেবে যাতে ক'রে নতুনভাবে ভৌতিক প্রক্রিয়াগুলি কার্যকর হবে। অভিকর্ষের ফলে মেঘ সংকুচিত হবে, সংকোচনের ফলে আভ্যন্তরীন চাপ ও উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে, পরিশেষে, সংকোচনের শেষ পর্য্যায়ে এমন এক প্রচণ্ড তাপের উদ্ভব হবে, যাতে সাদা আলোর সৃষ্টি হয়। তখন সেই পুরাণো মেঘখণ্ডই নক্ষত্রের মতো শক্তি বিকীর্ণ করবে। আমাদের সৌরজগতও হয়তো, একটি বিশেষ অবস্থায় অনুরূপ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আজকের অবস্থায় এসে পেঁাছেচে। হয়তো সূর্য্য ছিল অনুরূপ একটি নক্ষত্র। প্রধান মেঘ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং প্রধান মেঘের চতুষ্পার্শে ঘূর্ণ্যমান ছিল যে মেঘখণ্ড, তা ক্রমশ সংকুচিত ও শীতল হয়ে গেছে। সূর্য্যের চতুষ্পার্শে সতত সঞ্চরমান গ্রহগুলি হয়তো সেই মেঘখণ্ড থেকেই উপজাত।

বিশ্ববিখ্যাত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকের ধারণায় নানা ধরনের সৃষ্টিক্রম তত্ত্বের আবির্ভাব হয়েছে। সৃষ্টিক্রম সম্পর্কে জটিলতম ও দুরূহতম প্রশ্নের পরে বিজ্ঞান কী কী ইঙ্গিত করেছে, ঐ সব তত্ত্বগুলির আলোকে তার সম্পর্কে একটি উত্তম ধারণার অধিকারী হ'তে পারা যায়। বিশ্বজগতের গোড়াপত্তন কীভাবে হলো? বিজ্ঞান-বোধের উন্মেষের প্রথম যুগে যে সব তত্ত্ব আবিস্কৃত হয়েছিল, তা-থেকে এ-ধারণা সঙ্গতভাবেই করা যেতে পারে যে, মহাকাশের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে এ-বিশ্বের সৃষ্টি হয়। কোনোরকমভাবে, কোনো এক সময়ে, মহাজাগতিক প্রক্রিয়াগুলি কার্যকর হয়েছিল, ভান্তঃপ্রদেশে অগ্নিসংযোগ ঘটেছিল, বিরাটকায় এই বিশ্বজগত ক্রিয়াশীল হয়েছিল।

বিশ্বজগতের মধ্যে অবস্থিত বস্তুপুঞ্জ সম্পর্কে এ-সব তত্ত্ব ও ধারণা আয়ত্ত করতে পারলে আমরা সহজেই বুঝতে পারবো যে, এসব তত্ত্বের সংগে প্রজননবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলির কোনো বিরোধ নেই। কীভাবে জীবনের উৎপত্তি হলো আমাদের জগতে, মানুষের কৌতূহল এ-সম্পর্কে অপরিসীম। প্রজননবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি কোনো বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে এ-কৌতূহল চরিতার্থ করতে প্রবৃত্ত হয়নি। তা যদি হতো, তবে এই তত্ত্বগুলি এতই চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠতো যে, প্রজননবিজ্ঞানে নিহিত অধ্যাত্ম-বাণীর সকল গুরুত্ব হারিয়ে যেতো আমাদের মনে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# বিশ্বজগত ও সৌরজগত

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে আছে লক্ষ লক্ষ নাক্ষত্রজগত। ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির অসংখ্য নক্ষত্র নিয়ে এক একটি নাক্ষত্রজগত। আবার, উজ্জ্বলতাও সব নক্ষত্রের সমান নয়। প্রত্যেক নাক্ষত্রজগতের অধিকাংশ নক্ষত্রই এক একটি অক্ষের চারপাশে পাক খেতে খেতে কুণ্ডলীচক্রের মতো পাকানো আকৃতি ধারণ করেছে। এই বিরাট নাক্ষত্রজগত-গুলিও একা নেই। তারা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে আলাদা আলাদা মণ্ডলীর সৃষ্টি করেছে।

রাত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে যে তারাগুলি চোখে পড়ছে, তাদের দূরত্ব সমস্ত সাধারণ হিসাবেরই বাইরে। তাদের গা থেকে যে আলো আমাদের চোখে এসে পড়ছে, হয়তো আমাদের জন্মের অনেক বছর আগেই নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পৃথিবীর দিকে সে আলোর যাত্রা সুরু হয়েছে। আলোর গতি প্রতিসেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৯৩,০০০,০০০ মাইল। এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম ক'রে পৃথিবীতে এসে সূর্যের আলোর পৌঁছাতে সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট। এক বছরে আলো ৬,০০০,০০০, ০০০,০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে। এই বিরাট দূরত্বকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নাম দিয়েছেন এক আলোকবর্ষ (Light Year)। ভান্তঃপ্রদেশের নানাস্থানের প্রায় অসীম দূরত্ব মাপতে তাঁরা এই সংখ্যা-সংকেতকে একক হিসাবে ব্যবহার করেন। আলতেয়ার (Altair) নামে যে উজ্জ্বল তারাটি আকাশে আছে, তার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ষোলো আলোকবর্ষ, ভেগার (Vega) দূরত্ব ছাব্বিশ, আর দেনেব (Deneb)-এর দূরত্ব প্রায় ষোলোশো আলোকবর্ষ।

আমাদের সৌরজগত যে নাক্ষত্রজগতের অন্তর্ভুক্ত, তাকে আমরা নাম দিয়েছি ছায়াপথ (Milky way)। এই ছায়াপথে ভাসমান নক্ষত্রের সংখ্যা প্রায় একহাজার কোটি। এই বহু কোটি ভাসমান নক্ষত্রের ছায়াপথটি দ্রুতবেগে আবর্তিত হচ্ছে। আবার, যে মণ্ডলীবদ্ধ নাক্ষাত্রজগতের অন্তর্গত এই ছায়াপথ সেখানে ঊনিশটি নাক্ষত্রজগতের সমাবেশ ঘটেছে। এই ছায়াপথের ব্যাস কমবেশি একশো হাজার

আলোকবর্ষ। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে আমাদের সৌরজগতের অবস্থান প্রায় সাতাশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আগে পর্য্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল, নক্ষত্রের ফাঁকে ফাঁকে আকাশপ্রদেশ একেবারেই বস্তুহীন। এখন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণার মতো বস্তুর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ সারা আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত রয়েছে। এই মেঘপুঞ্জ শতকরা প্রায় আশি ভাগ হাইড্রোজেন, কুড়ি ভাগ হিলিয়াম, আর অতি সামান্য অংশ ভারী মৌলিক পদার্থ দিয়ে তৈরি ব'লে অনুমান করা হয়েছে। দেখা গেছে, নক্ষত্রের উপাদানে হাইড্রোজেনের চেয়ে হিলিয়ামের পরিমাণ বেশি। কারণ, নাক্ষত্রজগতের অধিকাংশ হাইড্রোজেনই রূপান্তরিত হচ্ছে হিলিয়াম-এ। আর, এই রূপান্তরের মধ্যেই তাদের অমিত আলোক ও তাপশক্তির উদ্ভব। পদার্থের রূপান্তরের এই জ্ঞান, নক্ষত্রের ক্রমবিবর্তনের প্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের মনে এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়েছে। আমাদের নিজস্ব জগতে নক্ষত্রপুঞ্জের যে ঘটনাবলী আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সেগুলি অনুধাবণ করতেও অনেক পরিমাণে সহায়তা করছে। হাইড্রোজেনের এইভাবে হিলিয়াম-এ রূপান্তরের ফলেই, কখনও কখনও, কোনো নক্ষত্রের সমস্ত হাইড্রোজেন নিঃশেষ হয়ে আসে। আর, এই রূপান্তর থেকে উদ্ভূত অমিত তেজের জন্য সেই নক্ষত্রে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের সংগে সংগেই দেখা দেয় দ্রুতসম্প্রসারণ—যার ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই তাপমাত্রা হ্রাস পায়, এবং দ্রুতহারে সংকুচিত হ'তে থাকে নক্ষত্রের বস্তুপিণ্ড। আর, এইভাবেই সাদা রংএর একটি হ্রস্বতর নক্ষত্রের জন্ম হয়। এই সব সংকুচিত নক্ষত্রের মধ্যে জড়বস্তু খুব জমাট বেঁধে থাকে। এদের যেকোনো একটি তারা থেকে একঘনমিটার বস্তু তুলে নিয়ে ওজন করলে দেখা যাবে, ওজন প্রায় ১০,০০০ টন দাঁড়িয়েছে।

আমাদের সূর্য্য আকৃতি ও উজ্জ্বলতায় নিতান্তই মধ্যমরকমের একটি নক্ষত্র। এমন অনেক নক্ষত্র আছে যারা সূর্য্যের চেয়ে ৬০০,০০০ গুণ বেশি উজ্জ্বল। পৃথিবী থেকে সূর্য্য প্রায় ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে। আর, সূর্য্যই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র। সূর্য্যকে বাদ দিলে যেটি পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র, তার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ২৬,০০০,০০০,০০০,০০০ মাইল, অর্থাৎ ৪.৩ আলোকবর্ষ। আকাশের দৃষ্টিগোচর তারাগুলির মধ্যে যেটি উজ্জ্বলতম, তার নাম সিরিয়ুস (Serius)। তার দূরত্ব ৮.৭ আলোকবর্ষ।

অন্যান্য নক্ষত্রেরা আমাদের কাছ থেকে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। অধিকাংশ নক্ষত্রই এতদূরে রয়েছে যে, সাধারণভাবে তাদের আকৃতির কোনো পরিমাপ করাই সম্ভব নয়। আধুনিকতম যে-সব পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে, তাদের সাহায্যে এদের আয়তনের একটা মোটামুটি হিসাব করা যায়। এই পদ্ধতিগুলির সাহায্যে জানা গেছে, এই সব নক্ষত্রের আয়তনের তারতম্য অনেক। লালরংএর অতিকায় যেসব নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, আমাদের জ্ঞানরাজ্যে তারাই বৃহত্তম নক্ষত্র ব'লে পরিচিত। বৃশ্চিক রাশির (Constellation Scorpius) অন্তর্গত এমন একটি নক্ষত্র হ'লো আন্তারীজ (Antares)। এর ব্যাস ৩৯০,০০০,০০০ মাইল। আমাদের সৌরজগতের একটি বিরাট অংশ এই অতিকায় নক্ষত্রটির গহ্বরে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে।

সকল নক্ষত্রই আকাশপথে দ্রুতসঞ্চরণশীল। আমাদের সূর্য্য প্রতি সেকেণ্ডে ১২ মাইল বেগে ছুটে চলেছে একটি বিশেষ তারামণ্ডলের উদ্দেশে। এই তারা-মণ্ডলটির নাম হারকিউলিস (Constellation Hercules)। অন্যান্য নক্ষত্রেরাও ছুটে চলেছে বিভিন্ন বেগে, কোনো কোনোটি সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মাইল। আর্কটারাস (Arcturus) নামে নক্ষত্রটির গতি অতিদ্রুত,—সেকেণ্ডে প্রায় ৮৪ মাইল। কোনো কোনো নক্ষত্র আবার বিভিন্ন নক্ষত্রপুঞ্জের সংগে মণ্ডলীবদ্ধ ভাবে ছুটে চলেছে।

পৃথিবীথেকে যেসব নক্ষত্রকে একই রাশির অন্তর্ভূক্ত বলে মনে হয়, তারা সব একপরিবারভূক্ত না-ও হতে পারে। হয়তো, পৃথিবীথেকে তাদের দূরত্বের তারতম্য অসীম। হয়তো তারা, কেউ কেউ, বিভিন্ন দিকে ছুটে চলেছে বিভিন্ন গতিতে। তাদের আপেক্ষিক গতিবেগের সাহায্যে পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব নির্ণয় করাও সম্ভব হচ্ছে না।

**নক্ষত্রমণ্ডলে ঘটনার বৈচিত্র্য**

নীলাভ সাদা থেকে সুরু ক'রে অনুজ্জ্বল লাল, এই রকম নানা রং-এর তারা আকাশে দেখতে পাওয়া যায়। রংএর মধ্যেই থাকে নক্ষত্রের উষ্ণতার আভাস। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলির যে উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে, তা হলো নক্ষত্রের আপাত উজ্জ্বলতা। এই আপাত উজ্জ্বলতার সংকেতে চিনে নিতে হয়, কোন্ নক্ষত্র কত উজ্জ্বল। নক্ষত্রের আপাত উজ্জ্বলতা নির্ভর ক'রে দুটি জিনিসের উপর। প্রথমতঃ, নক্ষত্রের নিজস্ব উজ্জ্বলতা, বলা যেতে পারে তার চরম উজ্জ্বলতা। দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব। এই আপাত উজ্জ্বলতার ভিত্তিতে নক্ষত্রমণ্ডলীকে বিভিন্ন পংক্তিতে সারবদ্ধ করা হয়েছে। সাধারণভাবে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর নক্ষত্রেরাই কেবলমাত্র খালি চোখে দৃষ্টিগোচর হয়।

বর্ণালিপির বিশেষত্ব অনুযায়ী নক্ষত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেক জ্বলন্ত মৌলিক পদার্থেরই পরিচয় তার স্বকীয় রং-এ। এই রং-এর স্বকীয়তা ধরা যায় বর্ণালিপিযন্ত্রে (Spectroscope)। নক্ষত্রের যে আলো বর্ণালিপি যন্ত্রে ধরা পড়ে, তার সাহায্যে নক্ষত্রপুঞ্জের গঠনপ্রকৃতি এবং তাদের উপরিতলের তাপমাত্রা নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন অক্ষরের সাহায্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্রগুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। ইংরাজি O এবং B অক্ষরের দ্বারা খুব উত্তপ্ত ও নীল রংএর নক্ষত্রগুলিকে সূচিত করা হয়। অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত সাদা রং-এর নক্ষত্রগুলির জন্যে A অক্ষরের সংকেত। F এবং G অক্ষর দ্বারা সূচিত নক্ষত্রের রং হল্‌দে, সূর্য্যের তুলনায় যাদের উষ্ণতা হল মাঝারি রকমের। সূর্য্যের চেয়েও কম উষ্ণ কমলা রং-এর নক্ষত্র হলো K-অক্ষর চিহ্নিত। লাল রং-এর নক্ষত্রগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে M অক্ষরটি দিয়ে, আর সব নক্ষত্রের তুলনায় এরা অপেক্ষাকৃত শীতল।

আমাদের পরিচিত নক্ষত্রগুলির মধ্যে একতৃতীয়াংশেরও অধিক হলো যুগ্ম নক্ষত্র, এরা জোড়ায় জোড়ায় পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের কোনো কোনোটি খালি চোখেই দেখা যায়, কোনো কোনোটি দূরবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে। আর, বাকি হাজার হাজার নক্ষত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ে বর্ণালিপিযন্ত্রে। যদি যুগ্মনক্ষত্রের একটি

অপরটির পিছনে থাকে, তবে তাদের বর্ণালিপিও একাকার হয়ে যায়। যখন ঘুরতে ঘুরতে কোনো একটি নক্ষত্র আমাদের দিকে এগিয়ে আসে, আর তার জুড়িটি দূরে সরে যায়, তখন একটি অপরটিকে আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল ক'রে দেয়। ফলে, নক্ষত্রদুটির উজ্জ্বলতা যায় কমে। নক্ষত্রদুটির মধ্যে সাধারণত ব্যবধান থাকে প্রায় কোটি কোটি মাইল।

বর্ণালিপি যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের বয়সের একটা মোটামুটি হিসাব পাওয়া যায়। অতিপরমানবিক তাপবিক্রিয়ায় (Thermonuclear reaction) নক্ষত্রের অভ্যন্তরে নিরন্তর জড়বস্তুর রূপান্তর ঘটছে তেজের কিরণে। যে উষ্ণতায় এই বিক্রিয়া চলছে, তার সাহায্যে নক্ষত্রজীবনের ব্যাপ্তি সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা নিঃসংশয়ে হিসাব করতে পারেন। যেসব নক্ষত্র এখন আকাশে দৃশ্যমান, বিজ্ঞানীদের হিসাবে এদের অধিকাংশের বয়সই মোটামুটি ৫০০ কোটি বছর। ভূপদার্থবিদ্‌রা ইউরেনিয়ামের তেজবিকিরণের হার থেকে পৃথিবীর বয়সের একটা ধারণা করেছেন। তাঁদের মতে, পৃথিবীতে সমস্ত ইউরেনিয়ামের অস্তিত্ব দেখা দিয়েছে একটা নির্দিষ্ট সময়ে। তাঁরা হিসাব ক'রে দেখিয়েছেন যে, সেই নির্দিষ্ট কালটি অতিক্রম ক'রে সময় আরও ৫০০ কোটি বছর এগিয়ে এসেছে।

আবার সৃষ্টিক্রমবিদ্‌রা অপসৃয়মান নাক্ষত্রজগতের আপাতবেগের সাহায্যে হিসাব করে দেখেছেন যে, মহাজগতের ক্রমপ্রসারণও সুরু হয়েছিল ৫০০ কোটি বছর আগে। অর্থাৎ, ভূপদার্থবিদ্‌ ও জ্যোতির্বিদ্‌দের হিসাবের অংকের সংগে সৃষ্টিক্রমবিদ্‌দের হিসাবের অংকে রয়েছে এক আশ্চর্য মিল।

### সূর্য ও তার গ্রহপরিবার

আন্তর্নাক্ষত্রজগত (Intergalactic) মহাদেশের বিস্তৃতির কোন্‌খানে আমাদের এই সৌরজগতের অবস্থান, সে সম্পর্কেও আজকাল একটা মোটামুটি ধারণা করা যাচ্ছে। আমাদের সূর্য ও তার ন'টি গ্রহ নিয়ে সৌরপরিবার। এবার, আমরা এই সৌরপরিবারের পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে নেবার চেষ্টা করবো। সমগ্র সূর্যদেহটি একটি গ্যাসীয় বস্তুর পিণ্ড। সূর্যের ব্যাস ৮৬৪,০০০ মাইল। সৌরজগতে অন্যান্য যাবতীয় যে বস্তু আছে, সূর্যের ভর তাদের সম্মিলিত ভরের প্রায় ৭০০ গুণ বেশি, আর, পৃথিবীর ভরের প্রায় ৩৩২,০০০ গুণ বেশি। কিন্তু সূর্যের উপাদানের ঘনত্ব, পৃথিবীর উপাদানের ঘনত্বের এক চতুর্থাংশ। পৃথিবীর ২৫ দিনে সূর্য আপন অক্ষের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্যের গায়ে যে কালো-কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায়, তার নাম সৌরকলঙ্ক (Sunspots)। এই সৌরকলঙ্কের পুনরাবর্তন লক্ষ্য ক'রে সূর্যের প্রদক্ষিণ কাল নিরূপণ করা গেছে। সূর্যের দৃশ্যমান উপরিতল থেকে আড়াইশো মাইল গভীর পর্যন্ত প্রদেশটির নাম হ'লো ফটোস্ফিয়ার (Photosphere)। এই প্রদেশের তাপমাত্রা প্রায় ৪৬০০° থেকে ৬০০০° সেণ্টিগ্রেড। ফটোস্ফিয়ারের উপরেই ৫০০ মাইল বিস্তৃত যে গ্যাসীয় আবরণটি আছে, তাকে বলা হয় ক্রমোস্ফিয়ার (Chromosphere)। সূর্যগ্রহণের সময় এই ক্রমোস্ফিয়ারই অগ্নিবলয়ের মতো দৃষ্টি গোচর হয়।

সূর্যের উপরিতলে যে মহাকর্ষ বল ক্রিয়া করছে, পৃথিবীর অভিকর্ষবলের তুলনায় তা প্রায় ২৮ গুণ বেশি।

সূর্য্য পরিবারের ন'টি গ্রহই উপবৃত্তাকার (ডিম্বাকার) পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্য্যের সবচেয়ে কাছে রয়েছে বুধ (Mercury)। সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করতে বুধের সময় লাগে ৮৮ দিন। আপন অক্ষের চারপাশে আবর্তন করতে বুধেরও ঐ একই সময় লাগে। ফলে, বুধের একই পাশ সব সময় সূর্য্যের দিকে ফেরানো থাকে। সূর্য্যের দিকে ফেরানো পাশটি খুবই উত্তপ্ত, অপরপাশটি তেমনই শীতল। পৃথিবীর আয়তনের সাতাশ ভাগের একভাগ হলো বুধের আয়তন। বুধের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের তিন পঞ্চমাংশ। বুধের দৃশ্যমান প্রদেশগুলি উপলকীর্ণ ও বন্ধুর। এই পাশটি সু-উচ্চ পর্বতে গঠিত। পৃথিবীর মতো বুধের চারপাশে বায়ুর কোনো আস্তরণ নেই।

শুক্র (Venus) হচ্ছে সূর্য্যপরিবারের উজ্জ্বলতম গ্রহ। শুক্রের চারপাশে রয়েছে মেঘের ঘন আবরণ। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও আজ পর্য্যন্ত মানুষ এই মেঘাবরণ ভেদ ক'রে শুক্রের উপরিতলের কোনো সংবাদ নিতে পারেনি। এর আয়তন, ভর, এবং ঘনত্ব প্রায় পৃথিবীর অনুরূপ। সম্প্রতি জানা গেছে এর উপরিতলের তাপমাত্রা ৪২৫° সেণ্টিগ্রেড। বুধ আর পৃথিবীর মাঝখানে শুক্রগ্রহের সূর্য্যপরিক্রমন পথ। সুতরাং, শুক্র হলো সূর্য্যের দ্বিতীয় নিকটবর্তী গ্রহ।

আয়তন অনুসারে গ্রহগুলির মধ্যে পৃথিবীর স্থান হলো পঞ্চম। সূর্য্যপরিবারের সমস্ত গ্রহগুলির মধ্যে খুব সম্ভব একমাত্র পৃথিবীতেই জীবনের অস্তিত্ব বিদ্যমান। পৃথিবীর উপাদান জলের চেয়ে ৫.৫ গুণ ভারি। পৃথিবীর গঠনরীতি দু'টি প্রধান অংশে বিভক্ত-বহিস্তল (Mantle) ও অন্তস্তল (Core)। বহিস্তলের উপরি-ভাগের আবরণ হলো পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রাথমিক স্তর, যাকে বলা হয় ভূত্বক। আগ্নেয় শিলা ও গ্রানাইট পাথরে গঠিত এই ভূত্বক Basalt-এর ঘন ও গুরু স্তরের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এদের সম্মিলিত গভীরতা আনুমানিক ২০ মাইল এবং সম্মিলিত উপাদান জলের চেয়ে তিনগুণ ভারি। এর পরবর্তী স্তর উপরিতল থেকে প্রায় ১৯০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরের গঠনরীতি এখন পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রয়েছে। পৃথিবীর অন্তস্তল মূলতঃ লোহা আর নিকেল দিয়ে তৈরি। চাপা মেরুঅঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাস ৮০০০ মাইল, নিরক্ষীয় অঞ্চলে ৮২০০ মাইল। এর উপরিতলের বিস্তার আনুমানিক ২০১,০০০,০০০ বর্গমাইল। এই উপরিতলের ৫৯,০০০,০০০ বর্গমাইল স্থলভাগ এবং বাকি ১৪২,০০০,০০০ বর্গমাইল স্থান অধিকার ক'রে আছে জলরাশি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে যে বায়ুমণ্ডল, পৃথিবীর উপরিতল থেকে তা কয়েকশো মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। নানা গ্যাসের সংমিশ্রনে তৈরি এই বায়ুমণ্ডল। নিচেকার বায়ুমণ্ডলের শতকরা ২০ ভাগ অক্সিজেন, প্রায় ৭৮ ভাগই হলো নাইট্রোজেন। এছাড়াও, আরগন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও অন্যান্য যে সব গ্যাস আছে, তাদের পরিমান অতি সামান্য।

বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচেকার স্তরের বৈজ্ঞানিক নাম ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)। বাংলায় বলা যেতে পারে ক্ষুব্ধস্তর। ভূপৃষ্ঠের উপর পাঁচ থেকে দশ মাইল পর্য্যন্ত এর বিস্তার। আমাদের আবহাওয়ার যাবতীয় বৈচিত্র্যই এই

স্তরে সীমাবদ্ধ। ঝড়বৃষ্টি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এই স্তরের বাতাস সর্বদাই চঞ্চল হয়ে আছে। এই স্তরে যে জলীয়বাষ্প ও কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে, তারা এক অতিগুরুত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছে। আমাদের এই গ্রহে জীবনধারনের জন্য যেতাপ অপরিহার্য্য, সেই তাপকে এই স্তরটিই ধরে রাখছে,—মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়তে বাধা দিচ্ছে।

এর উপরের স্তরের নাম ষ্ট্রাটোস্ফিয়ার (Stratosphere),—বলা যেতে পারে স্তব্ধস্তর। ক্ষুব্ধস্তরের উপর ৪০ থেকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত এর বিস্তার। ক্ষুব্ধস্তরের আবহাওয়ায় যে চঞ্চলতা, এ-স্তরে তার কোনো আভাসই নেই। স্তব্ধস্তরে বিরাজ করছে নীরন্ধ্র স্তব্ধতা। এখানকার বায়ুতে যে প্রবাহ আছে, তা সর্বদাই অনুভূমিক ও রীতিবদ্ধ। এই স্তরের উপরের অংশে ওজোন (Ozone) গ্যাসের আবরণ মারাত্মক আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করছে। ওজোন গ্যাসের এই স্তরের ঠিক উপর থেকেই সুরু হয়েছে আয়নমণ্ডল (Ionosphere)। বায়ুমণ্ডলের এই সবচেয়ে হাল্‌কা অংশে বাতাসের পরমানুগুলি ভাঙা। এই ভাঙা পরমানুগুলির নাম আয়ন। আমাদের বেতারবার্তার মূলে আছে এই আয়নের স্তর। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে যে দূরগামী বেতারতরঙ্গ ছড়িয়ে দেওয়া হয়, আয়নস্তরে প্রতিহত হয়ে প্রতিফলিত সেই তরঙ্গ আবার ফিরে আসে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে।

বুধ আর শুক্রের পর পৃথিবীই হলো সূর্য্যের তৃতীয় নিকটবর্তী গ্রহ। এই তিনটি গ্রহের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীরই চন্দ্রের মতো একটি উপগ্রহ আছে। সেদিক থেকে, পৃথিবীই সূর্য্যের নিকটতম গ্রহ, যার উপগ্রহ রয়েছে। সূর্য্যপ্রদক্ষিণরত পৃথিবীর প্রায় ২৪০,০০০ মাইল দূরে থেকে চাঁদ ২৭⅓ দিনে পৃথিবীকে একবার ক'রে প্রদক্ষিণ করছে। চন্দ্রে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই, নেই জলীয়বাষ্পের চিহ্নমাত্র। তাছাড়া, চাঁদের গায়ে আছে বড়ো বড়ো গহ্বর। আগেকার দিনে, এই গহ্বরগুলিকে মনেকরা হতো সমুদ্র। এছাড়াও, বড়ো বড়ো পাহাড় ছড়িয়ে আছে চন্দ্রপৃষ্ঠের সর্বত্র। যদিও চন্দ্র সূর্য্যপরিবারের সবচেয়ে বড়ো উপগ্রহ নয়, তবুও পৃথিবীর কাছে এটাই সবচেয়ে বড়ো মাপের।

সূর্য্যের চতুর্থ গ্রহ হচ্ছে মঙ্গল (Mars)। চন্দ্রছাড়া আকাশচারী অন্যান্য সমস্ত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে একমাত্র মঙ্গলের অবস্থানই পৃথিবী থেকে নিরীক্ষণের অনুকূল। মঙ্গলের ব্যাস পৃথিবীর প্রায় অর্ধেকের মতো। মঙ্গলের উপগ্রহও দু'টি—ডেইমস্‌ (Deimos) এবং ফোবস্‌ (Phobos)। এখানকার ঋতুপ্রকৃতি পার্থিব ঋতুপ্রকৃতির অনুরূপ ব'লে অনুমান করা হয়। কেবল তফাৎ এই যে, মঙ্গলের ঋতুগুলি দীর্ঘস্থায়ী, পৃথিবীর ঋতুর দ্বিগুণ। প্রমান পাওয়া গেছে, এই গ্রহের মেরুপ্রদেশ বরফের টুপিতে ঢাকা। মঙ্গলের শীতকালে এই টুপির বৃদ্ধি এবং গ্রীষ্মকালে এর হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। মঙ্গলের স্থানে স্থানে কালো কালো দাগ, বিশেষ ক'রে বিষুবঅঞ্চলের কালো দাগগুলি, অধিকাংশ জ্যোতির্বিদের মতে উদ্ভিদের লক্ষণ। ঋতুর পরিবর্তনের সংগে সংগে এই দাগগুলিরও পরিবর্তন দেখা যায়।

মঙ্গল ও তার পরবর্তী গ্রহ বৃহস্পতির কক্ষপথের মাঝখানে প্রায় ১৫০০ টুকরো টুকরো গ্রহ সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এই টুকরো টুকরো গ্রহগুলির নামকরণ করা

হয়েছে গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়োটির নাম সেরেজ (Ceres)। এর ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল। এর পরেই যেটি বৃহত্তম, তার নাম পালাজ (Pallas)। এর ব্যাস মাত্র ৩০৪ মাইল। এরা সকলে এতই ক্ষুদ্র যে এদের পক্ষে বায়ুমণ্ডল অথবা উপগ্রহ কোনোটিই ধরে রাখা সম্ভব নয়।

সূর্যের পঞ্চম গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter),—সূর্যপরিবারের বৃহত্তম গ্রহ। ৮৬,৭২৮ মাইল ব্যাসের এই গ্রহ পৃথিবীর চেয়ে ৩১৬ গুণ ভারি, কিন্তু আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে তেরোশো গুণ বড়ো। অর্থাৎ, এই গ্রহের ঘনত্ব খুবই কম, জলের চেয়ে সামান্য ভারি মাত্র। অন্ততপক্ষে, এগারোটি উপগ্রহ নিয়ে বৃহস্পতির পরিবার। এদের মধ্যে আয়ো (Io), ইউরোপা (Europa), গাণি মেদে (Gany mede), কালিস্তো (Callisto),—এই চারটি হলো সবচেয়ে বড়ো। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলে দুটি গ্যাসের প্রাচুর্য,—অ্যামোনিয়া (Ammonia) আর মিথেন (Methane)। অত্যন্ত শীতল এর আবহাওয়া। তাপমাত্রা প্রায়—১৩৮° সেণ্টিগ্রেড, অর্থাৎ শূন্যের নিচে আরও ১৩৮° সেণ্টিগ্রেড। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতি পৃথিবীর প্রায় এগারো গুণ বেশি সময় নেয়।

বৃহস্পতির পরেই শনিগ্রহের (Saturn) অবস্থান। এ গ্রহটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হলো এর চারপাশের বলয়। সূর্য থেকে বৃহস্পতির দ্বিগুণ দূরত্বে শনির অবস্থান। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে প্রায় তিরিশ বছর। সূর্যপরিবারের এই গ্রহটির উপাদানের ঘনত্ব সবচেয়ে কম, জলের চেয়েও অনেক হালকা। বৃহস্পতির মতোই ঠাণ্ডা এই গ্রহটি। এর বাতাসেও বৃহস্পতির মতো অ্যামোনিয়া ও মিথেনের আধিক্য। এর ন'টি উপগ্রহ আছে, বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে টাইটান (Titan) হলো সূর্যপরিবারের উপগ্রহগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়ো, আয়তনে প্রায় মঙ্গলের সমান। শনির চারপাশে একটি বলয়ের কথাই সাধারণতঃ শোনা যায়, কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, শনিকে বেষ্টন ক'রে আছে দু'টি বলয়। জ্যোতির্বিদ্‌দের অনুমান, এই বলয়দু'টি হাজার হাজার টুকরো টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি। শনির বিষুবঅঞ্চল বরাবর, এরা শনিকে প্রদক্ষিণ করছে অতি-দ্রুতবেগে। বৃহস্পতির পরেই শনি হলো দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে ৭৩৪ গুণ বড়ো।

সূর্যের থেকে দূরত্বের হিসাবে সপ্তম গ্রহ য়ুরেনাস (Uranus)। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে এই গ্রহটি আবিস্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর চেয়ে চারগুণ বড়ো এর ব্যাস। টাইটানিয়া (Titania), ওবেরণ (Oberon), এরিয়েল (Ariel) এবং আম্‌ব্রিয়েল (Umbriel),—অন্ততপক্ষে এই চারটি উপগ্রহ নিজ নিজ পথে য়ুরেনাসকে প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যথেকে এই গ্রহের দূরত্ব পৃথিবীর তুলনায় প্রায় ঊনিশগুণ বেশি। সূর্যের চারপাশে একবার প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ৮৪ বছর। সূর্যের আলো তাপের মাত্র তিনশো পঞ্চাশ ভাগের একভাগ য়ুরেনাসে এসে পৌঁছায়।

সূর্যপরিবারের অষ্টমতম গ্রহ নেপচুন (Neptune)। মাত্র ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপচুন আবিস্কৃত হয়েছে। এর ব্যাস প্রায় ৩১,০০০ মাইল। সূর্যকে একবার

প্রদক্ষিণ করতে এর সময় লাগে ১৬৪·৮ বছর। নেপচুনের দুটি উপগ্রহ আছে ব'লে জানা গেছে। হাইড্রোজেন ও মিথেন গ্যাস এই গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের মূল উপকরণ।

সূর্যের দূরতম গ্রহ হলো প্লুটো (Pluto)। প্রায় ৩,৬৭০,০০০,০০০ দূরে থেকে ২৪৮ বছরে এই গ্রহ সূর্যকে একবার ক'রে প্রদক্ষিণ করছে। এই অতিম্লান অনুজ্জ্বল গ্রহটি সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নি। এমনকি, এর আয়তনও এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা যায় নি। কোনো কোনো জ্যোতির্বিদ্ দাবি করছেন, প্লুটো পৃথিবীর চেয়ে বড়ো, আবার কেউ কেউ মনে করছেন, পৃথিবীর থেকে ছোটো।

### অন্যান্য গ্রহে কি প্রাণের অস্তিত্ব বর্তমান

প্রাচীনকাল থেকেই একটি প্রশ্ন জ্যোতির্বিদদের মনকে দোলায়িত করেছে—সে হলো, পৃথিবী ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও জীবনের স্পন্দন আছে কিনা। আমাদের সৌরজগতে এসম্পর্কে গভীর পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয়েছে। যদিও মঙ্গলগ্রহে উদ্ভিদের অস্তিত্ব সম্পর্কে অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত পোষণ করেন, তবুও পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে জীবনের অস্তিত্বের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সৌরজগত ছাড়া বিশ্বের অন্যত্র প্রাণের লক্ষণ আছে কি? এই-যে দূরপ্রসারিত মহাজগত, সম্ভবতঃ অসীম,—এর কোথাও, কোনো অজ্ঞাততম প্রান্তেও জীবনের কোনো চিহ্ন কি আছে? নাকি, জীবনের লক্ষণে পৃথিবী অনন্যা?

অনুমান করা হয়েছে যে, শতকরা একটি নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহমণ্ডলী থাকতে পারে। যেহেতু ছায়াপথে একহাজার কোটি নক্ষত্র বিদ্যমান, সুতরাং এই ছায়াপথে অন্ততঃ দশলক্ষ নক্ষত্রের নিজস্ব গ্রহমণ্ডলী থাকা সম্ভব। উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর জীবনের মূলে রয়েছে আলোককনার সংগে রাসায়নিক বিক্রিয়া (Photochemical reaction)। এই বিক্রিয়ার জন্যে যে ধরনের বিকিরণ প্রয়োজন, প্রত্যেক নক্ষত্র-পরিবারেই তা বিদ্যমান। আমাদের নাক্ষত্রজগতের অগন্য নক্ষত্রের লক্ষ লক্ষ গ্রহে পৃথিবীর প্রায় অনুরূপ অবস্থা বর্তমান রয়েছে। সুতরাং, ধারণা করা যেতে পারে যে, দূরান্তের জগতেও সম্ভবতঃ আমাদের জগতের অনুরূপ জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। সেখানেও জীবনের বিকাশ সমান তালে চলছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# পৃথিবীতে জীবনের সূচনা

নীল-সবুজ শ্যাওলা আর জীবনুতে জীবনের প্রথম ইংগিত দেখা গিয়েছিল। তারপর এই অতিসাধারণ স্তর থেকে জটিল জীবজগতে জীবনের উত্তরন। জৈব ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, কীভাবে সম্ভব হ'লো জীবনের এই ক্রমবিকাশ।

জীবনের এই যে অতিসরল প্রকাশ, এ-ও কতকগুলি জটিল রাসায়নিক অবস্থার পরিণাম মাত্র। ২,৫০০,০০০,০০০ বছর আগে থেকেই পৃথিবীর বুকে নীল-সবুজ শ্যাওলার আবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। কারণ, যেপাথরে এদের ফসিল পাওয়া গেছে, হিসাব করে দেখাগেছে, সেগুলি-ও সেই সময়কার। সূর্য্য ও নক্ষত্রের ইতিহাস থেকে আমরা জানি পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫,০০০,০০০, ০০০ বছর। সুতরাং শ্যাওলার আবির্ভাবেরও আগে প্রায় ২,৫০০,০০০,০০০ বছরের মতো সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এই সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে রাসায়ণিক বিবর্তনের ভিতর দিয়ে—জীবনের উন্মেষে যার পরিণতি।

দীর্ঘকাল ধরে আমাদের পৃথিবী একটি উত্তপ্ত, আধাকঠিন, গোলাকার বস্তু-পিণ্ডের আকৃতি নিয়ে সঞ্চরমান ছিল। সেই অবস্থায় পৃথিবীর বুকে জীবনের সম্ভাবনা ছিল সুদূরপরাহত। কিন্তু, সে-ই ছিল প্রস্তুতিপর্বের যুগ। সবার অলক্ষ্যেই পৃথিবীর উপরিতল ক্রমশ শীতল হয়েছে, কঠিন হয়েছে ভূত্বক। সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে নতুন অধ্যায়ের প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্তির পথে। ভূতল তখনও উত্তপ্ত। সর্বত্র বন্ধ্যাত্বের চিহ্ন। সারা পৃথিবীতে তখন জীবনের স্ফুলিঙ্গের উন্মুখ প্রতীক্ষা।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের প্রাথমিক পর্য্যায়ে হিলিয়াম ও হাইড্রোজেন গ্যাসেরই আধিক্য ছিল। আর ছিল মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেনসাল্‌ফাইড-গ্যাস এবং জলীয় বাষ্প। পৃথিবীর মাটিতে তখনও ছিল প্রচণ্ড উত্তাপ, তাই গ্যাসের অনুগুলিও ছিল অতিদ্রুত সঞ্চরমান। ফলে, হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মতো অতি লঘু

গ্যাসের অনুগুলি সহজেই পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন গ্যাস এসে তার স্থান দখল করেছে। গলিত পাথরে যে-সব গ্যাস দ্রবীভূত ছিল, শিলীভবনের সময় তারা বেরিয়ে এসেছে। পৃথিবীকে ঘিরে নতুন বায়ুমণ্ডল রচিত হয়েছে। এই নতুন গ্যাসগুলিরও অধিকাংশই হলো জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড।

তারপর পৃথিবী যতই শীতল হয়েছে, গ্যাসের এই আবরণও তত শীতল হয়ে এসেছে। আর জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের আরম্ভও সেই সময় থেকে। ঘনীভবনের ফলে, আকাশ থেকে নেমে এসেছে বর্ষনের অবিশ্রান্ত ধারা। এই ঘনঘন বৃষ্টিপাতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত হয়ে সঞ্চিত হয়েছে সমুদ্রে। আর, বায়ুমণ্ডলের উপাদানে তুলনামূলকভাবে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেড়ে গেছে। স্থলদেশ থেকে নানা পদার্থের লবন বৃষ্টির জলে ভেসে এসে সমুদ্রের জলে মিলেছে। এই লবনের অধিকাংশই হলো ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম আর সোডিয়ামের কার্বনেট, ক্লোরাইড এবং সালফেট। বায়ুমণ্ডলে যে হাইড্রোকার্বন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস ছিল, হয়তো এই সময়ই তার কিয়দংশ পৃথিবীর মাটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

পরবর্তীস্তরে, স্থলভূমির বিভিন্ন লবন এবং বায়ুমণ্ডলের রাসায়নিক দ্রব্যসামগ্রী নানাস্থানের সঞ্চিত জলাশয়ে দ্রবীভূত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়েছে। ফলে, সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন রাসায়নিক সমাবন্ধের (Chemical combinations)। আর, সমুদ্র-আশ্রিত কার্বন ও নাইট্রোজেনের যৌগগুলির (Compound) সহযোগে এই নবসৃষ্ট রাসায়নিক পদার্থ জীবন উন্মেষের মূলউপাদান তৈরি করেছে। ইতিমধ্যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত গলিত শিলা বা লাভা পৃথিবীর চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। লাভার মধ্যে যে কার্বাইড ছিল, জলের সংগে মিশ্রিত হয়ে সেগুলি সৃষ্টি করেছে অতি প্রয়োজনীয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের।

বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে যে জলীয় বাষ্প ছিল, সূর্যালোকে তার সালোক-বিষঙ্গ (Photo dissociation) ঘটে। এই বিষঙ্গের ফলে বাষ্পের অনুতে হাইড্রক্সিল্-এর যে গোষ্ঠী থাকে, তা ভেঙে গিয়ে হাইড্রোজেন পরমানু মুক্তিলাভ করে। এই মুক্ত হাইড্রোজেন পরমানুর কোনো কোনোটি নাইট্রোজেনের সংগে মিলিত হয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস তৈরি করেছে। এই রকম বিভিন্ন উপায়ে তৈরি অ্যামোনিয়া গ্যাস বৃষ্টিজলের সংগে বাহিত হয়ে সমুদ্রে এসে আশ্রয়নিয়েছে। আরও একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই জৈবজগত গঠিত হয়েছিল। দ্রুত ধাবমান যে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে অবিরত বর্ষিত হচ্ছে, বাতাসের অনুগুলির সংগে তা প্রবল সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের ফলে অতিক্ষুদ্র অনুগুলি সংঘবদ্ধ হয় বড়ো বড়ো অনুগোষ্ঠীতে। আর, এই উপায়েই কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প থেকে ফর্মাল্ডিহাইড (Formaldehide) ও অন্যান্য রাসায়নিক যৌগদ্রব্যের উদ্ভব হয়।

মেঘে মেঘে বিদ্যুতের ঝলকেও বায়ুমণ্ডলের অনুরূপ রাসায়নিক পরিবর্তন সাধিত হয়। নবগঠিত বিভিন্ন দ্রব্য বৃষ্টিজলের সংগে এসে মিলিত হয় সমুদ্রে। ঘটনাপরম্পরায় সমুদ্র যেন বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের স্তূপের একটি প্রকাণ্ড গামলা

বিশেষে পরিণত হয়েছিল। আর এই গামলায় কার্বনের নানা যৌগ মিলিত হয়ে তৈরি করেছে সৃংখলবদ্ধ ও মণ্ডলবদ্ধ কার্বনের বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগ। তাছাড়াও পলিমারাইজেশন (Polymerisation) প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন কার্বন পরমানু আবদ্ধ হয়েছে অক্সিজেন কিংবা নাইট্রোজেনের সেতুতে।

বৃষ্টির জলের সংগে পৃথিবীর স্হলভাগ থেকে কিছু পরিমান কাদামাটিও এসে সমুদ্রে পড়েছিল। কর্দমাক্ত বস্তুকণার একটি সহজাত ক্ষমতা আছে,—সে অন্যান্য দ্রব্যের অনুগুলিকে কাদার ভিতর শোষণ ক'রে নিতে পারে। শোষিত অনুগুলিও পরস্পরের সান্নিধ্যে দ্রুত বিক্রিয়া ঘটায় ও নতুন নতুন যৌগের আবির্ভাব ঘটায় ছোটো অনুগুলি ক্রমশ বড়ো অনুতে গ্রথিত হয়েছিল। এর জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান এসেছিল বেগনিপারের আলো (Ultraviolet ray) থেকে। আজ সমুদ্রের জলে এই রশ্মি যতটা বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হতো সেই কালে।

জৈব যৌগের এই কলয়েড (Colloid)-এর স্তুপে অ্যামিনো এসিড (Amino acid) পরস্পর যুক্ত হয়ে প্রোটিন (Protein) এবং পেপ্‌টাইড (Peptide)-জাতীয় নানাধরণের রাসায়নিক দ্রব্যের অনু তৈরি করেছে। কলয়েডে পরিণত হবার মতো যথেষ্ট বড়ো হতো এইসব অনুগুলি। ফলে, প্রোটিনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে সমুদ্রের সাধারণ দ্রবণ কলয়েডের দ্রবণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

কলয়েডের এই বস্তুকণাগুলি আবার পরস্পর মিলিত হয়ে বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়েছিল। এই বস্তুপিণ্ডগুলি দ্রবণের চেয়ে ভারি হওয়াতে সমুদ্রের নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। মিলিত বস্তুকণাগুলি অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কণিকাবদ্ধ অবস্হাতেই স্হায়ী মণ্ডলের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন বস্তুমণ্ডলের উপরিতলে বৈষম্য থাকায় জলকণা নির্মিত এক সূক্ষ্ম ত্বকের আবরণে এরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্হায় থাকতো। এই ত্বক একদিকে যেমন বস্তুমণ্ডলকে পরিপার্শ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার জন্য পর্দার কাজ করতো, অপরদিকে তেমনি বাইরের জগতের সংগে এদের যোগাযোগের পথ প্রশস্ত ক'রে দিয়েছিল।

বাইরের কিছু কিছু অনু অনবরতই এই আবরণ ভেদ ক'রে মণ্ডলের ভিতরের জগতে প্রবেশ করেছে। আবার, ভিতরের কিছু অনুও বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়ে এসে মিশে গেছে জলের সংগে। এইভাবেই চলেছে এক নিয়ত অনুপ্রবাহ। এই প্রবাহের ফলে মণ্ডলের অভ্যন্তরে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক ধর্মের পরিবর্তন চলেছে নিরন্তর। পরিবর্তনগুলির কোনো কোনোটি হয়তো বড়ো বড়ো অনুগুলির মধ্যে ভাঙন ধরিয়েছে। আর, এই পরিবর্তনের স্রোত যতক্ষণ-না বাধাগ্রস্ত হয়, ততক্ষণ ভেঙে যাওয়া মণ্ডল থেকে বস্তুকণা ছড়িয়ে পড়েছে সমুদ্রের জলে। অন্যান্য পরিবর্তনগুলি তখন বিভিন্ন মণ্ডলের পুনর্গঠনে সচেষ্ট থেকেছে। স্হায়ী মণ্ডলের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে; ছড়িয়ে-পড়া বস্তুকণাগুলি এসে এই-সব মণ্ডলে আবদ্ধ হয়েছে। ধীরে ধীরে এইভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণতা এসেছে। সুসংবদ্ধ রাসায়নিক পরিবর্তনে প্রক্রিয়াগুলি সংগঠিত হয়েছে। এই সুসমন্বিত রাসায়নিক পরিবর্তন-গুলিই ছিল জীবকোষের মেটাবলিজ্‌ম্‌-এর মূলে।

**যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন**

ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে কতকগুলি জৈবমণ্ডল স্থায়ীত্ব লাভ করেছিল। এই স্থায়ীমণ্ডলের ক্রমবৃদ্ধির জন্য চাই খাদ্য। যে-সব মণ্ডল তুলনামূলকভাবে দুর্বল, তারা ক্রমশ ভেঙে ভেঙে পৃথিবীর মাটি থেকে একেবারেই বিদায় নিলো। যেগুলি অপেক্ষাকৃত স্থায়ী, তারাই টি'কে রইলো এবং ক্রমশ সবল হতে থাকলো। এ-ই হলো যোগ্যতমের উদ্‌বর্তন (Survival of the fittest) নীতি। এমনকি, অপেক্ষাকৃত স্থায়ীমণ্ডলগুলিও শেষপর্যন্ত চিরকাল টি'কে থাকতে পারেনি। এদের মধ্যে যারা চারপাশের অনুগুলিকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে, কিংবা নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে পেরেছে, তারাই সবচেয়ে বেশিদিন অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ, যেমণ্ডলের অনুঘটক (Catalyst) যত বেশি কাজের, সেইমণ্ডল তত বেশিদিন টি'কে গেছে। প্রজাতির চিরস্থায়ীত্ব ও আত্মদ্বৈতকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধিধায় করা যেতে পারে যে, অবিভক্তমণ্ডলের চেয়ে দ্বিধাবিভক্ত মণ্ডলগুলি অস্তিত্ব বজায় রাখবার দিক থেকে যোগ্যতর।

সময় যত এগিয়ে চলেছে, এই-সব অনুরূপ অংশে বিভজ্যমান মণ্ডলগুলির বৃদ্ধির জন্যে তত বেশিপরিমাণে জৈবযৌগগুলি ব্যবহৃত হয়েছে। কিছুকাল পরে দেখা গেল, সমুদ্রের দ্রবনে জৈবযৌগের পরিমাণ সংকটজনকভাবে হ্রাস পেয়ে গেছে। ফলে, সমুদ্রআশ্রিত বিভিন্ন মণ্ডলে একদিন খাদ্যাভাব দেখা গেল। এদের মধ্যে যাদের মেটাবলিজ্‌ম্ সবচেয়ে বেশি স্থায়িত্ব লাভ করেছিল এবং যে-সব উৎসেচক (Enzyme) সবচেয়ে উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল, কেবল তারা টি'কে থাকতে পারলো। এইভাবে মেটাবলিজ্‌ম্ প্রক্রিয়া, উৎসেচকধারা এবং প্রজনন কৌশল ক্রমশ উন্নত হ'তে থাকলো। বহুযুগ ধরে ক্রমোন্নতির পথে এইভাবে স্থায়ী, জটিল এবং অতি-সূক্ষ্ম এক সুষম রাসায়ণিক প্রক্রিয়ার জন্ম হ'লো। এই প্রক্রিয়াকে আমরা নাম দিয়েছি জীবন।

বর্তমানকালের উন্নতধরণের বিজ্ঞানসাধনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, জীবনপদ্ধতির চিরত্ব নির্ভর করছে, তাদের অনুরূপ অংশে বিভক্ত হওয়ার বংশানুক্রমিক কৌশলঅর্জনের উপর। এই বিভাজনরীতিতে একটি জৈবমণ্ডল দু'টি অবিকল সমান অংশে ভেঙে যায়। অংশগুলিও এই বিভাজন ধর্ম লাভ করে উত্তরাধিকারসূত্রে। নিজেদের মধ্যে জনক কোষের চরিত্রকে আত্মস্থ ক'রে এরা এই রীতিকে বজায় রাখে। এই বংশানুক্রমিক ধারাকে বলা হয় ক্রোমোসোম (Chromosomes) ও জেনি (Genes)। পরিপার্শ্বের প্রভাবে এদের মধ্যেও দেখা যায় ক্রম পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্তনশীলতাও বংশানুক্রমিক হ'তে পারে। এদের প্রভাবে জীবনধারার কোনো কোনো অনুজাতকের মধ্যেও অবস্থান্তর ঘটে যায়। এই উপায়ে, ক্রমবিবর্তনের ধারায়, নতুন নতুন প্রকৃতির জীবকোষ জন্মলাভ ক'রে। সুতরাং, আত্মদ্বৈতকরণের কৌশলের আবির্ভাবকেই পৃথিবীতে জীবনসূচনার প্রথম লক্ষণ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

সৃষ্টির সূচনায় যে-সব জৈবপদার্থের আবির্ভাব ঘটেছিল, তাদের গঠনরীতি সম্ভবত জীবানু কিংবা নীলসবুজ শ্যাওলার চেয়ে অনেক সরল ছিল। অনুরূপ অংশে বিভজ্যমান একএকটি মণ্ডলে এদের উৎপত্তি। মণ্ডলগুলির মতো এরাও

চারপাশের জলে দ্রবীভূত জৈবযৌগ থেকে খাদ্যসংগ্রহ করতো। এরা অজৈব যৌগ থেকে নিজেরা খাদ্যপ্রস্তুত করতে জানতো না। পূর্বপ্রস্তুত আহার্যের উপরই এদের নির্ভর করতে হতো। সে যুগে বায়ুতে মুক্তঅক্সিজেনের পরিমান ছিল খুবই অল্প। সন্ধান (Fermentation) প্রক্রিয়ায় তারা খাদ্যগুলিকে পুড়িয়ে ফেলতো। যারা প্রাথমিক যুগের জৈবপদার্থ, তারা কোনো কোনো উপায়ে আগে থেকেই শক্তিসঞ্চয় ক'রে রাখতো। প্রয়োজনমতো সেইশক্তিকে তারা কাজে লাগাতো।

ক্রমশ জীবকুল যত বড়ো হতে লাগলো, সংখ্যায়ও তারা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। সমুদ্রের রাসায়নিক যৌগের ব্যবহারও সেই পরিমাণে বেড়ে চললো। রাসায়নিক যৌগের পরিমাণ ক'মে আসার দরুণ অনেক জীবের খাদ্যাভাব দেখা দিল। প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাবে কোনো কোনো শ্রেণীর জৈবপদার্থ চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। রাসায়নিক গঠনে সামান্য বৈষম্য থাকায় অন্যান্য জীবেরা অবশিষ্ট সাধারণ রাসায়নিক যৌগ থেকেই খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম ছিল। ফলে, তারা বেঁচে রইলো। যখন অবশিষ্ট যৌগও নিঃশেষ হয়ে গেলো, তখন তারা অন্যান্য সাধারণ বস্তু থেকে প্রয়োজনীয় যৌগ উৎপাদনের উপায় আবিস্কার করলো। যেমন, ধরা যাক্‌ 'ক' নামে কোনো প্রয়োজনীয় যৌগের অভাব ঘটলো। তখন জীবগুলি 'খ' নামে অপর একটি যৌগের ব্যবহার করতে শিখলো। 'খ'-এরও যখন অভাব ঘটলো, তখন 'গ' নামে আর একটি যৌগ থেকে তারা 'খ' ও 'ক' জাতীয় যৌগ তৈরি করতে সুরু করলো। এইভাবে, কতকগুলি সংঘবদ্ধ স্তরের মধ্য দিয়েই খাদ্যসৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। অবশেষে, একদল নতুনধরণের জীবের অবির্ভাব হলো। এরা অজৈব যৌগ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে শিখলো। এরাই প্রথম নিজেদের খাদ্য নিজেরাই তৈরি ক'রে নিলো। এদের বলে স্বভোজী জীব (Autotrophic organism)। নিজেদের তৈরি খাদ্যের ব্যবহারই এইসব খাদ্যপ্রস্তুতকারী জীবের জীবনধারণের উপায়। এরপর এমন একদল জীবের আবির্ভাব হলো যারা খাদ্যপ্রস্তুতকারী জীবকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতো। কতকগুলি জীবের মধ্যে কার্বন ডাই অক্‌সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন উৎস থেকে খাদ্য প্রস্তুত করবার ক্ষমতার বিশেষ বিকাশ দেখা গেলো। আর একদল কাজে লাগালো অ্যামোনিয়াকে। অবশেষে একদল নতুনতর জীব সালোক-সংশ্লেষ (Photosynthesis) ঘটাতে সক্ষম হলো। এই প্রক্রিয়ায় তারা কার্বন ডাইঅক্‌সাইড এবং জলের সাহায্যে গ্লুকোজ তৈরি করলো। এতে ক'রে জলের অনু হাইড্রোজেন ও অক্‌সিজেন-এর অনুতে ভেঙে গেলো। মুক্ত অক্‌সিজেন গ্যাসের আকারে বায়ুমণ্ডলে আশ্রয় নিলো। বায়ুমণ্ডলে অক্‌সিজেন-এর পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকলো ক্রমশ। সেই-সংগে বায়ুতে কার্বন ডাই অক্‌সাইড-এর পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেলো। এই কার্বন ডাই অক্‌সাইড আশ্রয় নিলো উদ্ভিদ্‌ জগতে। আবার, কিছু কার্বন ডাই অক্‌সাইড জীর্ণ উদ্ভিদের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে বায়ুমণ্ডলে আশ্রয় নিলো।

বায়ুমণ্ডলের মুক্ত অক্‌সিজেন নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলো জীবনবিবর্তনের ইতিহাসে। মুক্ত অক্‌সিজেন-এর আবির্ভাবের পর থেকেই বায়ুজীবী (Aerobic) জীবসৃষ্টির পথ প্রশস্ত হলো। এরা অক্‌সিজেন-এর ব্যবহার করলো দহনের

কাজেও। সন্ধান প্রক্রিয়ার চেয়ে অক্‌সিজেন-এর সাহায্যে দহনের কাজ চালানো অপেক্ষাকৃত কম জটিল। এই পদ্ধতিতে যে শক্তির উদ্ভব হ'তো তার পরিমাণও অনেক বেশি। ফলে, শক্তির প্রাচুর্যে জীবগুলির বৃদ্ধি এবং জটিল বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বর্তমানকালের বহু প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌-এর ক্রমবিবর্তনের এই হ'লো ভিত্তি। বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরে রয়েছে অক্‌সিজেন। তার উপরের স্তরে আছে ওজোন গ্যাস। সূর্যালোক আল্টা ভায়োলেট রশ্মি থেকে পরিশ্রুত হচ্ছে এই গ্যাসের আবরণে। নইলে, পৃথিবীতে জীবনের সম্ভাবনা থেকে যেতো সুদূরপরাহত।

সমুদ্রের আশ্রয় থেকে জীবনের নতুনপ্রকাশ ঘটলো এইভাবে। উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণীজগতের যাত্রা সুরু হলো দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরের মাটিতে মাটিতে।

কতকগুলি আদিম জীব বিকাশের জন্য সম্পূর্ণ নতুন পথ বেছে নিয়েছিল। বায়ুমণ্ডল থেকে খাদ্য সংগ্রহের বদলে একেবারে ব্যবহারের উপযুক্ত উদ্ভিদ্‌জাত কার্বন যৌগ সংগ্রহের কাজই তাদের বেশি পছন্দ ছিল। যেহেতু পরজীবীয় (Parasitic) উপায়ে খাদ্যগ্রহণ অনেক সহজ, সুতরাং এইসব জীবের উদ্বৃত্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যেতো খাদ্য সংগ্রহের জন্য অংগ সঞ্চালনের বিকাশে।

**সমুদ্রের আশ্রয় থেকে মহাদেশে জীবনের উত্তরণ**

জীবজগতের মধ্যে ক্রমশ দেখা দিল উদ্ভিজ খাদ্যের প্রতি অরুচি। তখন থেকে সুরু হলো প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণের পর্ব। ফলে, খাদ্য সংগ্রহের জন্য শিকার ধরবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজনই জীবজগতের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলো। বর্তমান প্রাণীজগতের বৈশিষ্ট্য হলো তার গতি-শীলতা। বস্তুতঃ, গতিশীলতার সৃষ্টি হয়েছিল শিকার সংগ্রহের প্রয়োজনে। অস্থি এবং থাবার মতো দৃঢ় শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির সৃষ্টি হয়েছিল যুগপৎ আক্রমণ ও আত্মরক্ষার তাগিদে। জীবনসংগ্রামের তাগিদেই নরম জেলির মতো আকারের জীবজগতের উত্তরণ ঘটেছে প্রকৃতিদত্ত-আয়ুধ-সুসজ্জিত প্রাণীজগতে। আজও কচ্ছপ, চিংড়ি প্রভৃতি প্রাণীর দেহে এই আয়ুধ সজ্জা দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীদেহের কঠিন অংশের আবির্ভাবের সংগে সংগে জীবনের ইতিহাসের সূত্রপাত। নানাদেশের যাদুঘরে অতীতের এই সব বিচিত্র প্রাণীর কঠিন আবরণ ও কংকাল সংগ্রহ ক'রে রাখা হয়েছে।

প্রায় ৫০০,০০০,০০০ বছর আগে পুরাজীবীয় (Paleozoic) যুগের প্রারম্ভ। এই সময় সামুদ্রিক জীবন এক উন্নত পর্যায়ে এসে পেঁছেছিল। জলচর প্রাণীর কোনো কোনো দল নদীপথে নানা হ্রদে এসে আশ্রয় নিয়ে সেখানকার নতুন জলে জীবন ধারণে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। মাঝেমাঝে হয়তো এই আন্তর্দেশীয় জলাশয়গুলি নিয়মিত জলসরবরাহের অভাবে ক্রমশ শুষ্ক হয়ে গেছে। ফলে, এই সব জলাশয়ের অধিকাংশ প্রাণী ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু কোনো কোনো প্রাণী এই নতুন অবস্থার সংগে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে শুষ্কভূমিতেই টি'কে গেছে। সাঁতার কাটার উপযুক্ত উপাঙ্গ বিশিষ্ট এই প্রাণীগুলি ইউরিপটেরিড (Eurypterid)

শাখার বংশধর বলে পরিচিত। এরা ক্রমশ নানা মহাদেশে ছড়িয়ে প'ড়ে শতপদ (Centipedes), সহস্রপদ (Millipedes), বৃশ্চিক, মাকড়শা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে, এদের অনেকে আকাশে উড়তে শেখে এবং খেচর প্রাণীর এক বিরাট বাহিনীর সৃষ্টি হয়। এইভাবেই জলচর প্রাণীর এক অংশ ক্রমশ খেচর প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

এইসব প্রাণীর অধিকাংশই দৈর্ঘ্যে মাত্র কয়েক সেণ্টিমিটার ছিল। প্রাক্-পুরাজীবীয় যুগে, যাকে অঙ্গারীভবনের (Carboniferrous) যুগ বলা যায়, তখন যেসব প্রাণী বর্তমান ছিল তারা ছিল যথেষ্ট লম্বা। কোনো কোনো উভচরের জলের প্রতি আসক্তি ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। তারা শুষ্কভূমিতে পাকাপাকি-ভাবে বসবাস করতে সুরু করে। কালে, এদের মধ্য থেকেই জন্ম নেয় এক বিরাট সরীসৃপবাহিনী। তারাই পরবর্তীকালে, প্রায় ১০০,০০০,০০০ বছর ধরে বিভিন্ন মহাদেশ অধিকার ক'রে রাজত্ব চালায়।

আদিম সরীসৃপেরা অতিকায় এবং অলস প্রকৃতির প্রাণী ছিল। এদের চেহারা ছিল অনেকটা একালের কুমীরের মতো। এদের দেহের দুপাশে অনেকগুলি ক'রে পা ছিল। আকৃতি যেমন প্রকাণ্ড ছিল, গতিও ছিল তেমনি মন্থর। মধ্যাহ্নকালে এরা কর্মতৎপর হয়ে উঠতো। রাত্রিতে এদের মস্তিষ্ক বিশেষ কাজ করতো না। দিন আর রাত্রির উষ্ণতার মধ্যে যে তারতম্য আছে, তারই ফলে রাত্রিকালে এদের মস্তিষ্কের মেটাবলিজ্‌ম্ মন্থর হ'য়ে যেতো। উন্নত দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতার দিকে জীবনের এই-যে ক্রমবিকাশ ঘটছিল, তার মূলে ছিল দুটি কারণ। তারা হলো মেটাবলিজ্‌ম্-এর একটি সুউচ্চ নির্দিষ্ট হার আর দৈহিক উষ্ণতার নিত্যতা।

জল থেকে স্থলভূমিতে প্রাণীজগতের উত্তরণের মতো অনুরূপ এক প্রক্রিয়া উদ্ভিদ্ জগতেও ক্রিয়াশীল ছিল। বেলাভূমির প্রত্যন্তপ্রদেশের আগাছাথেকেই অনেক স্থলজ উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে। পর্যায় বৃত্ত মরা কটালের জন্য উদ্ভিদ্‌গুলি জলাভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অন্যান্য স্থলজ উদ্ভিদের উৎপত্তি স্থলদেশের অভ্যন্তরের জলাশয়ের উদ্ভিদ্ থেকে। জলাশয়গুলি ক্রমশ শুষ্ক হ'য়ে যাওয়ার দরুণ এই উদ্ভিদেরা জীবন যাত্রার পরিবর্তনে বাধ্য হয়ে স্থল উদ্ভিদে পরিণত হয়েছে। সুদূর অতীতে কেবলমাত্র ফার্ণ (Fern), হর্সটেল (Horsetail)-আর মস (Moss)-পরিকীর্ণ অরণ্যের আকৃতি ছিল নিতান্তই মামুলিধরনের। পরবর্তী-যুগে, এই উদ্ভিদ্ থেকেই মহীরুহের জন্ম। এই আদিম উদ্ভিদের না ছিল ফুল, না ছিল ফল। প্রায় ১০০,০০০,০০০ বছর ধরে এরা পৃথিবীর বুকে বিরাজ করেছে।

তৎকালীন উদ্ভিদজগত মূলতঃ বিস্তৃত জলাভূমিতে সীমাবদ্ধ ছিল। বনাঞ্চলের ভেঙে-পড়া গাছের দেহকাণ্ড জলাভূমির জলের মধ্যে যুগযুগ ধ'রে নিমজ্জিত অবস্থায় ছিল। বায়ুর সংগে কোনো যোগাযোগ না থাকায় এরা অকসিজেন-এর অভাবে বিযোজিত হয়ে পরবর্তীকালে কয়লার স্তূপে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পুরাজীবীয় যুগের মধ্যভাগে ব্যাপকহারে কয়লার প্রস্তুতিপর্ব চলেছে। তাই এই যুগ বর্তমান-কালের ভূতাত্ত্বিকদের কাছে অঙ্গারীভবনের যুগ ব'লে পরিচিত।

স্থলে, জলে, শূন্যে যখন অতিকায় সরীসৃপদের একাধিপত্য, তখন সাধারণ প্রাণীর বৃদ্ধির সুযোগ ছিল খুবই কম। হাজার হাজার বছর ধ'রে সংগ্রাম ক'রে ক্রমশ এরা অপেক্ষাকৃত বৃহদাকৃতি লাভ করেছে। এই সময় থেকে নবজীবীয় (Cenozoic) যুগের প্রারম্ভ। নবজীবীয় যুগের প্রাক্‌কালে আকস্মিকভাবে এই বিরাটকায় সরীসৃপবাহিনী পৃথিবীর বুক থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। ফলে, আশাতীত-ভাবে স্তন্যপায়ী জীবেরাই পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হ'য়ে ওঠে।

## সপুষ্পক উদ্ভিদের উত্থান

নবজীবীয় যুগের প্রারম্ভে স্থলদেশে দেখা দিয়েছিল বর্ণরঞ্জিত বিচিত্র পুষ্প আর বিভিন্ন বীজ। যে জগত আজ আমাদের সামনে দৃশ্যমান, সেই জগতের, এমনকি মানুষের নিজের অস্তিত্বও এদের অভাবে কোনোদিন সম্ভব হতো না।

আমাদের খাদ্যশক্তি যোগানের মূলে রয়েছে সপুষ্পক উদ্ভিদের অস্তিত্ব। এদের আবির্ভাবের সংগে সংগে জীবজগতের ধারায় এক আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। কোনো এক অজ্ঞাত উপায়ে পাখী আর স্তন্যপায়ীদের সংগে সংগে এদেরও আবির্ভাব ঘটেছে পৃথিবীর মাটিতে। প্রাচীনতর জগতের মধ্যে সুরু হয়েছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। বীজ এবং ফলপ্রসূ উদ্ভিদ্‌ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতে আরম্ভ করেছে। বীজ থেকে কেন্দ্রীভূত খাদ্যের উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। সপুষ্পক ফলপ্রসূ উদ্ভিদ্‌গুলি ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করেছে। উদ্ভিদের পরাগ পাখি কিংবা মক্ষিকা দ্বারা বাহিত হয়েছে স্ফুটনোন্মুখ পুষ্পে পুষ্পে। নতুন নতুন তৃণভূমির আবির্ভাব হয়েছে। শূন্যে কেবলমাত্র পাখি আর পতঙ্গের একাধিপত্য। তৃণে তৃণে যেসব প্রাণী খাদ্য সংগ্রহ করতো, সিলিকার আধিক্য হেতু তারা নতুন সমস্যার সম্মুখীন হ'লো। সিলিকার কাঠিন্যকে প্রতিরোধ করবার জন্য প্রাণীর দেহে নতুন-ধরনের কঠিন প্রতিরোধক এনামেল দাঁতের আবির্ভাব হলো। ঈষদুষ্ণ রক্তবাহী স্তন্যপায়ীদের সামনে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচিত হলো। এরা ছড়িয়ে পড়লো বিশ্বের সর্বত্র। আর, এদের মধ্য থেকেই নেকড়ে ও বাঘের মতো হিংস্র মাংসাশী শ্বাপদের জন্ম হলো।

এই যুগের সূচনায় ঘোড়া এবং উট আকৃতিতে গৃহপালিত সাধারণ কুকুর বা বিড়ালের চেয়ে বড়ো ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে কুকুরের মতো জন্তুরাই ক্রমশ নেকড়ে ও ভালুকের মতো আকার পেলো; আর, যারা ছিল বিড়ালজাতীয় জীব তারা কালক্রমে সিংহ ও বাঘে রূপান্তরিত হলো।

মায়োসিন (Miocene) যুগে ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশে বিরাটকায় এপ্‌ (Ape) এবং গরিলার আবির্ভাব হয়েছিল। তখন আবহাওয়া ছিল নম্র, আহার্যও ছিল অপরিমিত। হস্তী, রাইনোসেরাস্‌, জলহস্তী, সিংহ, বাঘ প্রভৃতি বিভিন্ন পশু সুখে বসবাস করছিল। এই যুগের কোনো এক সময়ে উত্তরাঞ্চল থেকে বিরাট আকৃতির বরফের স্তূপ দক্ষিণদিকে অগ্রসর হতে থাকে। নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পশুরা দক্ষিণে অগ্রসর হতে সুরু ক'রে। অনেক প্রাণীই দক্ষিণে অগ্রসর হ'তে না পেরে এই সময় ধ্বংস হয়ে যায়। অন্যান্য প্রাণীরা নতুন পরিবেশে নিজেদের অভ্যস্ত

ক'রে নেয়। শীতের কবল থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রকৃতিরাণী নিজেই এদের দেহে দীর্ঘ ফারের আবরণ পরিয়ে দিলেন।

পুষ্টিকর তৃণ খেয়েই মাংসাশী পশুরা জীবনধারণ করেছে। উত্তপ্ত দিন ও হিমশীতল রাত্রিতে এইসব প্রাণীর শক্তিকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে বীজপ্রসূ গুপ্তবীজীদের কেন্দ্রীভূত শক্তি।

এপ্ জাতীয় প্রাণীদের বাস ছিল গাছের উপর। বর্তমান মানুষের তুলনায় এদের আকৃতি ছিল কুৎসিত। আজও যেমন বিড়াল পাখি ধ'রে খায়, এরাও তেমনি হাতে ক'রে পাখি ধ'রে খেতো। চিবিয়ে খাওয়ার জন্য এদের দাঁতও ছিল খুবই শক্ত। পাথর কুড়িয়ে নিয়ে এরাই প্রথম শিখেছিল, কীভাবে অন্যান্য পশুকে আক্রমণ করা যায় এবং কেমন ক'রে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যায়।

শীতকালীন আবহাওয়ায় কোনো কোনো প্রাণীর দল দক্ষিণের উষ্ণঅঞ্চলে পাড়ি জমাতো। কোনো কোনো দল নিজেদের জায়গায়ই থেকে যেতো। তারা পরিবর্তিত আবহাওয়ার সংগে নিজেদের ক্রমশ অভ্যস্ত ক'রে তুলতো। তাই, এরা তাপমাত্রার এবং অবস্থার পরিবর্তনের মধ্যেও টিঁকে থাকতে পেরেছিল।

ব্যাক্‌টেরিয়া এবং আলজি থেকে, মানবের জটিলরূপে জীবনের উত্তরণ। কিন্তু, বিবর্তনের প্রণালীর সম্যক্ ধারণা লাভ করতে হ'লে কেবলমাত্র এই বিকাশের ধারা লক্ষ্য করাই যথেষ্ট নয়। কোন্ অবস্থায় জীবনের সাধারণ স্তর (Simple forms) বিদ্যমান ছিল, কেমন ক'রে তারা বিকাশ লাভ করলো এবং কীভাবে এই জ্ঞান পরিণতি লাভ করলো সে সম্পর্কেও সচেতন হ'তে হবে। জৈবজগতের গঠনের মূলে রয়েছে জীবকোষ; জীবজগতের সব কিছুই এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। জীবদেহের কোষসম্প্রদায়কে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে প্রত্যেকটি কোষের ভূমিকা নির্দিষ্ট। প্রত্যেক কোষের ভিতর আছে একটি 'নিউক্লিয়াস', এবং নানা রাসায়নিক বস্তুর এক জটিল মিশ্রণ, যাকে বলে 'প্রোটোপ্লাজ্‌ম্' (Protoplasm)।

প্রোটোপ্লাজ্‌ম্ হলো জেলি-জাতীয় এক জটিল বস্তু যাকে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর প্রাণপদার্থ হিসাবে গন্য করা হয়। কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন এবং চর্বিজাতীয় জৈব উপাদানের সংগে অজৈব লবন এবং জলের এক জটিল মিশ্রনের কলয়েড-ই হলো প্রোটোপ্লাজ্‌ম্। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে আজও পর্যন্ত প্রোটোপ্লাজ্‌ম্-এর ভিতর এমন কোনো পদার্থ খুঁজে পাওয়া যায়নি, যা অপ্রাণ বস্তুতে অনুপস্থিত। সুতরাং রাসায়নিক উপকরণ এর চিত্তাকর্ষক এবং অতি গুরুত্ব পূর্ণ ধর্মের মূলে নেই, বরং উপকরণগুলির নির্দিষ্ট বিন্যাস আর সংঘবদ্ধাতাতেই এর বিশেষত্ব। মানবদেহের প্রত্যেক জীবকোষের মধ্যেই উত্তেজিতা (Irritability), পরিবহতা, সংকোচনশীলতা, বিপাক, প্রজনন, সম্পূরণ (Integration) এবং অভিযোজ্যতা (Adaptibility) প্রভৃতিগুণের লক্ষণ দেখা যায়। জীবকোষের নিউক্লিয়াসের উপাদান হলো বিশেষ এক কেন্দ্রীয় অম্ল আর প্রোটিন প্রভৃতি বস্তু। বংশানুক্রমিক কার্য্যাবলীর মূলেও রয়েছে এই নিউক্লিয়াস।

মানবদেহের জীবকোষগুলি যদিও মূলতঃ সমজাতীয়, কিন্তু সমস্ত কোষগুলি বিশেষ বিশেষ কোষের কতকগুলি গোষ্ঠি হিসাবে বর্তমান থাকে, যেমন, পেশীকোষ,

রক্তকোষ, শ্লেষ্মার ঝিল্লী গঠক কোষ, সংযোজন কলা কোষ, এবং জনন কোষ। বিভিন্ন কোষ সংবদ্ধ হয়ে কলায় (Tissue) পরিণত হয়। সংবদ্ধ কলাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ধরনে বিন্যস্ত হ'য়ে দেহের নানা প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে। বিভিন্ন রীতিতে সংযুক্ত এই অঙ্গগুলি পরিণত হয়েছে মানবদেহগঠনকারী নানা তন্ত্রে—যেমন, পাকতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, কংকালতন্ত্র, সংবহন, মূত্র ও জননতন্ত্র।

বিনা ইন্ধনে শক্তির সৃষ্টি কোনো যন্ত্রেই সম্ভব নয়। জীবকোষকেও শক্তি-সরবরাহের জন্য ইন্ধন যোগাতে হয়। জীবকোষের অভ্যন্তরে সঞ্চিত খাদ্যের অবিরত দহন হচ্ছে। এই দহনক্রিয়ার নাম দেওয়া হয়েছে ঋনাত্মক বিপাক (Catabolism)। যে প্রক্রিয়ায় জটিল বস্তু গঠিত হ'য়ে জীবকোষে সঞ্চিত হয়, তাকে বলে ধনাত্মক বিপাক (Anabolism)। জীবকোষ যাতে ক'রে নিজেদের গঠনকার্য্য চালাতে পারে তার জন্যে প্রয়োজন খাদ্য যোগানের। এরই সাহায্যে প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌-এর ভিতর নিরন্তর ভাঙাগড়ার কাজ যুগপৎভাবে চলছে। এই প্রক্রিয়ার নাম বিপাক (Metabolism)।

শ্বেতসার, চিনি, স্নেহ, আমিষ, এবং কেন্দ্রীয় অম্ল,—এইসব জৈবযৌগই হ'লো জীবনের উপাদান। এছাড়া, জল, লবন, খনিজ পদার্থ এবং গ্যাস প্রভৃতি অজৈব রাসায়নিক উপকরণও রয়েছে। দেহের শতকরা প্রায় পঞ্চাশ ভাগই আমিষ জাতীয় পদার্থে গঠিত।

জীবজগতের বে'চে থাকার জন্যে চাই খাদ্য। আর, সেই খাদ্যে জৈবযৌগ অপরিহার্য্য। অধিকাংশ উদ্ভিদ্ অজৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে নিজেরাই তাদের প্রয়োজনীয় জৈবখাদ্য তৈরি ক'রে নেয়। খাদ্য প্রস্তুত করবার কাজে কার্বনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন তারা মিটিয়ে নেয় বায়ুস্হিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে। জলের সংগে মিশ্রিত হ'য়ে এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্লুকোজ (Glucose) নামে একধরনের চিনি তৈরি করে। অক্সিজেন-এর কিয়দংশ অঙ্গীভূত হয় গ্লুকোজ-এ, অবশিষ্ট অংশ আশ্রয় নেয় বায়ুমন্ডলে। অ্যামোনিয়া, অ্যামিনো-অ্যাসিড প্রভৃতি নাইট্রোজেন-জাতীয় উপাদানের সংগে গ্লুকোজকে সংযুক্ত ক'রে উদ্ভিদ্ তাদের প্রয়োজনীয় জৈবযৌগ তৈরি ক'রে নেয়। গ্লুকোজ তৈরি করতেও শক্তির দরকার; সে শক্তির উৎস হ'লো সূর্য্যালোক। সূর্য্যের আলোয় গ্লুকোজ তৈরির প্রক্রিয়াকে বলে সালোক-সংশ্লেষ। যদি উদ্ভিদ্কোষে ক্লোরোফিল (Chlorophyll) নামে এক সবুজ রাসায়নিক দ্রব্য বর্তমান থাকে, তবেই উদ্ভিদের এই সালোক-সংশ্লেষ সম্ভব। প্রাণীদেহের কোষে ক্লোরোফিল থাকেনা; ফলে, উদ্ভিদ্ভোজী প্রাণীকে খাদ্যের উৎস হিসাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয়। খরগোস উদ্ভিদ্ ভোজী প্রাণী। নেকড়ে মাংসাশী। আমরা, মানবজাতি, মাংস ও উদ্ভিদ্ দুই-ই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি। যে-সব জীবের জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য্য, তাদের বায়ুজীবী জীব বলে। যেসব জীব বিনা অক্সিজেনে সান্ধন প্রক্রিয়ায় খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের বলা হয় অবায়ুজীবী।

বায়ুমন্ডলের শতকরা ২২ ভাগ অক্সিজেন, ৭৮ ভাগ নাইট্রোজেন, আর সামান্য অংশ কার্বন-ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদ্জাতি বায়ুর এই নাইট্রোজেনকে কাজে

লাগাতে জানেনা। যে নাইট্রোজেন-চক্রের কথা আমরা শুনি, তার কর্মধারা নিম্নরূপঃ—প্রথমে নাইট্রেট থেকে অ্যামিনো-অ্যাসিড এবং প্রোটিনের উদ্ভব; এদের রূপান্তরে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া; অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রাইট, নাইট্রাইট থেকে আবার নাইট্রেট-এ প্রত্যাবর্তন। নাইট্রোজেন-চক্রকে ক্রিয়াশীল রেখেছে ভূমির বীজাণুরা। জীব-পরিত্যক্ত নিদর্শনগুলির ধ্বংসের মূলেও রয়েছে এরাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সূচনা

যে সব প্রাণী পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং হাতিয়ারের ব্যবহার জানে, পুরাতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদের কাছে তারা বিজ্ঞমানব (Homosapien) নামে পরিচিত। প্রাণীজগতে এরাই প্রথম খাদ্য পাক করতে এবং হাতিয়ার ব্যবহার করতে সুরু করে। আনুমানিক, খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩০০,০০০ বছর আগে পৃথিবীতে এদের আবির্ভাব ঘটেছিল।

প্রাগৈতিহাসিক এবং তার পরবর্তী যুগের মানুষেরা যে-সব জড়নিদর্শন ফেলে রেখে গেছে, সেগুলির অনুসন্ধানই পুরাতাত্ত্বিকদের কার্য্যক্রম। তখনকার মানুষ কীভাবে জীবনযাপন করতো, কেমন ক'রে খাদ্যসংগ্রহ করতো, কিউপায়ে হাতিয়ার তৈরি করতো, ফেলে যাওয়া নিদর্শনগুলি থেকে সে সম্পর্কে একটি সঠিক চিত্র অনুধাবন করাই পুরাতাত্ত্বিকের কাজ। খননকার্য্য চালিয়ে তাঁরা প্রাচীনকালের যে-সব নিদর্শন আবিস্কার করেন, যথাযথ ব্যাখ্যার মাধ্যমে সেগুলি থেকে এই চিত্রসৃষ্টি করা হয়।

অন্যান্য প্রাণীর সংগে মানুষের জ্ঞাতিত্বের এবং তার নিজস্ব কীর্তির অনুধাবনই নৃতত্ত্ববিদের অধীত বিষয়। আদিম প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পরমানবিক যুগ পর্য্যন্ত মানুষের ক্রমবিকাশের ধারাকে লক্ষ্য করাই তাঁর কাজ। বিভিন্ন মানবজাতিকে তাদের নিজস্ব ধী, কৃষ্টি, রীতি, তাপ, এবং ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পর্য্যালোচনা করেন। প্রাগৈতিহাসিক অসভ্য মানুষের জীবনও যেমন তাঁর অধীত বিষয়, তেমনি সমকালীন সভ্যমানুষের জীবনও। প্রত্যেক মানুষের মৌলিক প্রয়োজন ও বাসনা সমজাতীয়,—এই হ'লো নৃতত্ত্ববিদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু, প্রয়োজনও বাসনার প্রকাশে ও রূপায়নেই তাদের স্বাতন্ত্র্য।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের লোকেরা সকলেই সমগোত্রীয় ছিল না। পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন গোত্রের আবির্ভাব হয়েছে। যেমন, জাভা মানুষ (খৃঃ পূঃ ৫০০,০০০),

পিকিং মানুষ (খৃঃ পূঃ ৩৫০,০০০), নেন্ডার্থাল মানুষ (খৃঃ পূঃ ১০০,০০০) এবং রোডেসিয়ান মানুষ (খৃঃ পূঃ ২০,০০০)। রোডেসিয়ান মানুষের পরবর্তীকালের বিভিন্ন জাতি বর্তমানকালের অনুরূপ ব'লে এরপর থেকে কেবলমাত্র মানুষজাতি বলেই অভিহিত করা হবে। মানুষ জাতির প্রাচীন ইতিহাসের তিনটি যুগ,—খৃঃ পূঃ ৮০০০ বছর পর্যন্ত ছিল প্রস্তর যুগ, খৃঃ পূঃ ২৫০০ বছর পর্যন্ত গেছে ব্রোঞ্জ যুগ, এবং খৃঃ পূঃ ১৫০ বছর পর্যন্ত হলো লৌহ যুগ।

পরিবহন ও যোগাযোগের অভাবে বিভিন্ন জাতির সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পথে। আজও পৃথিবীর স্থানে স্থানে এমনসব জাতির অস্তিত্ব আছে. যাদের জীবনধারা এখনও প্রস্তরযুগের অনুরূপ রয়ে গেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকাশ ঘটে মধ্যপূর্ব এবং উত্তর আফ্রিকা থেকে। মিশরের মাটিতে প্রথম সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব পূর্ণ কতকগুলি ঘটনার বিকাশ দেখা যায়। খৃষ্টজন্মের ৪,৫০০ বছর আগে সেখানে আবাদের সূচনা হয় ব'লে অনুমান করা হয়। আবাদকার্য্যই মানুষকে একই অঞ্চলে আবদ্ধ ক'রে রেখেছিল। তার আগে মানুষকে শিকারের সন্ধানে এবং পালিতপশুর প্রয়োজনে নতুন নতুন চারণক্ষেত্রের অনুসন্ধানে নানাস্থানে বিচরণ করতে হ'তো। কৃষিকার্য্যের আবিস্কারের সংগে সংগে স্থায়ী সভ্যতার গোড়াপত্তণ হ'লো। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় গড়ে উঠলো বিভিন্ন নগরী। আর, তারই সংগে সংগে বর্ণলিপির আবিস্কার হ'লো। সংস্কৃতিধারার বিকাশের পথে লিপিসৃষ্টিই হ'লো মানুষের মহত্তম পদক্ষেপ। খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছরের মধ্যে ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ায় কৃষিকার্য্যের সূত্রপাত হয়। এই সময়ই ঘোড়া গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়।

বুদ্ধিমান্ মানবজাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে আদিম কাল থেকে প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৭০০০ বছর পর্যন্ত মানুষ স্বাধীনভাবেই বিচরণ করতো। তখন পর্যন্ত সুসংবদ্ধ ও ব্যাপক শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন হয়নি। মানবগোষ্ঠিগুলি ছিল পরিবার প্রধান। আত্মরক্ষার জন্যে ছোটো ছোটো দল একত্রে থাকতো। কোনো আরামপ্রদ আবাসস্থল তখন ছিল না। তাদের বাস ছিল গুহায় এবং প্রস্তর নির্মিত জীর্ণকুটিরে। পারস্পারিক সুবিধার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবার দলবদ্ধ হয়ে থাকতে সুরু করে এবং দলগুলিও সম্মিলিতভাবে একত্র বসবাসে অভ্যস্ত হয় শত্রুর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করবার জন্য এই ছোটো ছোটো দলগুলি গ'ড়ে তোলে সম্মিলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের কোনো নৈতিক বিধিই তখন ছিল না। আদিম মানুষের কাছে সবল ও যোগ্যতমের উদ্বর্তনই ছিল একমাত্র গ্রহণযোগ্য বিধান।

**সংগঠনের পথে মানুষ**

কালক্রমে মানবসম্প্রদায়ের বিচক্ষণ এবং পরিণত বুদ্ধি লোকেরা কতকগুলি সত্য উপলব্ধি করলো। সকল মানবগোষ্ঠির নিরাপদ ও স্বচ্ছন্দ জীবনযাপনের জন্যে শৃঙখলা এবং নিয়মানুবর্তিতাই একমাত্র অবলম্বন। সুশৃঙখল ও ভবিষ্ণু অস্তিত্বের জন্যে তাই ন্যায়সঙ্গত এবং নৈতিক বিবেচনার উপর ভিত্তি ক'রে সামাজিক বিধান নির্দেশ করবার প্রয়োজন হ'লো। এতে ক'রে স্বভাবতই ব্যক্তিস্বাধীনতা কিঞ্চিৎ

খর্ব হয়েছিল, কিন্তু নিজের জন্যে এবং আপন সন্তানসন্ততির মঙ্গলের জন্যে মানুষ এই বিধান মেনে নিয়েছিল। মানুষের নৈপুণ্য এবং উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমোন্নতির সংগে সংগে, তাদের আত্মরক্ষার দক্ষতাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলো। দুর্ভাগ্যক্রমে, আক্রমণ করার কুশলতাও বেড়ে চললো একই সংগে। পাথর ছোঁড়ার বদলে চালু হলো তীরধনুকের ব্যবহার। তীরধনুকের সাহায্যে মানুষ তার শত্রুকে বেশ কিছু দূর থেকে আক্রমণ করতে সক্ষম হ'লো।

কালক্রমে ছোটো ছোটো পরিবার মিলে গঠন করলো সংঘ, সংঘগুলি একত্রিত হয়ে গ্রাম এবং উপজাতিতে পরিণত হলো। শিকার এবং মাছ ধরার কৌশলই ছিল তাদের খাদ্য সংগ্রহের উপায়। উদ্ভিদ্, ফল এবং বীজ পাওয়া যেতো অপর্য্যাপ্ত। বস্তুতঃ, খাদ্যসংগ্রহ ও আত্মরক্ষা, এই দুই-ই ছিল ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে প্রত্যেক মানুষের প্রধান করণীয় কার্য্য। জীবনসংগ্রাম ছিল এক কঠিন কর্তব্য।

বিভিন্নস্থানে মানুষের প্রগতি এবং উদ্ভাবনীশক্তির ক্রমোন্নতির সংগে সংগে জীবনধারণও ক্রমশ সহজতর হয়ে আসছিল। কাঠ, পাথর, কাদা, চূণ, চামড়া, ফার এবং উল প্রভৃতি সহজলভ্য বস্তুকে শ্রেয়তর আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্যে মানুষ অধিকতর নিপুনতার সংগে ব্যবহার করতে লাগলো। খাদ্য প্রস্তুত করার এবং তাকে রক্ষা করার যোগ্যতর উপায় আয়ত্ব করলো মানুষ।

এই আদিম কালে ভেষজবিদ্যা ছিলো নিতান্তই শৈশবস্তরে। সাধারণের রোগের প্রতিকার ছিল ইচ্ছানির্ভর। প্রায়শই, ডাইনীর (Witch) মর্জির উপর নির্ভর করা হতো। ডাইনীরা বিভিন্ন তরলের উত্তেজক কল্পিত ওষুধ ব্যবহার করতো। ক্রমশ, মানুষ তার অভিজ্ঞতাকেই শ্রেষ্ঠগুরুর আসন দিতে শিখলো। তারা আবিস্কার করলো, কোনো কোনো উদ্ভিদ্ ও উদ্ভিদ্ নির্য্যাস কয়েকটি সাধারণ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হ'লো কুইনাইন সম্বলিত কোনো উদ্ভিদ্।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত চিরকালই মানুষকে মুগ্ধ করেছে। ঝঞ্ঝা, ঝড়, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে তাদের নিরাশ্রয় হ'তে হয়েছে, প্রাণনাশও ঘটেছে বিস্তর। অপরাধীর দুষ্কৃতির ভাবনা থেকে ঈশ্বরের প্রতি ভয় এবং ধর্মের প্রয়োজন দেখা দিলো। আবার, অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ নানা প্রাকৃতিক ঘটনার স্থূল ব্যাখ্যা তৈরি ক'রে নিলো। ফলে, প্রকৃতির ভয় ক্রমশ কমে এলো মানুষের মনে।

কৃষির অগ্রগতিই হলো মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের শ্রেষ্ঠতম বরাভয়। খেয়ালীপ্রকৃতির ফল ও উদ্ভিদের উপর আর তাকে নির্ভর করতে হ'তো না। রোপন, বীজকর্ষণ, ফলপ্রসূবৃক্ষবিস্তার, শস্যআবাদ, পালিত পশুর চারণক্ষেত্রের রক্ষণ প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে মানুষ দিন দিন কৃষিকাজের উন্নতিসাধন করতে লাগলো। আবাদের কাজে খাদ্য ছাড়াও চামড়া, উল, এবং তুলো দিয়ে তৈরি বস্ত্রও তারা লাভ করলো। বাসস্থানের উন্নতি হলো; প্রাকৃতিক দুর্যোগে, শীত ও গ্রীষ্মের দিনে মানুষের নিরাপদ আশ্রয় হ'লো।

**প্রাচীন সভ্যতার সূচনা**

পৃথিবীর ইতিহাসে যদিও বহু ঘটনা এবং বহুলোকের অবদান রয়েছে, তথাপি স্বকীয় কারণে কতকগুলির গুরুত্ব থেকে যায় সবার উপরে। সভ্যতার সূচনা যদি

আদৌ কোনো স্থানে হয়ে থাকে, তবে সে-স্থানটি হলো সুমার (Sumer) প্রদেশ। সুমারের অধিবাসিরা তাদের গৃহনির্মাণের জন্যে সূর্য্যাতপে শুকিয়ে ইঁট তৈরি করতো। এই অঞ্চলের মানুষই প্রথম লেখাপড়ার কৌশল আয়ত্ব করেছিল। এদের আহারাদি ও জীবনযাপনের মান ছিলো অত্যন্ত উন্নত। রাজপরিবারে সোনা ও রূপোর অলঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিলো।

তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর চারপাশে অধুনা ইরাক নামে পরিচিত মেসোপটেমিয়া প্রদেশে বিশ্বের প্রথম নগর পত্তন সুরু হয়েছিল খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩৫০০ থেকে ২৫০০ বছর আগে। কালক্রমে, যে সব নগরকে কেন্দ্র করে সুমার দেশ গড়ে উঠেছিল, তাদের অধিবাসিরা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হলো। পরিণামে, দেশটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

প্রথম নগরপত্তনের গৌরব যেমন সুমারের, মিশর তেমনি সমান এক গুরুত্বপূর্ণ গৌরবের অধিকারী,—সে হ'লো ঐক্যবোধের সূচনার গৌরব। রাজার দেবত্বের মতো আরও একটি ধারণা যুগপভাবে সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীনতম মানুষের মনে অতীন্দ্রিয় শক্তি সম্পর্কে মোহ বরাবরই ছিল। সুমারবাসিরা এই অতীন্দ্রিয়তাবাদের সংস্কার সাধন ক'রে মানুষের মানসপটে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করলো। মিশরীয়েরা দিয়েছিল ঈশ্বরের প্রথম বাস্তব রূপ।

খৃষ্টজন্মের প্রায় ৩১০০ বছর আগে নীলনদের উধর্বদেশের রাজা মেনিস (Menes)-ই প্রথম বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন প্রদেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তী ৪০০ বছর হলো মিশরের ক্রমোন্নতির যুগ। এই দীর্ঘ সময় ধ'রে শিল্পকলা, স্থাপত্য ও রচনাশৈলীর ক্রমবিকাশ দেখা যায়। জগতের প্রথম কালি ও কাগজ এখানেই তৈরি হয়। নীল নদের বার্ষিক বন্যাকে ভিত্তি ক'রে এখানেই প্রথম ৩৬৫ দিনের দিনপঞ্জী রচিত হয়। যেমন বিশাল দেশ ছিল মিশর, তেমনি যোগ্য ও সফল শাসনের জন্য মিশরপতিদের ছিল এক বিরাট সংস্থা। রাজার অধীনে ছিল মন্ত্রী, রাজ্যপাল ও নগরপ্রধান। এইসব অমাত্যবর্গের অধীনে ছিল বহুসংখ্যক সচিব ও করণিক। গৃহনির্মানের জন্যে মিশরীয়েরা চুনাপাথর ও গ্র্যানাইট পাথর ব্যবহার করতো। তখন, লৌহনির্মিত যন্ত্রপাতির প্রচলন ছিল না। প্রয়োগবিদ্যা এমন একটি উন্নতস্তরে উঠেছিল যে, মিশরীয়দের সৃজনীশক্তির বিকাশও ঘটেছিল নানা দিকে। সারা নীলনদের অধিত্যকায় পিরামিড, স্ফিংক্স্ এবং অধুনা দীর্ণ অসংখ্য মন্দিরের মতো বিরাট কীর্তিস্তম্ভ আজও সেই প্রয়োগবিদ্যার উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করছে। বিজ্ঞানের আরও একটি শাখাতেও মিশরবাসীর পদক্ষেপই প্রথম, সে হলো ভেষজ-বিদ্যার চর্চা। মিশরের বহু সমাধিস্তম্ভে যে সব প্রামান্য নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে, তাদের অন্যতম হল ভেষজ ও শল্যবিদ্যায় প্রাচীনতম পুস্তক। এর বিষয়বস্তু ছিল রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যবস্থা, ক্ষতস্থানের সন্ধি, ব্যাণ্ডেজ, ভগ্নাস্থির জন্য বন্ধফলকের ব্যবহারের বিধি, এবং ওষুধ ও তার উপাদান সম্পর্কে নির্দেশ।

অবিভক্ত ভারতবর্ষের অন্তর্গত সিন্ধুনদের উভয়তটে আরও একটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। খৃষ্টজন্মের প্রায় ২৩০০ বছর আগে এই সভ্যতা সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। যদিও তখন লিখনরীতির প্রচলন ছিল, কিন্তু পাঠসংকেত আবিস্কার করা

যায় নি ব'লে তৎকালীন লিপির কোনো অনুবাদ করা যায় নি। খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ বছর থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে সিন্ধুসভ্যতার দ্রুত প্রসার ঘটে। তামা, রুপো, সোনা এবং মূল্যবান পাথর দিয়ে তারা অলংকার তৈরি করতো। গণিতশাস্ত্র এবং দৈর্ঘ্যমাপক দণ্ডের (Scale) ব্যবহার প্রচলিত ছিল। পুরাতাত্ত্বিক খননকার্য্য থেকে যে সব টুকরো টুকরো নিদর্শন পাওয়া গেছে, সেগুলি একত্রিত ক'রে তখনকার মানুষ ও তাদের জীবন সম্পর্কে অনেক সত্য জানা গেছে। এই নিদর্শন থেকে মনে হয়, তৎকালীন নগরগুলি ছিল সুপরিকল্পিত। প্রশস্ত রাজপথের দুপাশে গৃহগুলি ছিল আয়তাকার, পয়ঃপ্রণালীরও সুব্যবস্থা ছিল। উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে সিন্ধুসভ্যতা প্রায় ১০০০ বছর সময় ধ'রে তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। এই একহাজার বছরের মধ্যে আর কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি।

এদিকে, ফিনিসীয়জাতি (Phoenician) বসতি স্থাপন করেছিল ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে। তারা ছিল প্রবল সামরিক শক্তির অধিকারী। এরা নৌবহর পর্য্যন্ত নির্মান করতে জানতো। খৃষ্টপূর্ব ৬০ সালের ভিতর এরা লেখার উপযোগী কাগজ প্রস্তুত করেছিল। পরবর্তী যুগে, আসিরীয় (Assyrian), মিশরীয় ও ইহুদীদের সংগে এরা যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সে যুদ্ধে আসিরীয়জাতির হাতে এদের পরাজয় ঘটে।

পশ্চিমে ইউরোপের দিকে ক্রমপ্রসারমান সভ্যতার প্রথম আলো এসে পৌঁছয় ঈজিয়ান সাগর (Agean Sea) অঞ্চল এবং ক্রীট দ্বীপে। মিনোসের বংশধরেরা এই অঞ্চলেই প্রথম ইউরোপীয় সভ্যতার বনিয়াদ রচনা করেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরেজ পুরাতাত্ত্বিক ক্রীট দ্বীপে মিনোস রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কার করেন। অথচ, খৃষ্টজন্মের ২৫০০ বছর পূর্ব পর্য্যন্ত এই দ্বীপের অধিবাসিরা গুহায় বাস করতো। ক্রীট দ্বীপ ছিল বানিজ্যের প্রাণকেন্দ্র। খৃষ্টপূর্ব ১৭০০ সালে এক ভূমিকম্পে এই দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যায়।

গ্রীকসভ্যতার সূচনার সমসাময়িক কালে ইতালির পশ্চিমকূলে ইত্রুস্কান সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছিল। যদিও এই সভ্যতার আয়ু অন্যান্য সভ্যতার তুলনায় ছিল স্বল্পকালীন; তবু ইউরোপের ইতিহাসে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিচক্ষণ জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতমহলে আজও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। এরা ছিল উচ্চস্তরের যোদ্ধা। লোহা, তামা, সোনা প্রভৃতি অনেক রকম ধাতুর কাজে এরা অত্যন্তকুশলী ছিল। এদের বানিজ্যবহর ভূমধ্যসাগরের বুকে পাড়ি জমিয়ে ধনসম্পদে দেশ পূর্ণ ক'রে তুলেছিল। অতি উন্নত ধর্ম, বৈভব, ও সামরিক শক্তির অধিকারী হয়েও এরা একদিন হঠাৎ ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেলো। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৮০০ বছর আগে ইতালির বর্তমান টাস্কেনি প্রদেশে ইত্রুস্কান সমাজের সূত্রপাত হয়েছিল বলে জানা গেছে। ২০০ বছরের মধ্যে ইত্রুস্কান নৃপতিরা রোমের শাসক হয়েছিল। কিন্তু, খৃষ্টজন্মের সমসাময়িককালে রোমানদের মধ্যে এরা বিলীন হ'য়ে যায়। এই স্বল্পকালের মধ্যে এরা নাবিক ও নৌযোদ্ধা হিসাবে নৈপুণ্য অর্জন করেছিল। এরা ছিল কুশলী অশ্বারোহী এবং স্থলযুদ্ধেও সমান পারদর্শী। এরা বহু নগর প্রতিষ্ঠা করেছে, জয়ও করেছে। অল্পকালের ভিতরেই তারা সফল বনিক, খনিজীবী, ও ধাতুকর্মকারে পরিণত হয়েছে। নানা ধরণের ক্রীড়া, দ্যূত, সংগীত, চিত্রকলা এবং ভাসকর্য্যেও এদের অসামান্য অনুরাগ ছিল।

শিকার ছেড়ে মানুষ যেদিন প্রথম চাষ আবাদে মন দিলো, সেই দিন থেকেই সভ্যতার সূত্রপাত। তা যদি সত্য হয়, তবে একথা মানতেই হবে যে, নবাবিস্কৃত আমেরিকা মহাদেশেও সভ্যতার আলোর ছোঁয়া লেগেছিল খৃষ্টজন্মের ২৫০০ বছর আগেই। কিন্তু আমেরিকায় প্রকৃত সংস্কৃতির প্রথমবিকাশ ঘটেছিল খৃষ্টজন্মের প্রায় একহাজার বছর আগে মায়া জাতির অভ্যুত্থানে। পণ্ডিতেরা মনে করেন, এশিয়া মহাদেশ থেকে আমেরিকায় মানুষের প্রথম পদচিহ্ন পড়েছিল। তাদের এই ধারনার কারণ হলো এই যে, নেভাদা অঞ্চলে চীনদেশে প্রভূত হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মধ্য ও উত্তর আমেরিকার অন্যান্য জাতির মতো মায়াজাতিকেও নির্ভর করতে হতো ধান, গম, ভূট্টা প্রভৃতি শস্যের উপর। বর্তমানে গুয়াতেমালা ও ইউকাতান নামে পরিচিত অঞ্চলের উপদ্বীপের সংকীর্ণ অংশে একদিন মায়াজাতির বিকাশ দেখা গিয়েছিল। তারা বড়ো বড়ো মন্দির, ও পিরামিড নির্মাণ করেছে, সৃষ্টি করেছে দেওয়ালচিত্র ও ভাস্কর্যের, স্থূলবর্ণ রচনা করেছে, ইউরোপ মহাদেশ থেকেও অধিকতর উন্নত দিন-পঞ্জীর উদ্ভাবন করেছে। তারা যে গণিতশাস্ত্রের প্রচলন করেছিল, শূণ্য সংখ্যাটি তার অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাদের মহাকাশ সম্পর্কিত জ্ঞানও উন্নতস্তরে পেঁাছেছিল। সমধিক খ্যাত মায়া জাতির সংস্কৃতির পাশাপাশি আরও অন্ততঃ তিনটি সংস্কৃতির অস্তিত্ব ছিল বলে জানা গেছে। ওলমেক (Olmec), তিয়োতিহুয়াকান (Teotihuacan) এবং জাপোতেকমিক্‌স্‌তেক (Zapotec-Mixtec) নামে এরা পরিচিত।

আরও দক্ষিণে পেরুর পার্বত্য অঞ্চলে চাভিন দ্য হুয়ানটার (Chavin-de-Huantar) নামে পরিচিত এক জাতি আরও একটি নতুনতর সংস্কৃতির ধারক। এই সংস্কৃতিই আন্দিস (Andes) প্রদেশের বিবর্তিত সভ্যতার প্রথম স্তর। দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে এই সভ্যতার ধারা বহুবিশ্রুত ইনকা (Inca) সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সীমায় এসে পেঁাছেছিল। চাভিনরা তাদের সংস্কৃতির পতনের আগে যে মন্দির ও প্রস্তর খোদিত মূর্তি নির্মাণ করেছে, সৌকর্যে তা ইনকা সাম্রাজ্যের অধিবাসিদের কীর্তির চেয়েও শ্রেষ্ঠ। খৃষ্টজন্মের প্রায় ৪০০ বছর আগে চাভিনদের স্থান নেয় পারাকাস (Paracas)-এর অধিবাসিরা। এদের খ্যাতিছিল আপন দেশে নির্মিত স্মারকস্তম্ভগুলির জন্যে। তারা যে বস্ত্র প্রস্তুত করেছে, বর্তমানযুগের প্রস্তুত যেকোনো বস্ত্রের সংগে তা পাল্লা দিতে পারে। মন্দিরের নিচে যেসব বস্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে, তা এতসূক্ষ যে প্রতিইঞ্চি বস্ত্রে একশো সুতোর বুনানি পাওয়া গেছে। এবং, এসব বস্ত্রের রঙ্‌ এখনও স্পষ্ট ও উজ্জ্বল রয়েছে।

**মধ্যবর্তী যুগ ও অন্ধকার যুগ**

'মধ্যবর্তী যুগ' বলতে বোঝায় পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত হাজার বছরের মতো সময়কাল। এই যুগের প্রথমার্ধকে বলা যেতে পারে 'অন্ধকার যুগ',— আর দ্বিতীয়ার্ধ হলো 'মধ্য যুগ'। বর্তমানে প্রচলিতধারা অনুযায়ী প্রাচীনজগতের

মধ্যবর্তী যুগ (খৃষ্টাব্দ ৫০০ থেকে ১৫০০)

অন্ধকার যুগ (খৃষ্টাব্দ ৫০০ থেকে ১১০০) মধ্যযুগ (খৃষ্টাব্দ ১১০০ থেকে ১৫০০)

পতনের পরবর্তী শতকগুলিকে মধ্যবর্তীকাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। যেসব গ্রন্থকার এই শব্দটির স্রষ্টা, তাঁদের উদ্দেশ্যছিল প্রাচীন যুগের সংগে উল্লিখিত যুগের পার্থক্য দেখানো। সাধারণ এক ধর্মীয় বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ ইউরোপের কৃষ্টির চেয়ে, এইসব গ্রন্থকারেরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সংগে বেশি ঘনিষ্ঠতা বোধ করতেন।

আলোচ্য যুগগুলির মধ্যে যদিও নির্দিষ্ট কোনো সীমানির্দেশক রেখা নেই, তবু রোমকসাম্রাজ্যের পতনের পর যে ছয় শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, নির্ভুল ঐতিহাসিক দলিলের অভাবে তাকেই সাধারণতঃ অন্ধকার যুগ ব'লে উল্লেখ করা হয়। স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে নিতান্ত নিরুৎসাহজনক বিধিনিষেধের ফলে তখনকার এমন অনেক ঘটনাই লিপিবদ্ধ হয়নি, যেগুলি তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারে। ফলে, যে কটি শতাব্দী ধ'রে মধ্যযুগীয় ইতিহাসের প্রস্তাবনা রচিত হচ্ছিল, পরবর্তী যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তারা অন্ধকারাবৃতই রয়ে গেলো।

প্রাচীন কৃষ্টির যুগে, পূর্ববর্তীকালের জীবনসংগ্রামরত ইউরোপীয়দের যারা পূর্বপুরুষ, তারা বর্বর ছিল না। তারা ছিল অর্ধসভ্য, বুদ্ধিমান্ আর তেজস্বী। বিভিন্ন কুপ্রভাবের উপর হয়তো তাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল। যে উন্নত সংস্কৃতির সংগে এদের প্রথম যোগাযোগ হয়েছিল, গ্রীসদেশে তার উৎপত্তি; গ্রীক-পণ্ডিতেরাই জগতের কাছে তাকে উপস্থাপিত করেছিলেন। ক্রমে আরব, রোম ও ইহুদী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এই সভ্যতার জ্ঞান ভাণ্ডার আরও প্রশস্ত হয়েছে এবং তাদের দ্বারা প্রভাবিতও হয়েছে নানা ভাবে। প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অগ্রগতির এই ধারা অব্যাহত ছিল। তারপর, বহুদিন পর্যন্ত কঠোর ধর্মীয় শাসনে সমস্ত স্বাধীন চিন্তাধারাই খর্ব হয়ে গিয়েছিল।

মধ্যবর্তী যুগের এই সময়কে প্রাচীন ও বর্তমান জগতের এবং তার সংস্কৃতির মধ্যস্থিত অন্তর বা ফাঁক হিসাবে গণ্য করা হয়। হাজার বছরেরও বেশি সময় ধ'রে বিস্তৃত এই যুগের যে বৈশিষ্ট্যের কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়, সে হলো সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির অচলাবস্থা। এই জড়তার মূলে ছিল সামন্ততন্ত্র। গীর্জা প্রচারিত অন্ধ ধর্মমত এবং মতবাদ সামন্তবর্গ অন্ধভাবে অনুসরণ করতো। ফলে, এদের কাছে স্বাধীন ধ্যানধারণা সবসময়ই লাঞ্ছিত হতো। এই অচলাবস্থার মূলে অন্যান্য কারণও ছিল; অস্তিত্বের জন্যে বিভিন্ন জাতি নিরন্তর সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। ইউরোপের বাইরের যুদ্ধলিপ্সু জাতিরা বারবার আক্রমণ পরিচালিত করেছে মহাদেশের অভ্যন্তরে। তুর্কীরা ভিয়েনা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিল, আরবরা অধিকার ক'রে নিয়েছিল স্পেনদেশ। এসব কারণেও সংস্কৃতির অগ্রগতি কিছুদিনের মতো একেবারে রুদ্ধ হ'য়ে ছিল।

এই যুগের প্রারম্ভে রাজন্যবর্গ এবং সামন্ত প্রভুরা গীর্জাকে সমর্থন করতো। পরবর্তীকালে, গীর্জাই শাসকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল ক'রে ধর্মীয় কর্তৃত্বের সংগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাও গ্রহণ করলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকজন আবার ধর্মীয় নেতৃত্বের ভেক নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে গীর্জার অধীনে ইউরোপের এক তৃতীয়াংশ ভূমি চলে এসেছিল। প্রায় হাজার বছর ধরে গীর্জা ইউরোপমহাদেশের অধিকাংশ লোককে

একটি সাধারণ আদর্শে এবং ধর্মীয় আচারে বেঁধে ফেলেছিল। প্রগতিশীল মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সব রকম ধর্মের গোঁড়ামি। এই সব অনুশাসনের অনেকগুলিই আজ আর নেই। পূর্বেকার গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সকল চিহ্ন গোপন অথবা বিকৃত করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অ্যারিষ্টটলের রচনাবলীর কেবলমাত্র প্রচলিত ধারণার অনুবর্তী অংশগুলিকেই প্রকাশ করা হয়েছিল।

**ধর্মীয় বিভীষিকার রাজত্ব**

ধর্মবিরোধী এবং ধর্মচ্যুতদের শাস্তিবিধানের নিরঙ্কুশ ক্ষমতার জন্য গীর্জা তার নিজস্ব আদালত সৃষ্টি করেছিল। মধ্যবর্তী যুগের বিভিন্ন সময়ে এইসব আদালতগুলি ইউরোপের নানা দেশে সক্রিয় ছিল। এখানে গীর্জার গোঁড়ামির যেকোনো রকম বিরুদ্ধাচরণের জন্য অভিযুক্ত দোষীর বিচার করা হতো।

গীর্জাতন্ত্রের প্রথম ৫০০ বছর ধর্মবিরোধীদের প্রকাশ্যে সরকারীভাবে কোনো নির্যাতন ভোগ করতে হয়নি। তাদের বিভীষিকার রাজত্বের সূত্রপাত হয়েছিল প্রায় দশম শতকে এবং প্রায় সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন মাত্রায় এই বিভীষিকার রাজত্ব চলেছিল। এই যুগে ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন এবং ইংল্যাণ্ডে বহু ধর্মবিরোধীদের জীবন্ত দগ্ধ ক'রে অথবা অন্য উপায়ে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে গীর্জার বিরুদ্ধাচরণের মাত্রা ছিল কম, সেখানে সাধারণত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতো অথবা কয়েকমাস থেকে সুরু ক'রে যাবজ্জীবন পর্যন্ত কারাবাসের ব্যবস্থা করা হতো। এ ছিল লঘু শাস্তি। গীর্জার এইসব আদালতে অভিযুক্তদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই বিচার ক'রে রায়দান করা হতো। গ্যালিলিওকে জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর আবিষ্কার প্রচার করার জন্য গীর্জার বিরুদ্ধাচরণের সন্দেহে অভিযুক্ত ও বিচার করা হয়েছিল। এই জন্য তিনি কারাদণ্ডও ভোগ করেছিলেন। একমাত্র পঞ্চম পোপ পলের হস্তক্ষেপের ফলে কোনোক্রমে তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছিল।

এই বিচারসভার রূপ সবচেয়ে নৃশংস ছিল স্পেনদেশে। অপরাধীকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা ছিল এখানকার সাধারণ মৃত্যুদণ্ড। গীর্জার বিরুদ্ধাচরণের সন্দেহে অভিযুক্তদের উপর নির্যাতন এত ব্যাপক ছিল যে, এমনকি লয়োলা-র (Loyola) বিখ্যাত সেণ্ট ইগ্‌নেতিয়াসকেও (St. Ignatius) প্রথম জীবনে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছিল। স্পেনদেশীয় উপনিবেশের প্রসারের সংগে সংগে সাম্রাজ্য বিস্তারের জয়যাত্রায় সব সময় রাজপতাকার সঙ্গী থাকতো গীর্জার এই বিচার সভা।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জীবন ও জগত সম্পর্কে মানুষের মনোভাবের মধ্যে এক আমূল পরিবর্তন দেখা গেল। কঠিন নিয়মশৃঙ্খলায় আবদ্ধ মধ্যযুগীয় জগতের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হলো। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক যুগে মানুষ যে চেতনার ধারক ও বাহক ছিল, এবং মধ্যযুগে যে চেতনা সাময়িকভাবে অপসৃত হয়েছিল, আবার তার পুনরুজ্জীবন দেখা গেলো। এই পুনরুজ্জীবনেই নবযুগের নতুন সভ্যতার সূচনা। পুনরুজ্জীবনের শৈশবকালে প্রাথমিক অগ্রগতির মূলে ছিলেন প্রধানতঃ সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, নীতিবিদ্, শিল্পী, স্থপতি এবং রাজনীতিকেরা। যাঁরা এই গোষ্ঠিভূক্ত ছিলেন, লোকে তাঁদের

বলতো মানবতাবাদী (Humanist)। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বিজ্ঞানের, বিশেষ ক'রে অ্যারিষ্টটল রচিত পদার্থবিদ্যার বিরোধী ছিলেন। তাঁদের এই বিরূপতা, কোনো কোনো দিক থেকে, তাঁদের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপন্থীই ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের যুগে অগ্রগামী এই মানবতাবাদীর দল বিজ্ঞানের নবরূপায়নের ক্ষেত্রে শেষপর্যন্ত সাহায্যের বদলে বরং প্রতিবন্ধকতাই করেছেন। লিওনার্দো, কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও প্রভৃতি অ্যারিষ্টটল-পন্থী বৈজ্ঞানিকদের বিরোধিতা করার জন্যে গীর্জাও তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

### আধুনিক মানবসমাজের জাগরণ

আধুনিক মানুষের কাছে আপনা থেকে একথা মনে হয়েছে যে, প্রকৃতি, মহাকাশজগত, পৃথিবী, উদ্ভিদ্, প্রাণী এবং রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ ও গঠন-রীতির নিরীক্ষণের উপর ভিত্তি ক'রে রচিত হবে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। কিন্তু, মধ্যবর্তীযুগের মানুষের ধারণা ছিল প্রাচীন সভ্যজাতি সমূহের রচনা, স্বীকৃত সংকীর্ণ পথে যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাধারা, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ এবং অন্যান্য যথাবিধি ঘোষিত ধর্মীয় অনুশাসনই সাধারণ জ্ঞান লাভ করবার পক্ষে যথেষ্ট। অনেক বিজ্ঞানী গীর্জার উপদেশাবলীর অনুবর্তী মত প্রকাশে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা নিরুপায় ছিলেন বলেই ব্যক্তিস্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুসরণ করেছেন। ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ তাইচো ব্রাহে (Tycho Braha, 1564-1601) প্রচলিত ধর্মীয় শিক্ষা-ধারার সংগে মতৈক্য বজায় রাখবার জন্যে আকাশবিজ্ঞান সম্পর্কে এক মাঝামাঝি মতবাদ প্রচার করলেন। এই মতবাদ অনুসারে, বিশ্বজগত হ'লো পৃথিবী কেন্দ্রিক। সূর্য্য এবং চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে এবং পাঁচটি গ্রহ প্রদক্ষিণ করছে সূর্য্যকে। এদিকে, গ্যালিলিও ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মতে পৃথিবীই সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে। গীর্জার কর্তৃপক্ষ তাইচো ব্রাহের এই জগতব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অনুমোদন করলেন। অনুরূপভাবে ধর্মপুস্তকের সংগে কোপার্নিকাসের তত্বেরও সামঞ্জস্য বিধান করা যায় নি। এযুগে বিজ্ঞানীরা সর্বদা স্ত্রস্ত থাকতেন, কখন গীর্জার কতৃপক্ষেরা তাঁদের নতুন বৈজ্ঞানিক ধারনায় ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ দেখতে পাবেন। ফলে, এযুগে প্রাচীন ধারণাগুলিই, কার্য্যতঃ, অপরিবর্তিত থেকে গিয়েছিল। ইউরোপের বাইরে বিভিন্ন দেশে অবশ্য কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল। বিশেষতঃ, আরবদেশে গণিত, রসায়ণ এবং জ্যোতির্বিদ্যার উল্লেখযোগ্য উন্নতিই ঘটেছিল।

সপ্তদশ শতকের পর সংস্কৃত গীর্জাগুলি এবং রোমান ক্যাথলিক গীর্জা স্বয়ং বিজ্ঞানী ও শিক্ষকদের স্বাধীন চিন্তার উপর থেকে বিধিনিষেধের রাশ কিছুটা আল্গা করে দিয়েছিলেন। তাই, এই সময় থেকে বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় আবিস্কার এবং কীর্তির দ্রুত অগ্রগতি সুরু হলো। অবশেষে, মধ্যবর্তীযুগের এই দীর্ঘরাত্রির অবসান হলো। মানুষ জেগে উঠলো তার সুদীর্ঘ সুপ্তি থেকে।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# *বিংশ শতাব্দী*

পঞ্চদশ শতকের গোড়ার দিকে যেসব বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনায় বিশ্বের অগ্রগতির প্রাথমিক সোপান গড়ে উঠেছিল, তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicholus Copernicus)। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। তিনিই প্রথম প্রমান করেন, সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে সূর্য্য। কোপার্নিকাসের ৯১ বছর 'পর গ্যালিলিও-র জন্ম। তিনি প্রমান ক'রে দেখালেন, ছোটো কিংবা বড়ো, যেকোনো ওজনের বস্তুই সমান উচ্চতা থেকে ভূমিতে পড়তে একই সময় নেয়। এরপর বিজ্ঞানজগতে নিউটনের আবির্ভাব। তিনি চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের কারণ অনুসন্ধান করতে লাগলেন। আবিস্কৃত হলো মাধ্যাকর্ষন বল। এক্স্-রে নামে এক নতুন রশ্মির সন্ধান পেলেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম রয়েণ্টগেল (William Roentgen)। রয়েণ্টগেনের জন্ম ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে। রাদারফোর্ড আবিস্কার করলেন, পরমাণুর গঠনের মূলে আছে প্রোটন এবং ইলেকট্রন। পরমানবিক গঠনরীতি সম্পর্কে এক নতুন তত্বের অবতারণা করলেন নীল বর (Neil Bhor)। ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক (Max Plank) 'কোয়ান্টাম তত্ব' নামে এক নতুন মতবাদ উদ্ভাবন করলেন। আলবার্ট আইনষ্টাইন (Albert Einstine) সৃষ্টি করলেন 'আপেক্ষিকবাদ'। তিনিই প্রথম দেখালেন, বস্তুর ভর আর শক্তি সমতুল্য।

এই রচনার শেষে যে পরিশিষ্ট যোগ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। এই পরিশিষ্টে আছে, সেই সব বিজ্ঞানীদের আবিস্কারের বিশদ ব্যাখ্যা, যাঁদের অবদানের গড়ে উঠেছে আমাদের বর্তমান সভ্যতা, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং বিভিন্ন শিল্প।

বিগত পঞ্চাশ বছরে, শিল্পের এত দ্রুত প্রসার ঘটেছে যে, অনেক অগ্রগতির ফলাফলই অজ্ঞাতসারে আমাদের দৈনন্দিন কর্মজীবনের সংগে মিশে গেছে। সুতরাং সাম্প্রতিক অগ্রগতির প্রধান সোপানগুলির উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

**মোটর গাড়ি (Automobiles):** ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় প্রতি দশহাজার লোকের একটি ক'রে মোটর গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। আজ প্রতি তিনজন লোকের একটি গাড়ি। কারখানা থেকে যে লক্ষ লক্ষ মোটর গাড়ি বেরিয়ে আসছে, সেগুলির সুবন্দোবস্তের জন্য প্রতি বছর কোটি কোটি ডলার ব্যয় করা হচ্ছে বিভিন্ন রাজপথ, সেতু এবং অন্যান্য সহকার শিল্পের খাতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উড়োজাহাজ ছিল, কোনোমতে উড়তে পা'রে এমনি একটি যন্ত্র। আজ সদাগরি উড়োজাহাজগুলি প্রতিক্ষেপে ১৫০ জনের মতো যাত্রী নিয়ে ঘন্টায় ৫০০ থেকে ৬০০ মাইল বেগে আকাশ পথে দেশে দেশান্তরে পাড়ি জমাচ্ছে। সম্ভবতঃ, আর কয়েক বছরের মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টারও কম সময়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করবার মতো বেগ অর্জন করা যাবে।

আজকাল বেকেলাইট, পলিথিলিন, পলিপ্রপিলিন, পি.ভি.সি., সারান, প্লেস্কিগ্লাস, পলিস্টিবিন, প্রভৃতি নানাধরণের নমনীয় দ্রব্যের (Plastic materials) প্রচলন হয়েছে। সাধারণতঃ, মোড়ক, নলের সাজসরঞ্জাম, আবরণ এবং অন্তরনের কাজে এই বস্তুগুলি ব্যবহার করা হয়।

জনসাধারণের পরিধেয় বস্ত্রের সমস্যা মেটানোর জন্য রেয়ন, নাইলন, অরলন, অ্যাক্রিলন, ডেক্রন, গার্লন এবং অন্যান্য অনেক সাংশ্লেষিক তন্তু (Synthetic fibre) প্রস্তুত করা হয়েছে।

**যোগাযোগ (Communication):** ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যোগাযোগের জন্য আমরা টেলিগ্রাম এবং টেলিফোন ব্যবহার করেছি। তারপর থেকে রেডিও, টেলিভিশন, রাডার, এবং কৃত্রিম উপগ্রহ এই তালিকায় যুক্ত হয়েছে।

অ্যালুমিনিয়াম, মরিচাহীন ইস্পাত, টিটানিয়াম প্রভৃতি ধাতুর নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠছে। উচ্চচাপ এবং ভিন্ন ভিন্ন তাপমাত্রার উপযোগী নানাধরণের সংকর ধাতুর শিল্পও সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, সাংশ্লেষিক রবার, নানাধরনের পরিস্কারক, বিভিন্ন পারিবারিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, সিনেমা, কম্পিউটার, মহাশূন্যের রহস্য নির্ণয়, বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদনের জন্যে অতিপরমানবিক শক্তির ব্যবহার, এইসব নানাধরনের মূল্যবান্ আবিষ্কার সম্প্রতিকালের মধ্যে ঘটে গেছে।

**তড়িৎশক্তির উৎপাদনে অগ্রগতি**

গত পঞ্চাশ বছরে তড়িৎশিল্পের যে অগ্রগতি ঘটেছে, তা সত্যই বিস্ময়কর। মাথাপিছু বিদ্যুৎ শক্তির ব্যয় সম্প্রতিকালে দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ এমনই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, বিদ্যুৎ সরবরাহের সামান্য গোলযোগে আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন একেবারে বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হয়। প্রাচীনকালে গায়ের জোরই ছিল মানুষের কাজের একমাত্র অবলম্বন। আজ আমরা যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়েছি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে স্থির এবং সচল যে শক্তিযন্ত্র স্থাপিত হয়েছে তার সামর্থ্য (Capacity) ৮০ কোটি কিলোওয়াটেরও বেশি। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মাথাপিছু ভাগ হলো ৫ কিলোওয়াট।

এক নম্বর তালিকায় পনেরোটি দেশের তড়িৎ উৎপাদনের জন্যে যেসব যন্ত্র স্হাপিত হয়েছে, তাদের উৎপাদন সামর্থ্য দেখানো হয়েছে, সংগে সংগে দেশগুলির নামও উল্লেখ করা হয়েছে। এই তালিকা অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে শক্তিউৎপাদনের সামর্থ্য মাথাপিছু এক কিলোওয়াট। বিভিন্ন দেশে কত কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমান শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে, তা-ও দেখানো হয়েছে এই তালিকায়। নরওয়ে ও কানাডায় মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমান যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও বেশি। তার কারণ, তাদের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া রেলজাতীয় কয়েকটি শিল্পে তারা কয়লা ও তেলের বদলে বিদ্যুৎশক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রে এখনও এসব ক্ষেত্রে বিদ্যুৎশক্তির প্রচলন হয়নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতেই বিভিন্ন শিল্পকে বিদ্যুৎচালিত করবার জন্যে বেশি ক'রে শক্তিউৎপাদন সামর্থ্য গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যেই সেসব দেশে তড়িৎক্ষমতা উৎপাদনের বিস্ময়কর উন্নতি দেখা যাবে।

বাষ্প, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (Hydro electric plant), মোটর গাড়ি, ট্রাক্টর, রেলগাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতি অন্তর্দহন ইঞ্জিন থেকে বিভিন্ন উপায়ে যে ক্ষমতা উৎপন্ন হচ্ছে, তার একমাত্র উৎস হলো সূর্য্য। সূর্য্য থেকে পৃথিবী প্রতিনিয়তই বিপুল শক্তি গ্রহণ করছে। তার অধিকাংশ আবার বিকীর্ণ হয়ে যাচ্ছে মহাশূন্যে। ক্রমবর্ধমান উদ্ভিদ্, মাটি এবং সমুদ্রের জল এই শক্তির এক অতি নগণ্য অংশ শোষণ ক'রে নেয়। সে শক্তির কিয়দংশ লাগে জলকে বাষ্পায়িত করতে এবং সমুদ্রে প্রবাহ সৃষ্টি করতে। উদ্ভিদ্ সাময়িকভাবে কিছু শক্তি সঞ্চয় ক'রে রাখে। চুল্লীতে যখন কাঠ পোড়ে, কিংবা মানুষ ও প্রাণীর দেহে যখন খাদ্য জারিত (Oxidised) হয়, তখন এই সঞ্চিত শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। অবশেষে, এই তাপ মহাশূন্যে বিকীর্ণ হয়। পৃথিবীর যাবতীয় কয়লা ও তেল হলো লক্ষ লক্ষ বছর আগে উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর পুষ্টির জন্যে সূর্য্যের আলো থেকে আহরণ করা সঞ্চিত শক্তি। এই অপূরণীয় শক্তিকে আমরা ক্রমবর্দ্ধিত হারে খরচ ক'রে চলেছি।

যুক্তরাষ্ট্রের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ২৫,০০০,০০০ কিলোওয়াট পরিমান শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে। জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যদি সমস্ত ব্যবহারযোগ্য জলই কাজে লাগানো হয়, তবু আমাদের প্রয়োজনের মাত্র শতকরা পঁচিশ ভাগ মিটবে। প্রয়োজনের বাকি অংশের জন্যে আমাদের নির্ভর করতে হবে কয়লা, তেল, এবং গ্যাস আকারে লক্ষ লক্ষ বছর আগে থেকে সঞ্চিত শক্তির উপর।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, যদি বিদ্যুতের খরচ বর্তমান হারে বাড়তেই থাকে, তবে একশো বছরের আগেই পৃথিবীর যাবতীয় জীবাশ্মজাত ইন্ধন নিঃশেষ হয়ে যাবে। গত পঁচিশ বছর ধরে আমাদের যন্ত্রবিদ্‌রা বিদ্যুৎ উৎপাদনের যোগ্যতর উপায় উদ্ভাবন করেছেন। এর জন্যে উচ্চবাষ্প চাপ এবং তাপকে তাঁরা কাজে লাগিয়েছেন এবং তাপচক্রের প্রবর্তন করেছেন। পঞ্চাশ বছর আগেও এক কিলোওয়াট ঘণ্টা পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন হতো ৯০,০০০ বৃটিশ থার্মাল একক তাপ। এমন কি, পনেরো থেকে পঁচিশ বছর আগেও ২০,০০০

বৃটিশ থার্মাল একক তাপ দরকার হতো। কিন্তু আজ ঐ পরিমান বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন ১০,০০০ বৃটিশ থার্মাল এককের চেয়েও কম তাপ। গত দশ বছর ধরে সারা পৃথিবীতে যদিও ক্রমাগত শ্রম ও ইন্ধনের দাম বেড়েই চলেছে, কিন্তু বিদ্যুতের বিক্রয়মূল্যের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। এরকারণ, বর্তমানকালে উৎপাদকেরা অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট বয়লার ও টারবাইন প্রস্তুত করতে পারছেন। এই বয়লারে তৈরি বাষ্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সামর্থ্যের পরিমাপ উপযোগ (Utility) অনুযায়ী ১৫,০০০ থেকে ৫০০,০০০ কিলোওয়াটের মধ্যে থাকে। সম্প্রতি, শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ কার্য্যক্ষমতা বিশিষ্ট বয়লারের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বয়লারের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি ক্ষমতা বাড়িয়ে লাভ নেই। টারবাইনের ক্ষেত্রেও তাপচক্র কাজে লাগিয়ে এখনো পর্য্যন্ত, শীতক সংবাহিত জলের বাষ্পায়নের জন্যে, ব্যবহারযোগ্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তাপই আমরা হারাচ্ছি।

দুটি তাপমাত্রার ব্যবধানের উপর তাপচালিত ইঞ্জিনের কার্য্যক্ষমতা নির্ভর করে। কিন্তু তাপমাত্রার প্রায় বিনা ব্যবধানেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর দেহে খাদ্য অথবা ইন্ধনের লীনতাপ কার্য্যে রূপান্তরিত হয়। মানুষের দেহে যৎসামান্য খাদ্যের বিনিময়ে বিস্ময়কর পরিমানে শক্তি উৎপন্ন হয়। স্বাভাবিকভাবে, একজন কর্মী প্রতিদিন ৩৫০০ ক্যালোরি খাদ্য গ্রহণ করে। বাষ্পের সাহায্যে সাধারণ উপায়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের জন্যে যদি এই খাদ্যকে চুল্লীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবে শতকরা ১০০ ভাগ কার্য্যক্ষমতা বিশিষ্ট ইঞ্জিন থেকে ১০,৭৫০,০০০ ফুট পাউন্ড শক্তি পাওয়া যাবে। একজন মানুষ প্রতিদিন বিকীর্ণ শক্তি ও বাষ্পায়নের জন্যে ব্যবহৃত শক্তি বাদ দিয়েও গড়ে প্রায় ২,৫০০,০০০ ফুট পাউন্ড শক্তি উৎপাদন করে। মানুষ যে সব বাহ্যিক প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করে, সেগুলি বিবেচনা ক'রে যদি মানুষের কার্য্যক্ষমতার হিসাব করা যায়, তবে অবাক হতে হয়। তার কার্য্যক্ষমতার গড়মান হলো শতকরা তেইশ। তবু, মানুষ এসব কাজ সম্পাদন করছে অতি নিম্ন তাপমাত্রায়, ৩৬ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডেরও নিচে, তার দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রায়। সম্ভবতঃ, কোনো প্রক্রিয়ার উন্নতির লক্ষণ রয়েছে এইখানেই।

যদিও প্রত্যেকটি অন্তর্দহন ইঞ্জিন, ইন্ধনদাহী যন্ত্র, প্রশ্বাসী প্রাণী ও মানুষ অবিরত বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করছে, তবু বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইড বা অক্সিজেনের উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। বর্তমান শক্তি উৎপাদনের কাজে যুক্তরাষ্ট্রে ঘণ্টায় ৭৫,০০০ টন জ্বালানী ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানী থেকে প্রতিবছর যে পরিমান গ্যাস নির্গত হয়, তা যুক্তরাষ্ট্রকে ২৪ ফুট উঁচু আবরণ দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট।

একটি চমৎকার ব্যবস্থার সাহায্যে প্রকৃতি নিজেই বায়ুর উপকরণগুলির অপরিবর্তনীয়তাকে ধরে রেখেছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন বার ক'রে নিয়ে উদ্ভিদ্ আপন দেহের পুষ্টি সাধন করে; পরিবর্তে বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেয় অক্সিজেন গ্যাস। এই অক্সিজেন গ্রহণ ক'রে আমরা বেঁচে আছি। আবার, এই অক্সিজেন ব্যবহার করেই অন্তর্দহন ইঞ্জিন চালানো হচ্ছে। যদি যান্ত্রিক কিংবা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বন মুক্ত করতে হতো, তবে কার্বন ও অক্সিজেন যুক্ত ক'রে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি

শক্তি ব্যয় করতে হতো। কিন্তু, প্রকৃতি অত্যন্ত দক্ষতার সংগে অবলীলাক্রমে এই কাজ করে চলেছে। সুতরাং, দহনের ফলে যে গ্যাস উৎপন্ন হচ্ছে, তাকে বিযোজিত ক'রে জালানী তৈরি করার চিন্তা নিতান্তই নিরর্থক।

**ক্ষমতা উৎপাদনের নতুন উৎসের সন্ধান**

১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে মানুষের পরমানু ভাঙার স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিলো। সে বছর পরীক্ষামূলক ভাবে দেখানো হলো, ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর কোনো পরমানুর কেন্দ্রপিন্ড বা নিউক্লিয়াসের সংগে একটি নিউট্রন যোগ করতে পারলে, নিউক্লিয়াসটি দু'টি সমান অংশে ভেঙে যায়। এবং, ভেঙে যাবার সময় দুই বা ততোধিক নিউট্রন বেরিয়ে আসে। ভেঙে যাওয়া অংশগুলির মোটভর মূল ইউরেনিয়াম পরমানু ও নিউট্রন-এর যুক্ত ভরের চেয়ে কম। ভরের হ্রাস প্রাপ্তিই এই ঘটনার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই হ্রাসপ্রাপ্ত ভর রূপান্তরিত হয় শক্তিতে। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন ভরশক্তির সমতুল্যতা সম্পর্কে যে বিখ্যাত সমীকরণটি ($E=mc^2$) উদ্ভাবন করেছেন, সেই অনুসারেই ভরের রূপান্তর ঘটে। সমীকরণে $E$ হলো রূপান্তরিত শক্তির পরিমান, যে ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে তার পরিমান হলো $m$, এবং $c$ আলোর গতিবেগ। আলোর গতিবেগের পরিমাপ অত্যন্ত বেশি ব'লে সামান্য মাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত ভর থেকে প্রচন্ড শক্তির উদ্ভব হবে। বস্তুতঃ, এই উপায়ে যদি ৪৫৩·৬ গ্রাম ইউরেনিয়ামের বিভাজন ঘটানো যায়, তবে উদ্ভূত শক্তির পরিমান হবে ১৭০০ টন উৎকৃষ্ট কয়লার দহনজাত শক্তির সমান। গোড়ার দিকে এই অতিপরমানবিক শক্তি অর্থাৎ নিউক্লিয়াস-শক্তিকে কেবলমাত্র পরমানু বোমা বিস্ফোরণের কাজে লাগানো হয়েছিল। কিন্তু আজকাল বিদ্যুৎক্ষমতা উৎপাদনের কাজেও এই শক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। সঞ্চিত কয়লা, তেল এবং গ্যাসের চেয়ে বহুগুণ বেশি শক্তির আধার হলো পৃথিবীর ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের মতো সম্পদ। সুতরাং, জ্বালানীর সঞ্চয় ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে এলেও আগামী কয়েক শো বছরের মধ্যে আমাদের শিল্পসভ্যতার অগ্রগতি মন্দীভূত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

কয়েক বছর আগের কথা। বিদ্যালয়ের একজন পদার্থবিদ্যার শিক্ষক একদিন জলপূর্ণ ছোট্ট একটি টিউব দেখিয়ে বলেছিলেন, ১০ সি· সি· জলে যে হাইড্রোজেন আছে, তাকে হিলিয়ামে রূপান্তরিত করলে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তার পরিমান নিউ-হাবেন-কন (New Haven conn)-এর সমস্ত লোক একদিনে যত শক্তি ব্যবহার করতে পারে তার চেয়েও বেশি। তখন আমরা ভেবেছি, তিনি সজ্ঞানে একথা বলছেন কি না। কিন্তু আজ তার বক্তব্য বাস্তব হতে চলেছে। আজ আমরা শিখেছি, কীভাবে হাইড্রোজেন বোমা তৈরি করা যায়।

আজ আমাদের মনে প্রশ্ন, আর কতদিন চলবে এই জ্বালানীর সঞ্চিত ভান্ডার। যদিও কোটি কোটি বছর আগে থেকেই পৃথিবীতে কয়লা ও তেলের এই ভান্ডার মজুত রয়েছে, কিন্তু মাত্র গত শতক থেকে আমরা ক্রমবর্ধমান হারে এই জ্বালানী ব্যবহার করে চলেছি। সঞ্চিত তেল ও গ্যাসজাত শক্তির আনুমানিক পরিমান $৮{\cdot}২\times১০^{১৮}$ বৃটিশ থার্মান একক। সঞ্চিত কয়লাজাত শক্তির পরিমান কমপক্ষে

৭২×১০^১৮ বৃটিশ থার্মাল একক। আর, ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের বিভাজন থেকে যে শক্তির উদ্ভব হবে, তার আনুমানিক পরিমান ১৭৭০×১০^১৮ বৃটিশ থার্মাল একক,—পৃথিবীর যাবতীয় কয়লা ও তেলজাত তাপ শক্তির প্রায় ২২ গুণ।

আগামী পঞ্চাশ বছরে যদি পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায়, যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহার যদি বর্তমান হারে বেড়ে চলে, এবং সমস্ত পৃথিবীর বিদ্যুৎশক্তির ব্যবহারও যদি বর্তমানের তুলনায় ২৫ ভাগ বাড়ে, তবে ৪৫০ বছরের মধ্যে কয়লা, গ্যাস, তেল এবং বিভাজনযোগ্য সমস্ত বস্তুর সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাবে।

মানুষের ইতিহাসে একটি বছর ক্ষণকাল মাত্র। সুতরাং পৃথিবীতে আমাদের জীবন ধারণের জন্য অগ্রগতির প্রয়োজনে অপরিমিত পরমানবিক শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার। এ শক্তির যোগানও হবে দীর্ঘস্থায়ী।

শক্তির আর একটি সম্ভাব্য উৎস হ'লো ভূগর্ভের তাপ। তাপমাত্রার নতি বা গ্র্যাডিয়েণ্ট ভূত্বকের গভীরতার উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের গড় তাপমাত্রা যদি ১১৪২·২ ডিগ্রি সেণ্টিগেড ধরা যায়, তবে ভূত্বকের নিচে মোট তাপের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৩৬০×১০^২৪ বৃটিশ থার্মাল একক। পৃথিবীর যাবতীয় প্রচ্ছন্ন সম্পদের তালিকা অনুযায়ী কয়লা, তেল, গ্যাস এবং বিভাজনযোগ্য সমস্ত বস্তুর মোট শক্তির ৪০ লক্ষ গুণ হলো এই তাপশক্তি। মানুষ আদৌ কোনোদিন এশক্তিকে কাজে লাগাতে পারবে কিনা তা এখনো জানা যায় নি। কিন্তু যদি কাজে লাগানো যায়, তবে মাটির নিচে মানুষের ব্যবহারের জন্যে মজুত রয়েছে এক অপরিমিত শক্তির উৎস।

ভবিষ্যতে, একমাত্র যে অফুরন্ত শক্তির উৎসের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি, তা হলো সূর্য্য থেকে পাওয়া তাপশক্তি। মানবজীবনের ব্যাপ্তির তুলনায় প্রায় অবিনশ্বর এই শক্তি। সমস্ত জীবনের মূলে রয়েছে এর অবদান। ক্রমোন্নত পৃথিবীর প্রয়োজন মেটানোর জন্যে যে অপরিমিত শক্তির দরকার, তার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন শক্তিধারার এই উৎসই সবচেয়ে উপযুক্ত। সূর্য্য থেকে প্রতিদিন পৃথিবী যে তাপ গ্রহণ করে, তার পরিমাণ ৮·৩২৫×১০^১৮ বৃটিশ থার্মাল একক,—সারা পৃথিবীর তেল ও গ্যাসের মোট শক্তির প্রায় সমান।

এই অকল্পনীয় শক্তির কার্য্যকরী ও অর্থকরী ব্যবহারের উপায় নির্ধারণ করার জন্য আজ একান্ত সচেষ্ট হওয়া দরকার। এ প্রচেষ্টা কেবলমাত্র লাভজনকই নয়, ভবিষ্যৎ বংশধরের প্রতিও এ আমাদের কর্তব্য। যদি এই অফুরন্ত শক্তির উৎসকে কাজে লাগানোর উপায় উদ্ভাবন করা যায়, তবে চিরকালের মতো মানুষের শক্তির সমস্যা মিটে যাবে।

পৃথিবীর যাবতীয় কয়লা, তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের জন্যে বস্তুত আমরা সূর্য্যের কাছে ঋণী। আমাদের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় ফসিলজাত ইন্ধন যদিও এখনো প্রচুর রয়েছে, তবু যে ক্রমবর্ধমান হারে এগুলিকে শক্তিউৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে ক'রে অদূরভবিষ্যতে এরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। সুতরাং নানা কারণে এই ফসিনজাত ইন্ধনকে সংরক্ষণ করা নিতান্তই দরকার। বাষ্প ও

বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে বয়লারে কয়লা, তেল এবং গ্যাস পুড়িয়ে ফেলা হয়। কিন্তু, এগুলি সত্যিই মূল্যবান, এভাবে এগুলি খরচ ক'রে নষ্ঠ করা উচিত নয়। কয়লা ও গ্যাসকে তরলে পরিণত করা যায়। উড়োজাহাজ, মোটর গাড়ি, ট্রাক্টর এবং কৃষিযন্ত্র চালানোর কাজে তরল জ্বালানীই হলো ক্ষমতার একমাত্র উৎস। বৃহদায়তন ব্যবহারিক ও শিল্পগত বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিভাজন যোগ্য বস্তু ব্যবহার ক'রে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারি। কিন্তু, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কিংবা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রকল্পের ক্ষমতা যোগানের জন্য এ জাতীয় বস্তুর ব্যবহার এখনো পর্য্যন্ত করা যায় নি।

**পরমাণু বোমা ও পরমানবিক শক্তি**

দুর্ভাগ্যজনক হলেও একথা অনস্বীকার্য্য যে, অতিপরমানবিক শক্তির প্রথম ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়েছিল মারণাস্ত্র হিসাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক প্রাক্কালে জার্মানিতে প্রথম নিউক্লিয়াসের বিভাজনরীতি আবিস্কৃত হয়েছিল। পাছে জার্মানি এই আবিস্কারকে যুদ্ধের কাজে লাগায়, এইভয়ে যুক্তরাষ্ট্র আশুকার্য্যক্রম হিসাবে অতিপরমানবিক বিস্ফোরক উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

নিউক্লিয়াসের বিভাজন থেকে যে বিস্ফোরণ ঘটছে, সে রহস্যের মূলে কী আছে? বিভাজিত বস্তুর ($U^{235}$, $U^{233}$ এবং $P_u$ $^{239}$) অতি সংকটভর (Super critical mass)-এর আকস্মিক সমাবেশ ঘটাতে হবে এবং ইন্ধন হিসাবে যে সব পরমাণু কাজ করছে, তাদের অধিকাংশেরই যাতে বিভাজন হয় সেজন্যে উপযুক্ত সময় ধ'রে বস্তুগুলিকে একত্রে রাখতে হবে। অতিসংকট ভর বলতে বোমায় বিভাজিত বস্তুর এক বিশেষ পরিমান ও তার বিন্যাসের অবস্থা। এঅবস্থায় যত সময় অতিক্রান্ত হয়, তত দ্রুতহারে সেখানে নিউট্রনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিভাজনের ফলে এই নিউট্রন মুক্তিলাভ করে। মুক্ত নিউট্রনগুলি অন্যান্য $U^{235}$, $U^{233}$ কিংবা $P_u$ $^{239}$ পরমানুর সংগে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে আবার নতুন নতুন বিভাজন ঘটায়। একথা মনে রাখা দরকার যে, সরঞ্জামগুলিকে ঠিক সংকটাবস্থায় আনবার জন্যে ন্যূনতম একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমান ইন্ধন প্রয়োজন। কেবল তখনই পারস্পরিক বিক্রিয়া স্বয়ংরক্ষ হয়। অতিপরমানবিক চুল্লীতেও এই অবস্থার নজির বর্তমান। কোনো নির্দ্দিষ্ট বিন্যাসের জন্যে যদি সংকটভরের প্রয়োজনের চেয়ে কম ইন্ধন থাকে, তবে স্বয়ংরক্ষ বিভাজনক্রম (Series of fission) ঘটতে পারেনা। উদ্দিষ্ট বিস্ফোরণের আগে বিভজনীয় বস্তু অবর-সংকট (Sub-critical) অবস্থায় বিন্যস্ত থাকে। বিভাজন বোমা মূলত দু' জাতীয়,—একটিকে বলা যেতে পারে বন্দুক জাতীয়। এজাতীয় বোমায় বিভজনীয় বস্তু পৃথক পৃথক অবর-সংকট ভরে বিভক্ত থাকে। বিস্ফোরণের জন্যে প্রচলিত বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়। এই বিস্ফোরক বিভক্ত এক অংশকে অপর অংশের উপর সজোরে নিক্ষেপ করে ব'লেই অতিসংকট অবস্থানের সৃষ্টি হয়। অন্য ধরনের বোমায় বিভজনীয় বস্তুর চারপাশে থাকে বিস্ফোরক বস্তু। বোমা বিস্ফোরণের আগে রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ফলে, অন্তর্মুখী অভিঘাত তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের আঘাতে বিভজনীয় বস্তু সংকুচিত হয়ে কঠিন অতিসংকট অবস্থানে উপনীত হয়।

গলন বোমা (Fusion Bomb) 'হাইড্রোজেন বোমা' নামে পরিচিত। কারণ, এই বোমায় হাইড্রোজেন-এর দু'টি বিরল আইসোটোপের যে কোনো একটি কিংবা দুটিকেই ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই ইন্ধনের তাপমাত্রা কোটি কোটি ডিগ্রিতে উপনীত হ'লে গলন বিক্রিয়া সম্ভব হয়। এই জন্য বিভাজন বোমাকে এখানে চালক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আমাদের বিজ্ঞানী এবং যন্ত্রবিদ্‌রা পরমানু ভাঙবার উপায়ই শুধু আবিস্কার করেন নি, তাকে কাজে লাগানোর উপায়ও নির্ধারণ করেছেন। এই আবিস্কারে মানুষের মনে এক নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। আমাদের কয়লা ও তেলের সঞ্চয় দ্রুতহারে কমে আসছে। এই আবিস্কারের ফলে অনাগত কয়েকশো বছর পর্যন্ত আমাদের শিল্পে কয়লা ও তেলের স্থান বিভজনীয় বস্তুর দ্বারাই পূরণ করা যাবে। পর্যায় তালিকায় আগে ছিল ৯২টি মৌলিক পদার্থ, আজ সেখানে রয়েছে ১০২টি। আগের মৌলিক পদার্থগুলির কতকগুলিকে রূপান্তরিত ক'রে বাকি মৌলিক পদার্থগুলির সৃষ্টি হয়েছে। আশা করা যায়, ভবিষ্যতের বৈজ্ঞানিকেরা দ্রুতবর্ধমান শিল্পের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক নতুন মৌলিক পদার্থ এই তালিকায় যুক্ত করবেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে বিভিন্ন ধরনের কতকগুলি অতি-পরমানবিক ক্ষমতা প্রকল্প গঠিত হয়েছে। সাতটি বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পে আজ বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিভাজনজনিত তাপ থেকে বাষ্প তৈরি হচ্ছে। প্রচলিত ক্ষমতা প্রকল্পগুলির টারবোজেনারেটারে কয়লা, তেল কিংবা গ্যাসের মতো ফসিল-জাত জ্বালানী পুড়িয়ে বয়লারে যেমন বাষ্প উৎপন্ন করা হয়, বিভজনীয় বস্তুকে তেমনি ব্যবহার করা হচ্ছে। অতি পরমানবিক প্রকল্পে প্রচলিত বয়লারের স্থান গ্রহণ করেছে চুল্লী (Reactor) যা'র দ্বারা সরাসরি বাষ্প উৎপন্ন করা যায়। অথবা, এক বা একাধিক শীতলীকারক (Cootant)-এর সাহায্যে জ্বালানী থেকে বাষ্প জেনারেটারে তাপ পাঠানো হয়। অর্থাৎ, কার্যতঃ, এটি একটি পৃথক তাপ-বিনিময় যন্ত্র (Heat exchanger) হিসাবে কাজ করে।

### 'অতিপরমানবিক তাপ' সম্পর্কে গবেষণা

যুক্তরাষ্ট্রে ও অন্যান্য দেশে অতিপরমানবিক-তাপ-ক্ষেত্রে (Thermonuclear field) অনেক গবেষণা ও উন্নতিমূলক কাজ চালানো হচ্ছে। অ্যাটমিক্‌স্ (Atomics) পত্রিকার সম্পাদক অ্যান্ড্রু ক্র্যামার (Andrew Kramer) লিখেছেন, "অনেকদিক থেকেই গলন প্রক্রিয়া (Fusion) বিভাজন প্রক্রিয়ার (Fission) ঠিক বিপরীত। বিভাজনপ্রক্রিয়ার আমাদের কাজ হলো ভারি ইউরেনিয়ামের কেন্দ্রপিণ্ডকে ভাঙা। আর, খুব হাল্‌কা কেন্দ্রপিণ্ড নিয়ে গলন প্রক্রিয়ার কাজ। এই প্রক্রিয়ার হাল্‌কা কেন্দ্রপিণ্ডগুলিকে গলিত অবস্থায় একত্রিত ক'রে ভারি এবং দৃঢ়বদ্ধ কেন্দ্র-পিণ্ড গঠন করা হয়। গলন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সম্ভাব্য বিক্রিয়া থেকে শক্তির উদ্ভব হয়। এদের মধ্যে কেবলমাত্র হাইড্রোজেন আইসোটোপ সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াগুলি সম্পর্কে আমরা বিশেষ আগ্রহশীল। নিয়ন্ত্রিত অতিপরমানবিক-তাপ-বিক্রিয়া ঘটানোর ক্ষেত্রে আমাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ গলনবিক্রিয়া ঘটানোর জন্যে

দরকার কোটি কোটি ডিগ্রির উচ্চ তাপ মাত্রা। গলনের জন্য কেন্দ্রাপিণ্ডগুলিকে এত কাছাকাছি আনতে হয় যে অতিপরমানবিক বল কেন্দ্রাপিণ্ডগুলির মধ্যে পরস্পর সক্রিয় হয়ে ওঠে। কেন্দ্রাপিণ্ডগুলি ধনাত্মক আধানে আহিত ব'লে কুলম্ব-এর স্থির-তাড়িতিক-বিকর্ষণের সূত্র অনুযায়ী তারা পরস্পরকে বিকর্ষণ করতে চায়। এই বিকর্ষণ-বল অতিক্রম ক'রে কেন্দ্রাপিণ্ডগুলি যাতে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে তার জন্যে এদের উচ্চগতি সম্পন্ন করে তুলতে হয়।

"বিভাজন এবং আধুনিক ধরনের অতিপরমানবিক চুল্লীর (Nuclear reactor) ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত তেজস্ক্রিয় বস্তুর সুব্যবস্থা করা একটি গুরুতর সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো দুর্ঘটনা থেকে সবসময় অতিরিক্ত পরিমানে বিপজ্জনক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের সম্ভাবনা রয়ে গেছে। গলনের ক্ষেত্রে এই পরিত্যক্ত বস্তু নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই। আকস্মিক বিস্ফোরণ কিংবা বিকিরণের জন্যে বিপদের আশঙ্কাও কম, এবং অতিপরমানবিক তাপ চুল্লীও ব্যবহারের দিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ, শক্তিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য জ্বালানীর যে সামান্য অংশ প্রয়োজন, তাছাড়া বাকি সমস্ত অংশ চুল্লীর বাইরে থাকে।

অতিপরমানবিক শক্তির সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তর প্রথম সম্ভব হয়েছিল অতিপরমানবিক তাপ বিক্রিয়ার সাহায্যে। এ ব্যাপারটির গুরুত্ব অপরিসীম। এরজন্য তাপবিনিময় যন্ত্র, বয়লার, টারবাইন, কিংবা বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রের (Electric generator) প্রয়োজন হয় না। নীতিগতভাবে, অতিপরমানবিক তাপ বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রশ্নটি অতি সরল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, ডয়টেরিয়ামের (Dauterium) মতো কিছু পরিমান কোনো গ্যাস নিয়ে দশ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অতিপরমানবিক-তাপক্ষমতা উৎপন্ন হবে। আসলে, দশ কোটি ডিগ্রি তাপমাত্রা নিয়েই যত মুস্কিল।"

তীব্র চৌম্বক ক্ষেত্রে উচ্চ গতিসম্পন্ন উত্তপ্ত গ্যাসের প্রবাহ পাঠিয়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। এর কার্যনীতি প্রচলিত উৎপাদক যন্ত্রের প্রায় অনুরূপ। শুধু তফাৎ এই যে, পরিবাহী হিসাবে এখানে রয়েছে তামার বদলে অতি উত্তপ্ত কোনো গ্যাস। প্রয়োজনমতো তড়িৎ পরিবাহিতার জন্যে এই যন্ত্রে গ্যাস নিতে হয় অতি উচ্চ তাপমাত্রায়। কারণ, উচ্চতাপমাত্রায় গ্যাস আয়নে ভেঙে যায়। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানের আয়ন ভিন্ন মেরুতে জড়ো হ'য়ে এক নতুন কৌশলে তড়িৎ উৎপাদন করে। এই গ্যাস তাপবিনিময় যন্ত্রের ভিতর দিয়ে যাবার ফলে বাষ্প তৈরি হয়। এই বাষ্প প্রচলিত টারহবাজেনারেটার ও শীতকের ভিতর দিয়ে গিয়ে তড়িৎ-ক্ষমতার সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

এই ভাবেই সাধারণত সমপ্রবাহ বিদ্যুৎ (Direct current) উৎপন্ন হয়। আধুনিক উচ্চচাপ ও তাপমাত্রা বিশিষ্ট প্রকল্পগুলির চেয়ে এই প্রকল্পের তাপীয় কার্যক্ষমতা শতকরা ২৫ ভাগ বেশি।

**শক্তির অন্যান্য সম্ভাবনা**

সম্প্রতি সৌরশক্তিকে কেন্দ্র ক'রে যেসব কৌতুহলোদ্দীপক গবেষণা এবং উন্নয়ন-মূলক কর্মপ্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, সে সম্পর্কে এখানে কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন।

থার্মোকাপ্‌ল্‌, সালোকসংশ্লেষ, এবং আলোক তড়িৎ কোষ ইত্যাদি এ গবেষণার বিষয়।

বিখ্যাত গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিদিস বলেছিলেন, তিনি একবার অধিবৃত্তাকার দর্পনে প্রতিফলিত সূর্য্যরশ্মি দিয়ে রোমক নৌবহরকে অগ্নিবিধ্বস্ত করেছিলেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী রসায়নবিদ্‌ ল্যাভোয়েমিয়ে ১৭৭৩ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় প্ল্যাটিনাম ধাতু গলানোর উপযোগী সৌরচুল্লী নির্মাণ করেছিলেন। সম্প্রতি নিউ মেক্সিকোর আলবুকুর্ক (Albuquarque) শহরের এক কারিগরি অফিসগৃহকে উষ্ণ রাখবার জন্যে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। ঢাকা কাচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে সূর্য্যালোকে উত্তপ্ত জল সংবাহিত ক'রে আফিস গৃহটি উষ্ণ রাখা হয়। মেঘলা দিনেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে সূর্য্যরশ্মিতে উত্তপ্ত জলের অন্তরিত এক আধার থেকে জল সংবাহিত হ'য়ে গৃহটির উষ্ণতা বজায় রাখছে।

ফোর্ডহ্যাম, ফিনিক্স, ও দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বিশ্ববিদ্যাগুলিতে অধিবৃত্তাকার প্রতিফলক ব্যবহার ক'রে যেসব ধাতুবিদ্যাবিষয়ক চুল্লী গঠন করা হয়েছে, সেগুলি ৪৫০০ ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রাতেও কার্য্যক্ষম। জর্জিয়ার আমেরিকাস্‌ শহরে টেলিফোনের সংবর্তনীর জন্যে বেল-টেলিফোন-কোম্পানী সৌরশক্তিচালিত এক-ধরণের তড়িৎ-কোষ ব্যবহার করে; তাতেও সূর্য্যালোক সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়।

ক্ষমতা উৎপাদনের উৎস হিসাবে সৌরশক্তি এখনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়। থার্মোকাপ্‌ল্‌ যন্ত্রের সাহায্যে যে পরিমান সৌরক্ষমতা ধরা যায়, তার শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ মাত্র কাজে লাগে। আলোক ভোল্টীয় নীতি কাজে লাগিয়ে বেল-রূপান্তরক-যন্ত্র শতকরা মাত্র পনেরো ভাগ কার্য্যোপযোগী সৌরক্ষমতা উৎপাদন করতে পারে। 'ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ অব টেকনোলোজি' নামে প্রযুক্তিবিদ্যার এক শিক্ষায়তনে জলকে সূর্য্যালোকের সাহায্যে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের উপাদানে ভেঙে ব্যবহারযোগ্য তড়িৎ কোষ তৈরির চেষ্টা চলছে। এই কোষগুলির কার্য্যক্ষমতা শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ। সূর্য্যালোকে জল ও কার্বন-ডাই-অক্‌সাইড রূপান্তরিত হয় কার্বোহাইড্রেট এবং ক্লোরোফিলে। এই সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদতর জ্ঞানলাভের উদ্দেশে গবেষকেরা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আজ তাঁরা এই প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটিকে গবেষণাগারে সংঘটিত করবার মতো অবস্থায় এসে পৌঁছেচেন। অন্যান্য গবেষকেরা সূর্য্যালোককে সরাসরি বিদ্যুতে রূপান্তরিত করবার জন্যে উন্নততর উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। আর একটি নতুন পদ্ধতির নাম লেসার (Laser অর্থাৎ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation)। এই পদ্ধতিতে উদ্দীপিত তেজ নির্গমনের সাহায্যে আলোকবর্ধক এক নতুন উপায়ে উচ্চ ক্ষমতা বিশিষ্ট একবর্ণ আলোকের সংগত বা সমদশাসম্পন্ন তরঙ্গমালা সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু ভাস্বর (Incandescent) ও প্রতিপ্রভ (Flourescent) ইত্যাদি সাধারণ ব্যবহারিক আলোক উৎসগুলি থেকে যে আলোক তরঙ্গ উৎসারিত হয় সেগুলি বহুবর্ণ ও বিষমদশা সম্পন্ন। ইলেক্‌ট্রন-নিয়ন্ত্রিত-ফ্ল্যাশ-টিউব থেকে নির্গত আলোয় সক্রিয় উপাদানের কতকগুলি পরমানুকে আন্দোলিত ক'রে "উত্তেজিত" করলে লেসার প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়। স্বতস্ফূর্তভাবে

উত্তেজিত পরমানু একটি আলোক কণা উৎক্ষিপ্ত ক'রে আবার তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। আবার, নির্গত আলোককণার সমশক্তি সম্পন্ন অন্য কোনো আলোককণার আঘাতেও পরমানু তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারে। সুতরাং, যখন কয়েকটি পরমানু স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সুরু করেছে, তখন নির্গত আলোককণার সংঘাতে অন্যান্য অনেক পরমানুও স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে থাকে। ফলে এইভাবে সমতরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং সমদশাসম্পন্ন আলোককণার প্রপাত সৃষ্ট হয়। আলোককণা উত্তেজিত উপাদানের ভিতর দিয়ে যত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে, উদ্ভুত কণাপ্রপাতও ততই শক্তিশালী হ'তে থাকে। প্রায় ৩.৮ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ০.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসযুক্ত ফিকে লাল রঙের স্ফটিকীকৃত (চুনি শতকরা ০.০৫ ভাগ ক্রোমিয়াম যুক্ত অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড) হলো এই সক্রিয় উপাদানের বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। চুনিটির প্রান্তস্থিত দুই তল সমান্তরাল, মসৃন এবং আধাউজ্জ্বল থাকা দরকার। এই দুই তলে আলোককণা বারবার প্রতিফলিত হ'য়ে উচ্চক্ষমতা বিশিষ্ট কণাপ্রপাত সৃষ্টি করে। এবং, তার থেকে এক তীব্র লাল আলো নির্গত হতে থাকে।

কয়েক বছর আগে লেসারপ্রক্রিয়ার প্রথম সংঘটনের সংবাদ প্রকাশ হবার পর থেকে এ বিষয়ে ব্যাপকহারে গবেষণার কাজ চলছে। লেসার ক্রিয়ার উপযুক্ত নতুন নতুন পদার্থ আবিস্কার করাই এই সব অধিকাংশ গবেষণার লক্ষ্য। প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে লেসার পদ্ধতির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ব্যবহারিক প্রয়োগ করা হয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থায়। এসম্পর্কে একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। যোগাযোগ পথে বাহিত সংবাদের পরিমান ঘটনা মাত্রার (Frequency) উপর নির্ভর করে। সুতরাং, তড়িৎচুম্বকীয় বর্ণালিপির ৪০০০ থেকে ৭০০০ আঙ্স্ট্রম একক তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অন্তর্গত দৃশ্যমান আলোক অঞ্চলে গণনা অনুযায়ী প্রায় ৮ কোটি দূরেক্ষণ (Television)-পথ স্থান গ্রহণ করতে পারে। শুধুমাত্র গবেষণার ক্ষেত্র-ছাড়াও রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, এবং ভেষজবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় লেসারসৃষ্ট সংগত একবর্ণ তীব্র আলোকরশ্মির সম্ভাব্য প্রয়োগ সম্পর্কে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। সাহায্যকারী কলার সংগে আঘাতপ্রাপ্ত অক্ষিপট জুড়ে দেওয়ার কাজে এই আলোকরশ্মিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

উদ্দীপিত তেজ নির্গমনের সাহায্যে অনুতরঙ্গের বর্ধন প্রক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত নাম মেসার (Maser অর্থাৎ Micro-wave Amplification of Stimulated Emission of Radiation)। বৈদ্যুতিক উপায়ে আলোক ও বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি এবং পরিবর্ধনই এই প্রক্রিয়ার কাজ। পরমানবিক ঘড়ি হিসাবেও মেসারের ব্যবহার আছে। এছাড়া, দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে যেসব দুর্বল বেতারতরঙ্গ আসে, তাদের পরিবর্ধনের কাজেও মেসারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। লেসার হলো মেসারের আলোক বিকল্প।

উত্তেজিত অবস্থায় আনীত বস্তুটিই মেসার প্রক্রিয়ার সবচেয়ে আবশ্যক অঙ্গ। এই অবস্থায় উত্তেজিত পরমানু নির্দিষ্ট একটি কম্পাঙ্কের তেজবিকিরণ করতে পারে। যখন সমকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট কোনো বেতার বা আলোক তরঙ্গ পরমানুগুলিকে উদ্দীপিত করে, তখন পরমানু থেকে নির্গত তেজ এই তরঙ্গের সংগে যুক্ত হয়ে তরঙ্গবর্ধনের কাজ করে।

অ্যামোনিয়া-মেসার-প্রক্রিয়ায়, তাপের সাহায্যে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে উত্তেজিত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়। চুনি-মেসারে বেতারতরঙ্গের দ্বারা চৌম্বকক্ষেত্রে রক্ষিত সংশ্লেষিত চুনির ক্রোমিয়াম উপাদানটিকে উত্তেজিত করা হয়। পরমশূণ্যাঙ্কের কয়েক ডিগ্রি মাত্র উপরে চুনি-মেসার প্রক্রিয়াটি কার্যকর। কোনো কোনো লেমার প্রক্রিয়ায়ও চুনির ব্যবহার আছে। সেখানে তীব্র আলোকের সাহায্যে ক্রোমিয়ামকে উত্তেজিত করা হয়। ক্রোমিয়াম পরমাণু থেকে নির্গত শক্তি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের আলোকতরঙ্গ সৃষ্টি করে। পরমাণুগুলি সমদশাসম্পন্ন থাকে ব'লে, নির্গত আলোও সংগত বা সমদশাসম্পন্ন হয়। ফলে, এই আলোকরশ্মিগুচ্ছর অতিক্ষুদ্র আলোক প্রভব থেকে নির্গত আলোক রশ্মির সমজাতীয়। কোনো কোনো লেমার প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আলোকরশ্মিগুচ্ছ এক মাইল পথ অতিক্রম করবার পর মাত্র ৩০·৪৮ সেণ্টিমিটার ছড়িয়ে পড়ে।

**ট্রানজিস্‌টার-এর অভিনবত্ব**

ট্রানজিসটার এমন একটি ইলেকট্রন-নিয়ন্ত্রিত-যন্ত্র, যেটি থেকে ভ্যাকুয়ামটিউবের নানা ধরণের কাজ পাওয়া যায়। বেতার, দূরেক্ষণ যন্ত্র ও অন্যান্য ইলেকট্রন নিয়ন্ত্রিত যোগাযোগ ব্যবস্থায় তাদের আপন আপন শৃঙ্গ (Anterna) মারফৎ যেসব তরঙ্গ সংকেত ধরা পড়ে, তাদের পরিবর্ধিত অথবা শক্তিশালী করাই ট্রানজিসটারের কাজ। ওজন এবং আকৃতিতে এটি সমক্ষমতাবিশিষ্ট ভ্যাকুয়ামটিউব-এর একশো ভাগের এক ভাগ মাত্র। ট্রানজিসটারের সাহায্যে চশমার সংগে ব্যবহার করবার উপযুক্ত অতিক্ষুদ্র শ্রবণসহায়ক যন্ত্র তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ভ্যাকুয়ামটিউব-এর চেয়ে অনেক কম ক্ষমতা ব্যবহার করেই ট্রানজিস্‌টার চালানো যায়। তাছাড়া, বলতে গেলে, এতে প্রায় কোনো তাপই সৃষ্টি হয় না। ভ্যাকুয়ামটিউব-এর মতো গরম হবার সময় লাগেনা ব'লে, এগুলি চালানোর সংগে সংগে কাজ সুরু করে। ধাক্কা বা আন্দোলনের ফলে এগুলির ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কাও অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

জারমেনিয়াম ও সিলিকন জাতীয় আধা পরিবাহী দিয়ে ট্রানজিসটার তৈরি করা হয়। আধা পরিবাহীর সংগে বিশেষ কতকগুলি অপবস্তু যোগ ক'রে কয়েকটি মুক্ত ইলেকট্রন সৃষ্টি করা হয় অথবা কয়েকটি ইলেকট্রনের অভাব ঘটানো হয়। ইলেকট্রনের এই অভাবকে বলা হয় 'গহ্বর'। ইলেকট্রন কিংবা 'গহ্বরে'র প্রবাহই তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টি করে। মুক্তইলেকট্রন সমন্বিত আধাপরিবাহীকে বলে n-জাতীয় এবং 'গহ্বর' সমন্বিত আধাপরিবাহীকে বলে p-জাতীয়। কোনো কোনো n-জাতীয় বস্তুর দু'টি স্তরের মাঝখানে থাকে p-জাতীয় বস্তুর একটি স্তর। এগুলির নাম n-p-n ট্রানজিস্‌টার। n-জাতীয় স্তরের একটিকে ঋণাত্মক আধানে রাখা হয়। একে বলে উৎসর্জক (Emitter)। এটি ভ্যাকুয়ামটিউবের ঋণাত্মক দণ্ড বা ক্যাথোডের কাজ করে। n-জাতীয় অপর স্তরটিকে বলে সংগ্রাহক (Collector)। ধনাত্মক আধানে রক্ষিত এই স্তরটি ধনাত্মক দণ্ড বা অ্যানোডের কাজ করে। এই স্তরটি ইলেকট্রন আকর্ষণ করে। p-জাতীয় স্তরের কাজ ভ্যাকুয়ামটিউব-এর জাল (Grid)-এর মতো। তড়িচ্চালকবল আরোপ করলে এই স্তর ইলেকট্রন প্রবাহকে নিয়ন্ত্রন করে। কোনো কোনো ট্রানজিসটার আবার p-n-p জাতীয়। এই ট্রানজিসটারে

n-জাতীয় স্তরটি উৎসর্জক p-জাতীয় স্তর থেকে সংগ্রাহক p-জাতীয় স্তরে ইলেকট্রন প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

জন বারদেন, ওয়াল্টার-এইচ্-ব্রাটেইল, এবং উইলিয়াম শকলী প্রমুখ তিনজন আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে ট্রানজিসটার নির্মাণ করেন। এর জন্য ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁদের পদার্থবিদ্যায় নোবেল-পুরস্কার দান করা হয়।

**পরিগণকের যুগ**

আজকাল সর্বত্রই পরিগণক (Computer) যন্ত্রটির ক্রমশ বহুল ব্যবহার দেখা যাচ্ছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে অভাবনীয় সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই গণনার কাজ সম্ভব; তাই গবেষণায়, নানাধরণের কারিগরি ও উন্নতিমূলক কাজে এবং দৈনন্দিন কর্মক্ষেত্রেও ব্যাপকতর ভাবে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রধানতঃ, দুই ধরণের পরিগণক যন্ত্র আছে। সদৃশ (Analog) পরিগণককে সক্রিয় রাখতে নিরন্তর পরিবর্তনশীল বৈদ্যুতিক মানের প্রয়োজন। গণনার যে বিষয়গুলি যন্ত্রস্থ করা হয়, তাদের প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট বৈদ্যুতিক মানের দ্বারা সূচিত হয়। তাপমাত্রা, দ্রুতি, দূরত্ব, ভর কিংবা সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় এমন যেকোনো প্রতিপাদ্য এই যন্ত্রের আয়ত্তাধীন। সংখ্যা-বিষয়ক পরিগণকের কাজ স্বতন্ত্র অঙ্ক নিয়ে। দুটি প্রধান ক্ষেত্রে এজাতীয় যন্ত্রের ব্যবহার আছে; (ক) প্রথমতঃ, হিসাব সংক্রান্ত বিষয় ও পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের শ্রেণীকরণের কাজে এবং বেতন তালিকা প্রস্তুত করবার জন্যে প্রয়োজনীয় উপায়গুলিকে ক্রমানুসারে রীতিবদ্ধ রাখতে এ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সংরক্ষিত বিভিন্ন উপাত্তগুলি একেবারে হাতের কাছেই থাকে। সুতরাং, ফাইল রাখবার কোনো দরকারই হয়না। (খ) সদৃশ যন্ত্রের মতোই সংখ্যাবিষয়ক পরিগণককে বৈজ্ঞানিক গণনার কাজেও ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এই যন্ত্রে সংখ্যাবিষয়ক-অন্তর-সমীকরণের সাহায্যে বিভেদক সমীকরণের আসন্ন মান নির্ণয় করাই কেবল সম্ভব। ক্ষেপনীয় বস্তুর পরিক্রমণ পথ এবং গতিসংক্রান্ত প্রশ্নে এই দুই শ্রেণীর পরিগণক যন্ত্রই একইসংগে ব্যবহৃত হয়। পরিক্রমন পথসংক্রান্ত প্রশ্নে সংখ্যাবিষয়ক পরিগণক ব্যবহার করা হয়, এবং গতি-সংক্রান্ত প্রশ্নে সদৃশ পরিগণক।

বর্তমানে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জটিলতম বিষয়গুলির উত্তর পাবার জন্য পরিগণক যন্ত্র ক্রমশ অপরিহার্য হয়ে উঠছে। কিছুকাল আগেও গণিতশাস্ত্রবিদ্ এবং পদার্থ-বিদ্‌রা বিরক্তিকর গণনায় তাঁদের অধিকাংশ সময় ব্যয় করতে বাধ্য হতেন। পরিগণকের দৌলতে এই বিরক্তিকর গণনার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বেশি সময় দিতে পারছেন। সুতরাং, কলাকুশলী, যন্ত্রবিদ্ এবং সৃজনশীল চিন্তানায়কদের কাছে পরিগণক একটি অপরিহার্য সহায়ক যন্ত্র।

অতীতে চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই যন্ত্রটিকে রোগ নির্ণয়ের কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও এই প্রচেষ্টা থাকবে। বিজ্ঞানের এই শাখায়ও অদূরভবিষ্যতে এই যন্ত্রের মহৎ সাফল্য সুনিশ্চিত। কারণ, হাজার হাজার বিশেষজ্ঞের সংগৃহীত উপাত্তগুলির কাজে এযন্ত্রকে সহজেই লাগানো যাবে।

পরিগণক যন্ত্র থেকে কেবলমাত্র প্রতিপাদ্য প্রশ্নের সঠিক উত্তরই পাওয়া যায়।

**শব্দোত্তর তরঙ্গের বিস্ময়কর উপযোগিতা**

কোয়ার্টজ্-নির্মিত ফলকের সাহায্যে যান্ত্রিক কম্পনকে বৈদ্যুতিক কম্পনে পরিবর্তিত করা যায়। এবং বৈদ্যুতিক ঘাতের স্পন্দন রূপান্তরিত হয় শব্দতরঙ্গে। এ সত্য আবিস্কার হবার সংগে সংগেই উচ্চকম্পাঙ্ক বিশিষ্ট পরিবর্তী তড়িৎপ্রবাহ নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা উচ্চকম্পাঙ্কের শব্দ সৃষ্টির কৌশল আয়ত্ব করলেন। এত উচ্চকম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দ মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের আয়ত্বগত নয় ব'লে এই শব্দও শ্রুতিগোচর নয়। আজ, একাধারে ধাতুবিদ্যাবিশারদ ও গৃহস্থ, যন্ত্রবিদ্ ও মদ্য-প্রস্তুতকারক, পদার্থবিদ্ ও মৎস্যজীবী সকলেই এই অশ্রুত শব্দ কাজে লাগাচ্ছে।

শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে কঠিন ধাতুকে যন্ত্রচালিত করা যায়। কাচ, সেরামিক, এবং হীরকখণ্ডে এই তরঙ্গের সাহায্যে যে কোনো আকারের ছিদ্র নির্মাণ করা যায়। যখন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ বস্তুর প্রয়োজন (যেমন, পরমানবিক চুল্লীর নিয়ন্ত্রকের জন্য গ্র্যাফাইট), তখন শব্দোত্তর তরঙ্গের সাহায্যে পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় অন্য কোনো অপবস্তু বর্তমান আছে কি না। তাছাড়া এরই সাহায্যে বস্তুর ধর্মও নিয়ন্ত্রণ ক'রে নেওয়া হয়।

কেবলমাত্র পৃথিবীতেই নয়, মহাজাগতিক শূন্যেও শব্দোত্তর তরঙ্গকে কাজে লাগানো হচ্ছে। আকাশ পথে কৃত্রিম উপগ্রহের উপর মহাকাশের যে বস্তুকণার বর্ষণ হয়, সে সম্পর্কে গবেষণার জন্য এক বিশেষ ধরণের যন্ত্র নির্মাণ করা হয়েছে। উপগ্রহের সংগে সংঘর্ষ হ'লে সেই বস্তুকণাগুলি এই যন্ত্রে বৈদ্যুতিক ঘাত সৃষ্টি করে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার আঘাতের শব্দও এই যন্ত্রের মারফৎ পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই অশ্রুতশব্দের ব্যবহার সুরু হয়েছে। একদিকে, যেমন বিশেষ কয়েকটি রোগনিরাময়ের জন্য ব্যবহার হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার কাজেও এর প্রচলন হয়েছে। এর সাহায্যে যেমন সমুদ্রের গভীরে বিধ্বস্ত জাহাজের অবস্থা নির্ণয় করা হচ্ছে, তেমনি তিমি শিকারেও একে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর বহুল প্রয়োগের সঠিক পরিমাপ করা আজ প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে মানুষের অশেষ কল্যানের মূলে যে সব মহৎ অগ্রগতি ঘটেছে, এখানে তাদের উল্লেখ করা প্রয়োজন। রোগজীবানু সংক্রান্ত জীববিদ্যার উন্নতির ফলে বিভিন্ন প্রতিষেধক আবিস্কৃত হয়েছে,—যেমন, সাপফোনামাইড্স্, পেনিসিলিন এবং ষ্ট্রেপটোমাইসিন জাতীয় অ্যাণ্টিবায়োটিক, নতুন নতুন ভিটামিন এবং এনজাইস্, জীবানুদের কেন্দ্রীয় অম্ল, নতুন নতুন ভাইরাম, যাদের কেন্দ্রীয় অম্ল রোগ সংক্রামকের কাজ করে, ইত্যাদি।

কেন্দ্রীয় অম্ল এক জাতীয় জটিল যৌগ। সমস্ত জীবকোষেই এই অম্ল বর্তমান। কেন্দ্রীয় অম্ল দু' ধরনেরঃ একটি ডিয়োক্সিরিবোনিউক্লিয়াইক অ্যাসিড—সংক্ষেপে DNA, এবং RNA নামে পরিচিত অপরটি হলো রিবোনিউক্লিয়াইক অ্যাসিড।

ছায়াপথে তারার মেঘ
(চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে)

গ্যাসীয় নীহারিকা : অরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত অতিকায় নীহারিকা
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

DNA কেবল জীবকোষের কেন্দ্রাপিণ্ডে থাকে, RNA-র অবস্থান জীবকোষের সর্বত্র। উদ্ভিদ্ কিংবা প্রাণীর বংশধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে ক্রোমোসোম, তার মূল উপাদান DNA। যখন কোনো জীবকোষ দ্বিধাবিভক্ত হয়, তখন কেন্দ্রাপিণ্ডের ক্রোমোসোম দ্বিগুনিত হয়ে অনুজাত কোষে আশ্রয় নেয়। DNA-র রাসায়নিক দ্রব্যগুলি যথাযথ বিন্যস্ত থাকে; বিন্যস্ত দ্রব্যগুলির পৌনপৌনিক অবস্থানে রাসায়নিকশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়। যখনই কোনো কোষ দ্বিধা বিভক্ত হয়, তখন অনুজাত কোষে একই উপাদান ও গঠন রীতি অনুসৃত হয়। এক একটি ক্রোমোসোম-এ থাকে হাজার হাজার DNA-র অনু। বৈজ্ঞানিকেরা আজ রাসায়নিক উপায়ে DNA প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পৌনপৌনিক রাসায়নিক যৌগপরিবারের সুদীর্ঘ শৃঙ্খলে RNA গঠিত। বৈজ্ঞানিকদের ধারণা, RNA হলো ক্রমবিকশিত কোষের রাসায়নিক স্তরের যোগসূত্র।

জন্মগত রোগ নিরাময়ের জন্যে বংশধারা সম্পর্কে গভীর পরিচয় থাকা দরকার। এই পরিচয় থেকেই প্রকাশ পাবে, কেন কোনো বিশেষ জীবানু মারাত্মক হয়, কেনই-বা মানুষের মেধার তারতম্য থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা আশা পোষণ করেন যে, বংশধারার রীতি আয়ত্ব ক'রে তাঁরা ভবিষ্যতে এজাতীয় ত্রুটি নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হবেন।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থিয়োদোসিয়াস্কি Theodosius Dobzhansky) বলেছেন, "শীত গ্রীষ্মের উর্ধ্বে মদ ও সংক্রামক ব্যাধিকে প্রতিরোধ করতে পারে এমন একজন গ্রীক দেবতার মতো সুদেহী ও স্বাস্থ্যবান্ লোক, মেধা যার আইনষ্টাইনের মতো এবং আধ্যাত্মিক সূক্ষতা যার সোয়াইৎজার (Schweitzer)-এর মতো, তাকে রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা কেবল কল্পনাতেই সম্ভব। একদল বিশ্বাস করেন যে সমাজ ও সংস্কৃতির উৎপত্তিগত ভিত্তির হয় কোনো গুরুত্বই নেই, নতুবা এটি শুধু নিজস্ব ধারা অনুসারেই চলবে। অপরপক্ষে, আরেকদলের ধারণা যে, কেবলমাত্র আমাদের সত্তাই চিরন্তন কালের জন্য মানুষের ভবিষ্যৎ গঠন করবার মতো ঐশী প্রজ্ঞার অধিকারী। আমার মনে হয়, এই দুই চরম মতবাদের ভারসাম্য আনবার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত। কিন্তু, ঠিক কোথায় এই ভারসাম্যের অবস্থান, তা খুঁজে বার করা একটি কঠিন সমস্যা।"

স্পষ্টতই. এমন আশা করা ঠিক হবেনা যে. কোনো দিন ভুলপথে লব্ধজ্ঞান পরিচালিত হতে পারে এই আশঙ্কার বিজ্ঞানীরা DNA-র উপর তাঁদের গবেষণা বন্ধ ক'রে দেবেন। কিন্তু যদি মঙ্গোলিজ্ম্, মৃগীরোগ, সহজাত মূর্খতা, এবং বহুমূত্র রোগকে অতীত স্মৃতিতে পর্য্যবসিত করা সম্ভব হয়, তবে পৃথিবীর সামগ্রিক কল্যান।

**চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিঃ**

চিকিৎসাবিজ্ঞানে আজকাল রোগ নির্ণয়ের এবং তার নিরাময়ের জন্য তেজস্ক্রিয় বস্তুর ব্যবহার, শল্য চিকিৎসায় বেদনাহীন উপকরণের প্রচলন, ফুসফুস বৃক্ক পাকস্থলী এবং অক্ষিপট প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এবং অস্ত্রো-

পচারের সময় যান্ত্রিক হৃৎপিণ্ডের ব্যবহার, ক্ষতিগ্রস্ত রক্তকোষের পরিবর্তনের জন্যে সংশ্লেষিত বস্তুর প্রয়োগ, সূক্ষ্ম রক্তকোষ সংশোধনের জন্যে স্বয়ংক্রিয় সীবনীযন্ত্রের ব্যবহার প্রভৃতি নানাধরণের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

### মাইক্রোট্রন

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ই. ও. লরেন্স মাইক্রোট্রন আবিস্কার করেন। অতিপরমানবিক বস্তুকণাকে উচ্চগতিসম্পন্ন করার কাজে এই যন্ত্রটির ব্যবহার। পদার্থবিদ্‌রা পরমানবিক কেন্দ্রপিণ্ডের গুণাগুণ অনুসন্ধানের কাজে এবং কেন্দ্রপিণ্ডের রূপান্তরের জন্যে উচ্চগতিসম্পন্ন বস্তুকণা ব্যবহার ক'রে থাকেন।

নিউট্রন ও প্রোটন দিয়ে প্রধানতঃ পরমানুর কেন্দ্রপিণ্ড গঠিত। যখন এই বস্তুকণাগুলি পরস্পরের সান্নিধ্যে আসে তখন খাটো পাল্লার এক প্রচণ্ড শক্তিশালী বল এদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়। এই সক্রিয় বল তাদের শিরিষ দিয়ে জোড়া বস্তুকণার মতো একত্রে আবদ্ধ রাখে। কেন্দ্রপিণ্ড ধনাত্মক আধানে আহিত। মাইক্রোট্রন যন্ত্রে নিউট্রন এবং ধনাত্মক আধানে আহিত প্রোটনের সাহায্যে কেন্দ্রপিণ্ডটিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করা হয়। প্রক্ষিপ্ত বস্তুকণা এতউচ্চ বেগে গিয়ে কেন্দ্রপিণ্ডকে আঘাত করে যে, খাটো পাল্লার বলক্ষেত্রের ভিতরে প্রবেশ ক'রে সেগুলি কেন্দ্রপিণ্ডের সংগে সংলগ্ন হয়ে যায়।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সারা পৃথিবীতে ৪০টি সাইক্লোট্রন নির্মিত হয়েছে। এদের মধ্যে তিরিশটি যুক্তরাষ্ট্রে, তিনটি ইংলণ্ডে, একটি কানাডায় এবং অবশিষ্ট দু'টি অন্যান্য দেশে। আজকের তুলনায় অনেক কম ছিল এই সংখ্যা। জীববিদ্যা ও ভেষজবিদ্যায় সাইক্লোট্রন ব্যবহার করবার ফলে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ ফল পাওয়া গেছে যে, গবেষণাকার্যের অগ্রগতির জন্যে ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে ক্যালিফোর্ণিয়ায় আরও ষাটটি মাইক্রোট্রন নির্মাণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি মাইক্রোট্রনের সাহায্যে এমন সব আইসোটোপ তৈরি করা হচ্ছে, যেগুলির স্থান জীববিদ্যা, ভেষজবিদ্যা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই উদ্দেশ্যে ৩৫০টিরও বেশি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়েছে।

### মহাকাশের অভিযানে

পৃথিবীর মানুষের চোখে, মহাশূণ্য পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অসীম দূরত্ব পর্যন্ত প্রসারিত সারা মহাকাশ জুড়ে বিরাজ করছে নক্ষত্র ও গ্রহপুঞ্জ। জ্ঞানান্বেষণের আদিপর্ব থেকেই মানুষের মনে দূরবিস্তৃত বহির্জগত সম্পর্কে অপরিসীম আগ্রহ রয়েছে। পৃথিবী ও চাঁদের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার জন্যে মানুষ আজ মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাতে সুরু করেছে। এই উপগ্রহগুলি থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, তা ১৯৬০ সালের আগে পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত ছিল।

এই কৃত্রিম উপগ্রহের সংগে পৃথিবী পরিক্রমণ ক'রে মানুষে আবার নিরাপদে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। আজ, মানুষ সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে পদার্পন করবার স্বপ্ন দেখছে। আধুনিক দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ছায়াপথের অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জও আজ মানুষের দৃষ্টিগোচর।

সৌরজগতের সব অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আবিস্কার করাই মানুষের প্রথম লক্ষ্য। মহাকাশ আবিস্কারের বিষয়টি এখন বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি দেশের এবং সামগ্রিক-ভাবে সারা পৃথিবীর রাজনীতির অন্তর্গত। মহাজাগতিক গবেষণার উন্নতির জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার অপরিমিত অর্থব্যয় করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক, যন্ত্রবিদ্ এবং দক্ষ কারিগরেরা মহাজাগতিক গবেষণার কাজে নিযুক্ত আছেন। আবহাওয়া সম্পর্কে প্রচারিত পূর্বাভাষ যাতে আরো সঠিক হয়, তারজন্যেও অনেক উপগ্রহ সৃষ্টিকরা হয়েছে। দূরেক্ষণ ক্যামেরা সজ্জিত এই উপগ্রহে যে সংবাদ ধরা পড়ে, সেগুলি যথাসময়ে পৃথিবীর গ্রাহক কেন্দ্রে পাঠাবার ব্যবস্থা রয়েছে। নৌবহরের ক্ষেত্রে নাবিকদের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করবার জন্যেও এই উপগ্রহগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

কোনো কোনো উপগ্রহকে ব্যবহার করা হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজে। ইকো-১ নামক উপগ্রহটির সাহায্যে একথা প্রমাণ হয়েছে যে, কণ্ঠস্বর, রেকর্ড এবং চিত্র মারফৎ বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপগ্রহকে সার্থকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। সমাযোজক-কৃত্রিম-উপগ্রহ নিয়েও গবেষণা চালানো হচ্ছে। অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি প্লাষ্টিকের গোলক নির্মিত উপগ্রহের ব্যাস ৩০.৪৮ মিটার এবং ওজন ৫৯.৫ কিলোগ্রাম। এগুলিকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় উপগ্রহ। টেলিফোনে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে এধরনের উপগ্রহের ব্যবহার। এই উপগ্রহের গায়ে বেতারতরঙ্গকে প্রতিফলিত ক'রে সংবাদ পাঠানো হয়। যে সব উপগ্রহ বেতার-তরঙ্গের গ্রাহক, প্রেরক ও অন্যান্য যন্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাদের বলা হয় সক্রিয়-তোতা-উপগ্রহ (active repeater satellite)। এই উপগ্রহ সংবাদ বাহী তরঙ্গ গ্রহণ ক'রে ধরে রাখে এবং তরঙ্গগুলিকে পরিবর্দ্ধিত ক'রে পৃথিবীতে পাঠায়। এরা মহাকাশে অনুতরঙ্গের প্রাকার হিসাবে কাজ করে।

সামান্য উচ্চতাবিশিষ্ট কক্ষপথে (পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০০ মাইল উপরে) এবং অত্যুচ্চ সমলয় (Synchronaus) কক্ষপথে (২২৫০০ মাইল উপরে) সক্রিয়-তোতা-উপগ্রহ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। সমলয় উপগ্রহের পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে। পৃথিবীর কোনো দর্শকের চোখে তাই এ-উপগ্রহ একেবারে স্থির অবস্থানে থাকে। এই পদ্ধতিই বিশ্বব্যাপী দূরেক্ষণ ব্যবস্থাকে বাস্তব রূপ দিতে পেরেছে।

জ্যোতির্বিদ্‌রা পর্য্যবেক্ষণের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহারের পরিকল্পনা করছেন। উপগ্রহে স্থাপিত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা বায়ুমণ্ডলের কুজ্ঝটিকার উপরকার মহাকাশ নিরীক্ষণ করতে পারবেন। পৃথিবীর স্থলভূমি ও জলভাগের যথাযথ আকৃতি ও সঠিক বিস্তার নিরূপনের জন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যবহার সম্ভব হবে। পৃথিবীর নির্ভুল মানচিত্র রচনার ক্ষেত্রেও এ তথ্য অমূল্য হবে। আন্ত-মহাদেশীয় ডাকব্যবস্থায় ভবিষ্যতে চালু হবে রকেটের ব্যবহার। তখন চিঠি পাঠিয়ে একদিনেই জবাব পেতে কোনো বাধা থাকবে না।

**আধুনিক পৃথিবী ও নতুন নতুন সমস্যা**

ইদানীংকালে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিদের অনেকেরই পৃথিবী পর্য্যটন করবার অভিজ্ঞতা রয়েছে। ফলে, বিভিন্ন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্পসংক্রান্ত প্রভৃত জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তারা।

ইউরোপ মহাদেশ পর্যটন ক'রে তারা দেখেছে যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সুইজারল্যাণ্ড, ও ইতালির মতো বিভিন্ন দেশের শিল্পসম্ভার আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতোই উন্নত। ইউরোপের বাকি দেশগুলিতে শিল্পের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে খর্ব। সেখানকার জীবনমানও অপেক্ষাকৃত নীচু। নিকট প্রাচ্যের দেশগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের সংখ্যা নিতান্তই কম। প্রাকৃতিক তৈলখনি থাকার দরুণ এইসব দেশের তৈলসংক্রান্ত গুরুত্ব যদিও আছে, কিন্তু আমেরিকা বা ইউরোপের মতো বিশিষ্ট শিল্প এখানে একেবারেই বিরল। এখানকার অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। কৃষিকার্যের জন্যে তারা জনশক্তির উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল। আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার অবস্থাও অনুরূপ।

এই সব দেশের অধিকাংশই নদীবহুল। তাই স্বাদুজল সম্পদের যোগান ও অফুরান। ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদী তুরস্ক, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পারস্য উপসাগরে এসে পড়েছে। কিন্তু নদীগুলি কৃষকদের বিশেষ কোনো উপকারে লাগে না। ভারতের সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র, আফ্রিকার নীল ও কঙ্গো এবং ব্রাজিলের আমাজন নদীর ও অনুরূপ অবস্থা। এই সব নদ নদী কার্যকর করে তুলতে প্রয়োজন প্রচুর অর্থের বিনিয়োগ। ভবিষ্যতে শিল্পের জন্য এইসব নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যেতে পারে। কৃষিকার্যের জন্যও করা যেতে পারে সেচের সুবন্দোবস্ত। কিন্তু বর্তমানে এ-সব দেশের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, খাদ্য উৎপাদনে এরা এখনো স্বাবলম্বী নয়।

তাছাড়া নিকট ও দূর প্রাচ্য এবং আফ্রিকার অনেক দেশ সম্প্রতি ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। সদ্যমুক্ত এই দেশগুলি তাদের নিজস্ব অর্থনীতি এবং শিল্প গড়ে তুলতে খুবই আগ্রহী। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিশীল, উন্নত স্কুল ও কলেজ স্থাপন করতে তারা উদ্যোগী হয়েছে। সম্প্রতি জাতীয় সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবার জন্যেও তারা সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু এই সব বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করবার মতো প্রচুর সম্পদ নেই এদের হাতে। যেমন নিকট প্রাচ্যের একটি দেশে শিল্পের উন্নতির জন্যে, গৃহব্যবস্থা, জলপথ, রেলপথ এবং সেতু নির্মাণের জন্যে বাৎসরিক তিনশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হ'তো। কিন্তু, গত চার বছরে এই দেশে অনুরূপ অন্যান্য দেশেও কেবল মাত্র সামরিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্যেই অন্যান্য পরিকল্পনা খাতে বিশেষ কিছুই ব্যয় করা সম্ভব হয়নি। শিল্পে অনগ্রসর ব'লে সমস্ত সমর সম্ভারই তাদের বিদেশ থেকে ক্রয় করতে হয়েছে। ফলে তাদের সমস্ত রাজস্বই ব্যয় ক'রতে হয়েছে সামরিক ব্যবস্থার জন্যে। সুতরাং আগের চাইতেও কর্মসংস্থান গেছে ক'মে এবং বেকারীর দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে। শিল্প, চাকুরী এবং খাদ্যের অভাব থাকা সত্বেও এই সময়ের মধ্যেই এই সব দেশে জনসংখ্যাও বেড়ে চলেছে অতি দ্রুত হারে। ধনী এবং দরিদ্রের বৈষম্য ক্রমশঃ পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে।

**দেশবিভাগ**

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক দেশই দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। মূলতঃ এই সব দেশবিভাগ ঘটেছে, দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রাজনৈতিক উপদলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভিন্ন মতাবলম্বী বৃহৎ শক্তিবর্গের স্বার্থ এবং প্ররোচনাই এই দলগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উগ্র দ্বন্দ্বে লিপ্ত করেছে।

দ্বিধাবিভক্ত হবার পর এই দেশগুলিতে নিরীহ জনসাধারণের পক্ষে শান্তি বিঘ্নকারী নানা রাজনৈতিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। একটি কথা প্রচলিত আছে যে, "দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা আনতে হলে বিবদমান দলের মধ্যে দেশকে ভাগ করে দাও"। প্রাচীন রোমকরা তাদের বিজয় অভিযানে এই নীতিই অনুসরণ ক'রে চলত।

এই সব সমস্যার একমাত্র স্বাভাবিক সমাধান হ'লো বিভক্ত দেশগুলির সংযুক্তিকরণ। কিন্তু বাইরের বৃহৎ শক্তিগুলির হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে সব ক্ষেত্রে এই ধরণের সমাধান আনা সম্ভব হবেনা।

মানুষের মৌল অনৈক্যের (Basic human discord) মূলে রয়েছে, ধন ও প্রাকৃতিক সম্পদের অসম বণ্টন, দুর্বল এবং বঞ্চিত শ্রেণীর (Under priviledged) প্রতি শোষণ ব্যবস্থা। সুষম বণ্টনের ভিত্তিতে যা প্রাপ্য ব'লে নির্বিত্ত শ্রেণী বিবেচনা করছে, সেটি আদায় করবার জন্যে সর্বদাই তারা নানাভাবে বিত্তবানদের উপর আক্রমণ পরিচালনা করতে সচেষ্ট রয়েছে। আর বিত্তবানেরাও তাদের অধিকার বজায় রাখবার জন্যে নির্বিত্ত শ্রেণীকে অবদমিত করে রেখেছে। কেবলমাত্র ধনের উন্নততর বণ্টনই সন্তোষের মনোভাব সৃষ্টি করতে পারে এবং নিত্য সংঘর্ষের মূলে যে ঈর্ষা রয়েছে তাকে দূর করতে পারে।

দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকার দেশগুলির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সুবিধাভোগী শ্রেণীর এবং অত্যন্ত দরিদ্র-শ্রেণীর মধ্যে জীবন মানের যে তীব্র বৈষম্য দেখা যায় তা সত্যিই ভয়াবহ। আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয় যেন উভয় শ্রেণীই এই অবস্থাকে স্বাভাবিক ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। কিন্তু বঞ্চিত শ্রেণী এখন ক্রমশঃই জানতে পারছে যে তাদের প্রায় বিনা কারণেই দেশের সম্পদ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। আর এখান থেকেই সূত্রপাত শ্রেণীদ্বন্দ্বের, যার পরিণাম দেশের শান্তিপূর্ণ অবস্থানের পক্ষে বিপজ্জনক।

দক্ষিণ আমেরিকার কয়েকটি দেশে জনসংখ্যার অত্যন্ত মুষ্টিমেয় অংসের কুক্ষিগত রয়েছে দেশের অধিকাংশ সম্পদ। সমান সুযোগ সৃষ্টি, উপযুক্ত বেতন, শ্রমের প্রতিপালন (Protection of Labour), পরিচিত কোন নৈতিক ধারা অনুযায়ী করধার্য্য, কৃষকের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে কোন প্রচেষ্টাই এখানকার কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বঞ্চিত শ্রেণী এখানে নির্মমভাবে শোষিত। আর ঠিক তাদের পাশেই যে মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীশ্রেণী বাস করছে, তাদের যে কোনো একজনের জীবনমান পৃথিবীর উন্নততম জীবনযাত্রার সমান। দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ রাজধানীতেই বিলাসবহুল হোটেলে একজনের একদিকে আহার এবং বাসস্থানের মূল্য দিতে হয় পঁচিশ ডলার। আর হয়তো ঠিক সেই হোটেলেই একজন পরিচারকের মাসিক বেতন মাত্র দশ ডলার। এসব দেশে শান্তিই বা বজায় থাকবে কিভাবে, কিসের ভিত্তিতেই বা প্রতিষ্ঠিত হবে স্থায়ী শাসন-ব্যবস্থা।

এ জাতীয় অর্থনৈতিক পীড়নের বিরুদ্ধে যুঝতে গেলে একান্ত প্রয়োজন শ্রমিক এবং কৃষকদের উপযুক্ত সুবিধা দান করা, ন্যূনতম বেতনক্রম চালু করা, আয়

এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর সম্পদসুষমকারী করধার্য্য করা; স্বাস্থ্য-বীমা এবং বৃদ্ধ বয়সের জন্যে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং (Fringe benefits)-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

## বিচ্ছিন্ন জাতি (Segregation of Races)

যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে নানা জাতি বসবাস করছে আপন আপন ভৌগলিক সীমানার মধ্যে। সে যুগে যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থারও অভাব ছিল কিংবা সামাজিক ও বাণিজ্যিক কোনো আদান প্রদান ছিল না। তাই তারা নিজের নিজের গন্ডীর মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করত। এই কারণেই প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্য্যন্ত ইয়োরোপীয়দের কাছে ইনকা জাতি ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাবিস্কৃত মহাদেশে দলে দলে কৃষ্ণকায় ক্রীতদাসের আগমনের আগে অবধি আফ্রিকার নিগ্রো সম্পর্কে শ্বেত সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না।

যানবাহনের আধুনিক ব্যবস্থায় এবং নিজের নিজের বাণিজ্যিক স্বার্থে আজ পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি মিলিত হয়েছে সাধারণ উদ্যোগে এবং প্রচেষ্টায়। কিন্তু, বিভিন্ন জাতির এই যোগাযোগের ফলে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে নিরর্থক রেষারেষি আর পক্ষপাতিত্ব। স্বাভাবিক বিবেচনায় মনে হয় যে বিভিন্ন জাতির সুসমঞ্জস জীবন যাপনের একমাত্র উপায় হল শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। সহ অবস্থান নিশ্চিতভাবেই একটি প্রাকৃতিক ঘটনা; কি উদ্ভিদজগত, কি প্রাণী জগত, সর্বত্রই বিভিন্ন জীবের মধ্যে এই সহ অবস্থানের নীতিই আবহমান কাল ধরেই বিরাজ করছে।

## শৃংখলাবিধায়ক আন্তর্জাতিক শক্তি (International Force for maintenance of order)

আজ বিভিন্ন জাতি আন্তর্জাতিক শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখবার জন্যে মিলিত হয়েছে বিরাট বহুজাতিক পরিবারে। বর্তমান সভ্যতা এবং জ্ঞানালোকের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো দেশের জনসাধারণের প্রতি নির্য্যাতন এবং অন্যায় নিপীড়নের দৃশ্যের সামনে এই বহুজাতিক পরিবারে আজ আর নীরব দর্শকের ভূমিকা অকল্পনীয়। এই সব ক্ষেত্রে একটি সাধারণ অজুহাত দেখানো হয় যে, কোনো দেশের অভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটে তা হল সে দেশের সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। সুতরাং, অপর কোন রাষ্ট্রের পক্ষে সে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা অসমীচীন। কিন্ত এ কথা আমরা ভুলে যাই যে, এ সমস্যা একান্তভাবে মানুষের, সামগ্রিকভাবে সমস্ত মানবজাতির,—যার মূলে রয়েছে কতকগুলো নীতিবোধের প্রশ্ন। তুর্কীরা বিশলক্ষ আর্মেনিয়ানকে হত্যা করেছিল, ষাটলক্ষ ইহুদী নিধন করেছিল হিটলার, কিউবায় কাস্ত্রো এবং হাইতি দ্বীপপুঞ্জে দুভ্যালিয়র প্রতিষ্ঠা করেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব; আমাদের সামনে এগুলি বিভিন্ন যুগের জাতীয় নির্যাতন এবং হত্যার দৃষ্টান্ত। যখন এ জাতীয় অপরাধ অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তখন সে সব দেশের নাগরিকেরা নীরব থাকবে কেন? যখন একটি উন্মত্ত লোকের বিকৃত খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্যে সারা দেশ জুড়ে অন্যায় এবং অত্যাচার চালানো হয়, কেন তখন লক্ষ লক্ষ ধর্মানুরাগী নাগরিক প্রতিবাদে গর্জে ওঠেনা বা উঠতে পারেনা? এই সব দেশ নিশ্চয়ই

শাস্তিযোগ্য। এদের শাস্তি বিধানের উপযুক্ত আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন করা দরকার। এ জাতীয় আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ থাকলে হয়তো অনেক অনন্য সাধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট মানুষের জীবনরক্ষা করা যেত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ষাট লক্ষ ইহুদীর ভয়াবহ পরিণামের কথা আমরা ভুলবো কি ভাবে? এ ঘটনা ভুলে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটা মারাত্মক ভুল হবে। ভবিষ্যতে হয়তো সমস্ত পৃথিবীকে আরও বড় মাপে এই ভুলের মাশুল যোগাতে হবে।

অনগ্রসর দেশে যে সব ছাত্রেরা অগ্রসর দেশে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কারিগরী বিদ্যা অধ্যয়নে রত, তারা দেশে ফিরে গিয়ে উন্নত বিদ্যার অনুকূলে কাজের সুযোগ পায় না বললেই চলে। ফলে তাদের শিক্ষা এবং প্রতিভা দেশের এবং নিজেদের উন্নতির পক্ষে কদাচিৎ সার্থক হয়ে ওঠে। অনুন্নত দেশের পক্ষে সবচেয়ে কার্য্যকরী পন্থা হ'লো বেশী সংখ্যায় কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করা। এই সব কারিগরী বিদ্যালয় তৈরী করবে ছুতোর, কামার, ওয়েলডার, ইলেকট্রিসিয়ান, রাজমিস্ত্রী প্রভৃতি বিভিন্ন কারিগর এবং দক্ষ শ্রমিক। এই সব দক্ষ শ্রমিকেরাই ভবিষ্যতে নতুন শিল্প প্রকল্প গড়ে তুলে তার পরিচালনার ভার নেবে। তারপর গড়ে তুলতে হবে বিভিন্ন প্রকল্প উদ্ভাবক ইঞ্জিনিয়ারিং সংগঠন, যেখানে গবেষণা এবং উন্নতি সাধনের কাজে ছাত্রদের প্রস্তুত করা হবে।

**স্বয়ংক্রিয়তা (Automation)**

গত পঁচিশ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলা হয়েছে। এই স্বয়ংক্রিয়তার ফলে জনশক্তি না বাড়িয়েই উৎপাদনের হার বহুগুণ বৃদ্ধি করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই কর্মচারীর সংখ্যা ন্যূনতম পর্য্যায়ে কমিয়ে ফেলা হয়েছে। উৎপাদন শিল্পে এই ধরণের উন্নতির ফলে কার্য্যতঃ দেশে বেকারীর সৃষ্টি হতে চলেছে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করবে। অর্থাৎ বেকারের হার অনেকগুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু এ জাতীয় সমস্যার সমাধান খুব শক্ত নয়। কাজের সময় সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে তিরিশ ঘণ্টায় আনলে সমস্যার অনেকটা সুরাহা হতে পারে।

**নানা দেশে জাতিতে জাতিতে বিভিন্নতার সমস্যা**
**Segregation Problem within the Country**

পৃথিবীর নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে পার্থক্য একটি সাধারণ স্বীকৃত সমস্যা। আজকের মানুষকে এই সমস্যার গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করতে হবে এবং তার সমাধানের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে হবে।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি এসে শান্তিপূর্ণভাবে একত্র বসবাস করছে। তারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে এই মহান্ জাতিকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও মুক্ত দেশে পরিণত করতে গভীর ভাবে সাহায্য করেছে। এই বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে যুক্তরাষ্ট্রের বিমিশ্র জনসাধারণ গড়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রে প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতা ও মর্য্যাদাভোগের সমান অধিকার অঙ্গীকৃত রয়েছে। নিগ্রোদের এখানে শ্বেতকায় প্রতিবেশীর সমান মর্য্যাদা ও

অধিকার। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নিগ্রোদের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রো নাগরিকেরা অনেক বেশি উন্নত জীবনমানের অধিকারী। এটাই স্বাভাবিক এবং আশানুরূপ। কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য অর্জনের পিছনে এবং লক্ষ্যে উপনীত হবার দিকে তাদেরও নিজস্ব অবদান রয়েছে। এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসিরা বিভেদমুক্ত হ'য়ে সমান অধিকারের ভিত্তিতে বসবাস করবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কাছে তারা হয়ে উঠবে সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের একটি আদর্শ দৃষ্টান্তস্থল।

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে কলাবিষয়ক শিক্ষনের বিশেষ প্রয়োজনীতা
## New course of Humanities in our Colleges

পৃথিবীর সর্বত্রই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে কারিগরি বিদ্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কী ভাবে অধিকতর ফসল ফলানো যায়, উন্নততর প্রক্রিয়ায় চাষআবাদ করা যায়, বা রোগের উপযুক্ত প্রতিষেধক উদ্ভাবন করা যায়, তার জন্যে বিভিন্ন ব্যবস্থা এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে। কিন্তু লোককে কলা বিষয়ে (Humanities) শিক্ষিত ক'রে তুলবার মতো বিভিন্ন ধরণের বিভাগ এ-সব প্রতিষ্ঠানে যথেষ্ট পরিমাণে নেই। পরস্পরের সংগে শান্তিতে ও সদ্ভাবে থাকতে গেলে যে মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে সম্পর্কে শিক্ষা দেবার মতো যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত এসব জায়গায় নেই। ব্যক্তি এবং জাতি, উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিরক্ষার জন্যে বর্তমানে এধরণের শিক্ষার প্রয়োজন আগের তুলনায় অনেক বেশি। বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নত কারিগরি বিদ্যা অতীতের যুদ্ধে মানববিধ্বংসী কাজে প্রযুক্ত হ'য়ে এতকাল ধ'রে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকেই চরিতার্থ করেছে। জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে পরস্পরের সংগে শান্তিতে বসবাস করা,—এই শিক্ষায় যদি বর্তমানের তরুণ মনকে শিক্ষিত ক'রে তোলা না যায়, তবে ভবিষ্যতে আবার অতীতেরই পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

## জনসংখ্যার বিস্ফোরণ
## Population Explosion

আধুনিক যুগে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সেটি হলো 'জনসংখ্যার বিস্ফোরণে'র সমস্যা। বিশেষ ক'রে অনুন্নত দেশের পক্ষে এসমস্যা আরও গুরুতর। এই সব দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই কায়ক্লেশে জীবিকানির্বাহ করে। সর্বজনীন শিক্ষার সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে সুদূরপরাহত। এই অতলান্ত অবস্থা সত্বেও এই সব দেশে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটছে দ্রুততম গতিতে। ভবিষ্যতেও সরকারের সমস্যা সমাধান করবার ক্ষমতা অতিক্রম ক'রে আরো দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই সমস্যা সমাধান করবার একটি সম্ভাব্য পথ হচ্ছে জন্মনিয়ন্ত্রণ। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, ভারত, জাপান এবং নয়াচীনের সরকার এই দিকে কতকগুলি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই সব কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনার অনুবর্তী করা। কিন্তু জন্ম নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যক্রম সর্বজনগ্রাহ্য হওয়া খুবই কঠিন। বিশেষ ক'রে পাশ্চাত্য দেশে, যেখানে জনসংখ্যার চাপ প্রাচ্যের তুলনায় অনেক কম, সেখানে একদল লোক সবসময়ই এর তীব্র বিরোধিতা করবে। অনেকেই জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের বিপক্ষে। কিংবা, মানুষকে এ-ব্যাপারে
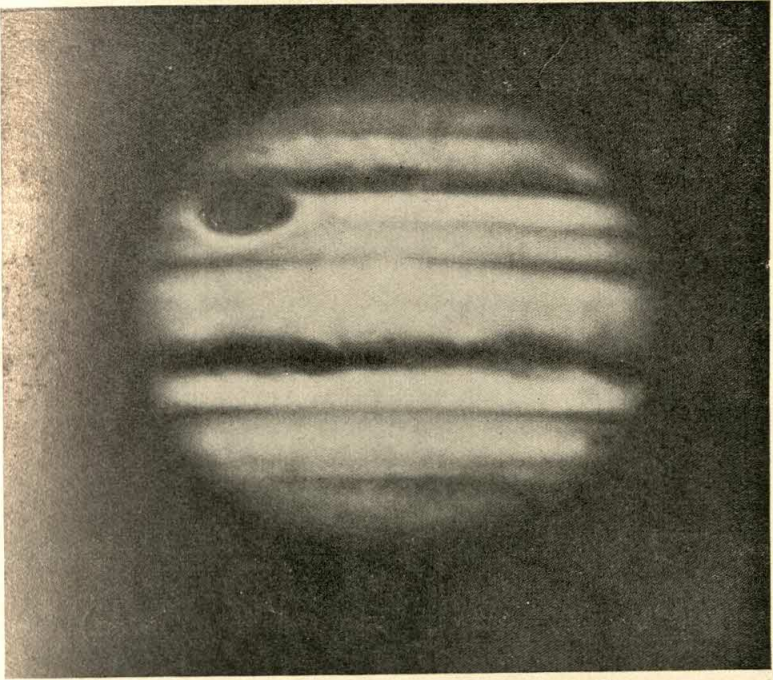
সৌর পরিবারের পঞ্চম ও বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )
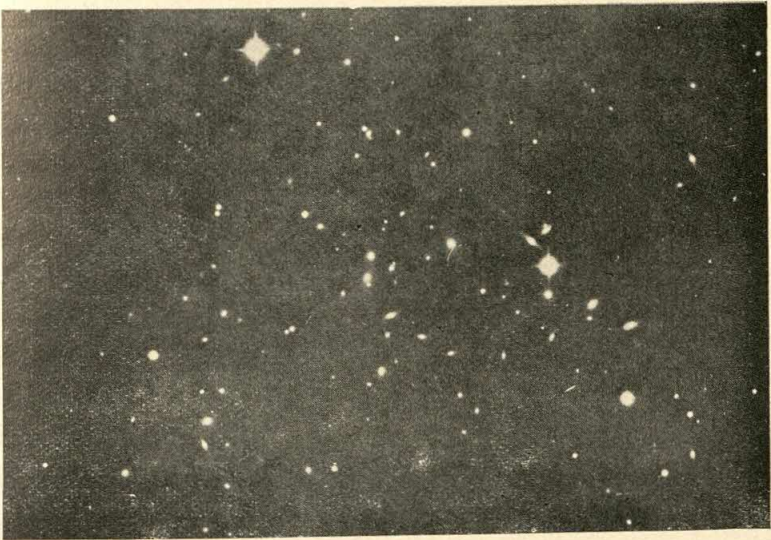
করোনা বোরেলিস নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত নীহারিকাপুঞ্জ
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

লিয়ো নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত চারটি নীহারিকা।
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )
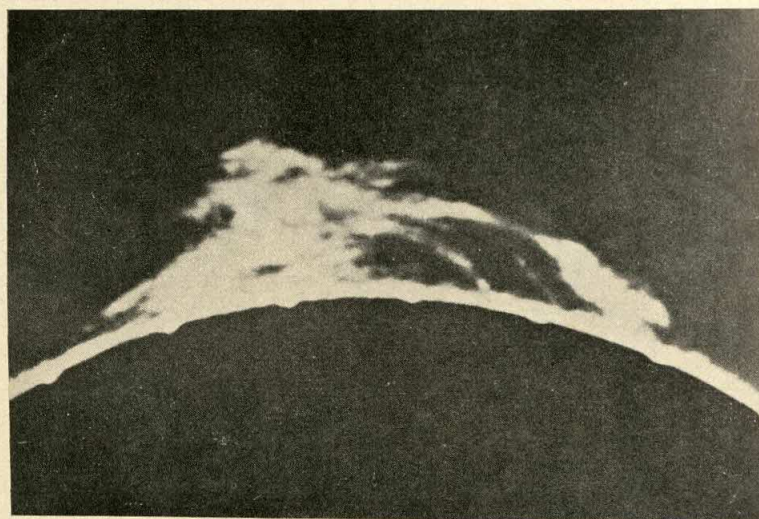
১৩২,০০০ মাইল উচ্চ অভিক্ষিপ্তাবস্থা সহ সূর্যে—ফালি চিত্র
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

নিজের খুসিমতো চলতে দেওয়া উচিত নয়, এই ধারণাও তারা গ্রহণ করতে রাজি নয়। জন্ম নিয়ন্ত্রনের পিছনে যে মনোভাব কাজ করছে সেটি হলো এই যে, পিতামাতা যে কটি সন্তানের ভরণপোষণ, শিক্ষাদান এবং বিশেষ ক'রে পালনের ব্যবস্হা করতে সমর্থ, তার চেয়ে বেশিসংখ্যক সন্তানের জন্ম দেবেনা। এই সর্তে রাজি হ'তে বাধ্য করতে পারলে দেখা যাবে, অনেক সন্তানধারণক্ষম মাতাপিতারই শেষ পর্য্যন্ত কোনো সন্তান থাকা উচিত নয়। আবার এ-ও দেখা যাবে, যারা উপরোক্ত সর্তে রাজি, তাদের মধ্যে অনেকেরই জন্মনিয়ন্ত্রন পদ্ধতিকে সার্থকভাবে ব্যবহার করবার মতো উপযুক্ত জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

# শান্তি আনয়নে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ব্যর্থতা

লুই পাস্তুর বলেছেন, “আমার দৃঢ়বিশ্বাস, যুদ্ধ ও মূঢ়তাকে পরাস্ত ক'রে একদিন বিজ্ঞান ও শান্তি জয়লাভ করবে। বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সংগে মিলিত হবে, ধ্বংসের কাজে নয়, বরং জাগতিক উন্নতিবিধানের কাজে। আর্তমানুষের জন্যে যারা জীবন পণ করছে, ভবিষ্যত তাদের বরণ করবে সাদরে।” এরপরও প্রায় সত্তর বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এই সত্তর বছরে উন্নত আদর্শের লক্ষ্যের দিকে উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতিই ঘটেনি।

আধুনিক জগতে বিজ্ঞান হলো শান্তিবিরহিত জগতের বিজ্ঞান। তবুও বিজ্ঞান-বিরহিত শান্তির জগত একটি অবাস্তব কল্পনা। মূলতঃ, মানুষের চিন্তাকে পরিমার্জিত করাই বিজ্ঞানের কাজ। এবং, শান্তিপূর্ণ জগতে উত্তরণের জন্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ ধ্যান ও উদ্যোগের একান্ত প্রয়োজন। যদিও কারিগরি সভ্যতার অগ্রগতির দিকে বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনীয়ারদের অবদান বিস্ময়কর, কিন্তু মানুষের সংগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি রাজনীতিবিদের কবলেই রয়ে গেছে। এবং, দুঃখের বিষয়, এসম্পর্কে তাঁদের ভূমিকাও মর্মান্তিক। এই বিষয়টির অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখনও 'ছ্যাকড়া গাড়ি'র যুগে বাস করছি। মানবজাতিকে যদি উভয়দিকের অগ্রগতিকে সমান তালে অর্জন করতে হয়, তবে বর্তমানযুগের বিজ্ঞান ও শিল্পের সংগে সংগে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কেরও উন্নতিসাধন করা দরকার। এ ব্যাপারে একমাত্র বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমেই আমাদের জীবনের বহুবিধ জটিল সমস্যার জট ছাড়ানো যেতে পারে। এবং, এই পথেই গড়ে উঠবে আমাদের বহু-ঈপ্সিত শান্তির জগত।

গতশতাব্দী ধ'রে বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি ঘটেছে, প্রকৃতপক্ষে সেটি মহাজগতের প্রাকৃতিক নিয়মের উন্নততর এবং অধিকতর সামগ্রিক জ্ঞান থেকেই পাওয়া গেছে। যেসব মহান্ অগ্রগতি আধুনিক জগতকে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে, সেগুলি জাগতিক

কীর্তি সম্পর্কে আমাদের প্রগতিশীল এবং নিরবচ্ছিন্ন অন্তর্দৃষ্টির ফল। মাত্র পচাঁত্তর বছরের স্বল্প পরিসরে সৃজনশীল বুদ্ধির বলে মানুষ যে অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে, তা বিস্ময়কর। মানুষ আজ মাটির বুকে মোটর চালাতে শিখেছে, ডুবো-জাহাজ পরিচালনা করছে সমুদ্রের অতল গভীরে, দ্রুতগতিসম্পন্ন উড়োজাহাজ আকাশের বুকে পাড়ি জমাচ্ছে, জীববিদ্যাগত অগ্রগতির ফলে মানুষ আজ আয়ুর পরিধি বাড়িয়েছে, সার্থক ঔষধ আবিস্কার ক'রে লাঘব করেছে রোগের যন্ত্রণা। জল, জীবাশ্ম, জ্বালানী এবং পরমানবিক শক্তির উৎস থেকে যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক ক্ষমতাকে সে আজ কাজে লাগিয়েছে কোটি কোটি মানুষের দাসত্ব মোচনে। সে আজ যন্ত্রকে এমন সব দ্রুত ও নির্ভুল পদ্ধতিতে পরিচালিত করছে, যা তার নিজের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। এমনকি সমস্ত স্বয়ংচালিত যন্ত্রকেও সে পরিচালিত করছে। টেলিগ্রাম, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিসনের মাধ্যমে পৃথিবীর চারধারে মুহূর্তের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। আজ, মানুষ মহাকাশের দূরতম প্রদেশেও নিজেকে স্থাপন করতে শিখেছে।

কিন্তু, এই বহুবিধ কীর্তির দুটো রূপ আছে, একটি দিক ভালো, অপরটি মন্দ। উড়ো জাহাজের ব্যবহার কেবলমাত্র একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন শান্তিপূর্ণ যান ব্যবস্থাতেই নয়, একটি মারাত্মক অস্ত্র হিসাবেও বটে। জীবানু ও ভাইরাস-এর জীবন সম্পর্কে মানুষের সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে আমাদের জীবনকে সুরক্ষিত করেছে, স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরমায়ুও বাড়িয়েছে, কিন্তু সংগে সংগে এরই মাধ্যমে তৈরি হয়েছে এমন সব মারাত্মক মারণাস্ত্র যাদের স্থান সম্ভবতঃ পরমানবিক বোমার পরেই। ইউরেনিয়ামের বিভাজন আবিস্কৃত হবার পর এবং পরবর্তী পরমানবিক প্রয়োগবিদ্যার উন্নতির কল্যাণে এই প্রথম মানুষের আয়ত্বে এসেছে শক্তির এমন এক উৎস যা সূর্যকে বাদ দিয়েও অর্জন করা যেতে পারে। এই সংগে অতিপরমানবিক তাপবিক্রিয়ার সম্পর্কে আমাদের উত্তরোত্তর বর্ধিত জ্ঞানও মিলিত হয়েছে। ফলে, অতিদূর ভবিষৎকালের জন্যেও সৃষ্টি হয়েছে এক সীমাহীন শক্তির সম্ভাবনা। পরমানবিক শক্তির এটা হলো মঙ্গলের দিক। কিন্তু এর অশুভ দিকটির কথাও ভুললে চলবেনা,—সে হলো পরমানবিক বোমা। মানুষের হাতে আজ এমন একটি অস্ত্র রয়েছে, যা অনাগত যুগের সমস্ত মানুষের জীবনকে বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে। এই মারাত্মক আয়ুধের অস্তিত্বের ফলে আজ আর কারো পক্ষেই যুদ্ধে জয়লাভ করা সম্ভব নয়।

প্রাক্‌পরমানবিক যুগে যুদ্ধের পরিণতি ছিল জয় পরাজয়ে। যতদিন না মতের পরিবর্তন এসেছে, ততদিন পর্যন্ত যুধ্যমান দেশগুলির ভিন্ন মতাদর্শের ফলে একের পর এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। সেযুদ্ধে বিজয়ী দেশের পক্ষে বিজিত দেশের উপর বাধ্যবাধকতার চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হতো। জার্মানী ও জাপানের উপরও এইভাবেই যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে পেরেছিল। তা সত্বেও বিজিত দেশের পুনরুত্থানের সম্ভাবনা থেকে যেতো। তার কারণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি যত ভয়ঙ্করই হোক না কেন, তা অপূরনীয় ছিল না। তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যুদ্ধোত্তর যুগের জাপান ও জার্মানী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ক্ষয়ক্ষতির বোঝা ঝেড়ে ফেলে কত দ্রুত এই দুটি দেশ আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসছে।

কিন্তু, পরমানবিক যুদ্ধ সংঘটিত হ'লে মানবসভ্যতার বিলুপ্তি অবধারিত। বর্তমান সভ্যতার পুনরুদ্ধারও সম্ভব হবে না। কোটি কোটি মানুষ এই যুদ্ধে ধরাপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। পৃথিবীর বড়ো বড়ো শহরগুলি পরিণত হবে ধ্বংসস্তূপে। আর, পৃথিবীর যাবতীয় মাটি, জল, বায়ু তেজস্ক্রিয়তা প্রাপ্ত হবে। জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য খাদ্য তেজস্ক্রিয়তাদোষে দুষ্ট হবার পর কার্য্যতঃ মহাপ্রলয়ের বহুকাল পরেও পৃথিবী প্রাণধারণের অনুপযুক্ত থেকে যাবে। কোনো পক্ষই বিজয়ীর গৌরব অর্জন করতে পারবে না, উভয়েরই ক্ষতি হবে সমান। যারা এই দুর্ঘটনার পরেও বেঁচে থাকবে, তারা হতভাগ্য। বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে নতুন ক'রে জীবন সুরু করবার মতো কোনও সম্বলও তাদের থাকবে না।

মানুষ আজ যে সমস্ত বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক কীর্তির অধিকারী, শুভ বা অশুভ যাই হোক না কেন,—সেই সব কীর্তি অর্জনের মূলে রয়েছে উত্তরোত্তর বিশ্বের প্রাকৃতিক নিয়মগুলির সঠিক অনুধাবন। গ্রীক জ্যোতির্বিদ্যার ভূকেন্দ্রীয় তত্ব থেকে সুরু ক'রে, কোপার্নিকাস ও কেপ্‌লারের সূর্য্যকেন্দ্রিক মতবাদ অনুসরণ ক'রে বর্তমান ক্রমবর্ধমান জগতের চিন্তায় মানুষের জ্ঞানের এই উত্তরণ। ষোড়শ শতাব্দীতে নিউটনের মহাকর্ষবলের সূত্রই প্রথম সম্পূর্ণ গণিতের ভিত্তিতে সৌরপরিবারের গ্রহগুলির গতি প্রকৃতির ব্যাখ্যা করে। এবং সংগে সংগে সৌরপরিবারের বাইরের মহাজগতেরও একটি যুক্তিসিদ্ধ চিত্র উপস্থাপিত হয়।

এই অনন্ত আকাশ জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য বস্তুপুঞ্জ। তাদের কয়েকটিকে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, এরা প্রত্যেকেই গঠনে ও প্রকৃতিতে পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এদের ঘনত্ব, উষ্ণতা এবং পরমানবিক গঠন, সবই ভিন্ন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের মধ্যে এক আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা, ছন্দ এবং শান্তি বিরাজমান। এই বহুদূর আকাশচারী বস্তুপুঞ্জের প্রকৃতিতে হয়তো আমরা পার্থিব শান্তির মূল মন্ত্র খুঁজে পেতে পারি। নির্বাক এই বস্তুপুঞ্জের প্রকৃতির গভীর অনুধাবন হয়তো মানুষের শান্তিপূর্ণ ভবিষ্যতের ইংগিত দিতে পারে।

মহাজগত সম্পর্কে বহুতর মতবাদই প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে হয়তো কোনটা আমাদের গ্রহণযোগ্য, কোনটা হয়তো নয়। কিন্তু নির্বিশেষে সমস্ত তত্ত্বের মধ্যেই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটা হল প্রকৃতির রাজ্যে শৃংখলা এবং মিল। আমাদের আপন সৌরমণ্ডলীর অতিপরিচিত প্রক্রিয়াতেই হোক বা ভান্তঃ প্রদেশের স্বল্প পরিচিত কর্মকাণ্ডেই হোক, সর্বত্রই প্রকৃতির এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রকৃতির রাজ্যে যে সব বল ক্রিয়াশীল তা আমরা বুঝি আর নাই বুঝি, এটা নিশ্চিত জানি যে মহাবিশ্ব জুড়ে সমস্ত বস্তুপুঞ্জই নক্ষত্র কিংবা গ্রহের আকারেই হোক কিংবা ছায়াপথ বা মহাজাগতিক গ্যাসের আকারেই হোক, নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকৃতির অমোঘ বিধান মেনে চলছে। যে মহাকর্ষবল আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলি এবং ছায়াপথের নক্ষত্রগুলির গতি পরিচালিত করছে, মহাশূন্যের অন্য কোথাও তা হয়তো প্রকাশ পাচ্ছে মহাজাগতিক বিকর্ষণ বলের মাধ্যমে, যার প্রকৃতি আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু যে বলই ক্রিয়াশীল হোক না কেন, বস্তুপুঞ্জ তা যে মেনে চলছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

বিশ্বজগতের এই শিক্ষাকে নিজেদের মধ্যে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপনের উপযোগী ক'রে রূপদান করতে পারাই মানবকল্যানকামীদের কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনে তাঁরা ব্যর্থ হ'লে, সে-দায়ভাগ তাঁদেরই বহন করতে হবে। লোরেন আইসেলে'র (Loren Eiseley) মতে, পৃথিবী কতটা উপকৃত হ'লো তার বিচারে বিজ্ঞানের সত্যিকার মূল্য নয়, যাঁরা জ্ঞানীগুণী তাঁরা কতটা উপকৃত হলেন তারই বিচারে। আজ মানুষ যে বহুতর সমস্যার সম্মুখীন, তার সমাধান কোনো একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এই গর্ব করতে পারেন যে, তাঁর মাতৃভূমি আইনের রাজত্ব, ব্যক্তির খেয়ালের বশীভূত নয়। আইনের রাস্তায় সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে, এই হলো এখানকার সাংবিধানিক রীতির অন্তর্নিহিত নীতি। ইংরেজ দার্শনিক জন ডন (John Donne) বলেছিলেন, প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বরের সর্বজনীন বিধান। যদি তাই হয়, তবে বিশ্বের ক্রিয়াকাণ্ড যে ভৌতিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তার প্রকৃতি নিরূপণই আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কী রূপ নেবে সে সম্পর্কে আমাদের নতুন অন্তর্দৃষ্টি এনে দেবে।

**বিশ্ব শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ভিত্তি**
**A basis for attaining World order.**

অতএব সংগতভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কীভাবে ভৌতিক নিয়মগুলিকে আমরা ব্যাখ্যা করবো, যাতে ক'রে সেগুলি মানুষকে তার সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের পথ দেখাতে পারে। সম্ভবতঃ, প্রথম শিক্ষা হচ্ছে একথা স্মরণ রাখা যে প্রকৃতির মধ্যে যে শৃঙ্খলা দেখা যায় তার মূলে যা রয়েছে, সেটি সমতা নয়। বরং বিশ্বচরাচরের শৃঙ্খলার মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নিয়মের এক অলঙ্ঘ্য কঠিন বন্ধন। মানুষ তার বৈশিষ্ট্যে, ঐতিহ্যে, শিক্ষায় ও দীক্ষায় পরস্পরের সংগে এত পৃথক যে তার উপর জোর ক'রে এক পৃথিবী, এক প্রকৃতির চিন্তা আরোপ করবার চেষ্টা ব্যর্থ হবেই, একথা আজ আমাদের উপলব্ধি করা দরকার।

আসলে বিশ্বজগতটাই 'এক জগত' তত্ত্বের একটি প্রকাণ্ড ব্যতিক্রম। সৌর-পরিবারের গ্রহগুলির কারো সংগে কারো মিল নেই, তবু সকলেই সেই মহাকর্ষ বলের অনুবর্তী যার প্রভাবে তারা আপন আপন কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ ক'রে ফিরছে। প্রত্যেক গ্রহই নিজের নির্দিষ্ট কক্ষপথে সঞ্চরণশীল, এব্যাপারে প্রতিবেশী গ্রহের সংগে তার কোনো দ্বন্দ্ব নেই। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহগুলি মিলিত হয়ে যে একটি অভিন্ন বস্তুতে পরিণত হবে, অথবা ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হবে, এমন কোনো সম্ভাবনাও তাদের মধ্যে নেই।

সুতরাং সর্বজনীন শৃঙ্খলার প্রয়াসে আমরা যদি বিভিন্ন জাতি এবং লোককে এক জাতির অথবা একক বিশ্বসংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করবার চেষ্টা করি, তবে সেটা ভুল হবে। বরং প্রতিবেশী যেসব জাতির সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য অনুরূপ, তারা একত্রিত হয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মতো বড়ো বড়ো দেশ গড়ে তুলতে পারে। বর্তমানে কতকগুলি ছোটো ছোটো জাতি ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হ'য়ে রাজনৈতিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করেছে। এইসব সদ্যমুক্ত জাতিগুলি এক অনিশ্চিত পরিণামের সম্মুখীন। এই সব নতুন নতুন ক্ষুদ্র ও অত্যন্ত অনুন্নত

জাতিগুলি জাতিসংসদে পূর্ণ অধিকার লাভ করেছে। যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, আফ্রিকার অনেক অতিক্ষুদ্র জাতি জাতিসংঘের দরবারে ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের মতো প্রাচীন ও অতি উন্নত দেশের সমান অধিকার ভোগ করছে।

বিশ্বে প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রনের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুকণাই প্রথমে গঠন করে পরমানু। পরপর পরমানু থেকে অনু এবং অনু থেকে জটিল মন্ডলের সৃষ্টি। বস্তুকণা যতই উন্নততর মন্ডলে সংযুক্ত হয়, উত্তরোত্তর ততই প্রত্যেক বস্তুকণার নিজস্ব স্বাধীনতা খর্ব হয়ে আসে। অনুরূপভাবে, মানব সমাজের ক্ষেত্রেও দেখা যায় ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ। শূন্যস্থানে বস্তুকণার যে অবাধ স্বাধীনতা থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়। বায়ুমন্ডলের অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন মহাকর্ষ বলের জন্যে ভূমন্ডলেই আবদ্ধ থাকছে, মহাশূন্যে মুক্তি পাচ্ছেনা। নিষ্কলংক ইস্পাতের অনুগোষ্ঠি আরো বেশী মাত্রায় সংকুচিত, আবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত। এই সব অনু-গোষ্ঠির প্রোটন, নিউট্রন এবং ইলেকট্রন সর্বদাই মন্ডলের উপযোগী পূর্বনির্ধারিত কাঠামোয় আবদ্ধ থাকে। মন্ডলের স্বার্থে তাদের মূল্য দিতে হয় কিছুটা নিজস্ব স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে। অত্যধিক স্বাধীনতা নৈরাজ্যেরই নামান্তর। এ জাতীয় স্বাধীনতায় মানুষ বিপন্ন হয়, তার সামাজিক অগ্রগতিও ক্ষুন্ন হয়।

সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলিকেই অল্পসংখ্যক কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে মিলিত করাটাই সবচেয়ে কার্য্যকরী এবং যুক্তিসংগত হবে। প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলি মোটামুটি প্রাকৃতিক ভূগোলের সীমানা অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এই সব অঞ্চলে, অনুরূপ বিকাশ, ঐতিহ্য এবং মানসিকতার জন্যে প্রত্যেক জাতির আপন প্রচেষ্টাকে সংঘবদ্ধ করা যাবে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির এক সাধারণ কর্মসূচীতে। কোন অঞ্চলের বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধের মীমাংসা তারা নিজেরাই করবে।

এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা এই কয়টি প্রাকৃতিক ভৌগলিক অঞ্চলে পৃথিবীকে ভাগ করা যেতে পারে। এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য অত্যন্ত বেশী; সেক্ষেত্রে যদি তাদের একই মন্ডলে আবদ্ধ করাবার কাজটি দুরূহ প্রতিপন্ন হয়, তবে এশিয়াকে বর্তমান সোবিয়েত গোষ্ঠি এবং দূর প্রাচ্যের জাতিতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যদি কোন দেশ তার আঞ্চলিক গোষ্ঠিকে মন্ডলীবদ্ধ করতে না চায়, তবে সেই অঞ্চলে অন্যান্য দেশের যৌথ প্রচেষ্টাকে তাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়। কোন জাতিরই স্বাধীনতা বিসর্জন দেবার প্রয়োজন নেই! মন্ডলীবদ্ধ প্রত্যেক জাতিরই আপন ঐতিহ্য, আচার ও ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকবে, নিজস্ব ধারায় তারা অবকাশ যাপন করবে। সংগে সংগে তারা যুক্তরাষ্ট্রের দেশগুলির মতো এবং ইউরোপের বারোয়ারী বাজারের দেশগুলির মধ্যে যেমন সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তেমনি এক বারোয়ারী স্বার্থে সকলেই আবদ্ধ থাকবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এ জাতীয় আঞ্চলিক বিন্যাসের মনোভাবই যুক্তরাষ্ট্রে অরাজকতার অবসান ঘটিয়েছে। বিপ্লবোত্তর কালে অনেক বছর ধরেই "সংসদীয় সনদের" আজ্ঞায় আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি কাজ করছিল। কিন্তু অনুশাসনের এই দলিল এতই দুর্বল চরিত্রের ছিল যে রাষ্ট্রগুলি কার্য্যতঃ স্বশাসিতই ছিল। বিপ্লবের

অবসানে রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার মতো আর কোনো সাধারণ লক্ষ্যও সামনে ছিলনা। অর্থকরী বিভেদের ফলে ব্যবসাবানিজ্য পঙ্গু হতে বসেছিল, কতিপয় রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তরোত্তর যুদ্ধের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠছিল। সুতরাং ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে, বিজ্ঞজনেরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রগুলিকে এক সাধারণ প্রজাতন্ত্রে যুক্ত করে সংসদীয় সংবিধান রচনা করলেন। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রের বিস্ময়কর অগ্রগতি এই আঞ্চলিক বিন্যাসের সার্থকতার সাক্ষ্যই বহন করে চলেছে।

সারা দুনিয়া জুড়ে যদি এই একই ব্যবস্থার প্রচলন করা যায় তবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্বল দেশগুলিকে কার্য্যকর অঞ্চলে (Workable Regions) সংবদ্ধ করা যাবে। সেখানে তারা নিজেরাই দেশীয় সমস্যা সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে সক্ষম হবে। স্থানীয় যে সব বিরোধ দেখা দেবে, প্রত্যক্ষভাবে জড়িত লোকেরাই আঞ্চলিক আইনব্যবস্থার সাহায্যে তার মীমাংসা করে নেবে। জাতি সংসদে কেবলমাত্র আন্তঃ-আঞ্চলিক প্রশ্নগুলিই উপস্থাপিত হবে। ফলে জাতি সংসদের কাঠামো হবে অনেক সরল এবং বর্তমানে শতাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের অংশ গ্রহণে যে ফললাভ করা যাচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশী ফল পাওয়া যাবে।

কোনো নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের সমস্ত জাতির লোকেরাই সেই অঞ্চলের সর্বত্র স্বাধীন-ভাবে যাতায়াত করতে পারবে। শুল্ক বিভাগ কিংবা সীমান্ত বিধির কোন বাধা সেখানে কার্য্যকরী হবেনা। আঞ্চলিক সম্পদের উন্নতিসাধন ক'রে অঞ্চলের সব জাতিই তার সদ্ব্যবহার করবে। অঞ্চলের কোন একক দেশেরই সামরিক ব্যবস্থা থাকবেনা। বহিরাক্রমণের হাত থেকে রক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী সামগ্রিকভাবে অঞ্চলটির তত্বাবধানে থাকবে।

বর্তমানযুগে বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র সকল দেশই তাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ, সক্ষম এবং গুরুত্বপূর্ণ নাগরিকদের কূটনৈতিক কাজের উদ্দেশে অন্য দেশে প্রেরণ করছে। অনেক উপযুক্ত লোককেই শুল্কবিভাগীয় এবং সীমান্ত তত্বাবধান সম্পর্কিত কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে সত্যিকারের কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ তাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। আঞ্চলিক কাঠামোয় এই সব ক্ষমতাবান লোকদের অধিকাংশকেই জড়ো করা যাবে অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্পের উন্নতি সাধনের কাজে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির এ জাতীয় বিন্যাসের ফলে বিরাট অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক শক্তি অঞ্চলটির অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির করায়ত্ত হবে। ফলতঃ বিকল্প এবং বিপ্রতীপ (Duplication and cross) উদ্দেশ্য জনিত আর্থিক ক্ষতি এবং উদ্যমের ক্ষতি, উভয়ই বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

সুতরাং মহাবিশ্বের কর্মযজ্ঞের কয়েকটি নীতিকে যদি মানুষের কাছে প্রয়োগ করা যায়, তা হলে আকাশবাসীর বস্তুপুঞ্জের কিছুটা শৃংখলাও আমরা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। আমাদের সৌরপরিবার যেমন তার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় এবং অন্যান্য নক্ষত্রদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি ঐকতান বজায় রেখে চলেছে, ঠিক তেমনি এই আঞ্চলিক বিন্যাস পৃথিবীর বুকে অনুরূপ এক মিল সৃষ্টি করতে পারবে। ফরাসী দার্শনিক পাস্‌কাল একবার বলেছিলেন, "পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমরা স্বাভাবিক করে তুলতে পারিনা, আর স্বাভাবিক এমন কিছু নেই

যা আমরা নষ্ঠ করিনা।” পাস্কালের এই সিদ্ধান্তের পরিবর্তন কেবলমাত্র আমরাই করতে পারি। দরকার নেই আমাদের যাকে স্বাভাবিক করে সৃষ্টি করেছি তাকে ধ্বংস করবার।

কিন্তু কেমন করে সৃষ্টি করা যায় এই অঞ্চলগুলি? যুক্তরাষ্ট্রের সৃষ্টি তার একটি দৃষ্টান্ত। ইয়োরোপের বারোয়ারি বাজারের দেশগুলিতে যে ব্যবস্থার উন্নতি দেখা যাচ্ছে, সূচনার পক্ষে তা শুভ। চূড়ান্ত রাজনৈতিক ঐক্যের সঠিক ভূমিকা হ'ল বানিজ্যিক বোঝাপড়া। এই বারোয়ারী বাজারের উদ্যোগ সফল হয়ে অবশেষে রাজনৈতিক ঐক্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করুক, আমরা এই কামনাই করব।

সামরিক অঞ্চল সৃষ্টির ভবিষ্যত নিশ্চিত অন্ধকার। ইতিহাসে তার অসংখ্য নজির মিলবে। অনেক দেশ বিজেতাই নীতিগত বিন্যাস ব্যবস্থা আরোপ করেছিলেন। নেপোলিয়ন বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন ১৮১২ খৃষ্টাব্দে। মাত্র তিন বছরের স্বল্পপরিসরে সেই সাম্রাজ্য বহুধা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে হিটলারও অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখিয়ে গেছেন, তারও ঘটেছে একই পরিণাম।

বলা বাহুল্য, আঞ্চলিক বিন্যাসের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে প্রয়োজন বহু বছরের কঠিন পরিশ্রম। তথাপি এ পরিকল্পনার বীজ এখনই রোপন করা যেতে পারে এবং সযত্নে লালন করলে অনতিদূর ভবিষ্যতে ফলপ্রসূ মহীরুহে পরিণত হবে। পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাইন নদীর উপকূলবর্তী দুর্গগুলির অরাজকতাকে আজ আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি, এই ব্যাবস্থা চালু হলে পাঁচশ বছর পরের লোকেরাও আমাদের আজকের বিশৃংখলাকে সেই একই দৃষ্টিতে দেখবে। তখনকার এই দুর্গাধিপতিরা ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের সামন্ত প্রভু। তারা নিজেদের যতদূর সম্ভব দুর্ভেদ্য করে রাখতো এবং সমস্ত আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত থাকতো। আধুনিক যুগে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে পরিস্থিতি বর্তমান, তা মধ্যযুগের ইতিহাসকেই আবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

# উপসংহার

জীবজগতের সূত্রপাত হল সমুদ্রে নিহিত রাসায়নিক দ্রব্য থেকে। এই রাসায়নিক উপকরণ থেকেই কালক্রমে উদ্ভূত হয়েছে কূজন-মুখরিত বিহঙ্গ, বর্ণাঢ্য কুসুম কূল, মানবজাতি। সময়ের প্রবাহের সঙ্গে মানুষের উন্নতির ইতিহাস। উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে, কিন্তু মানুষের বিকাশের ধারা স্বতন্ত্র। জীবজগতের মতো কেবলমাত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুকূল উন্নতিই মানুষের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি, তার হৃদয় মন এবং ঐশী শক্তিরও ক্রমবিকাশ ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা সর্বদাই চেষ্টা করেছি নিরবছিন্ন অনুশীলনের সাহায্যে আমাদের অগ্রজদের অভিজ্ঞতালব্ধ অভিজ্ঞানকে কাজে লাগাতে। সঙ্গে রয়েছে মহাজগত সম্পর্কে মানুষের অদম্য কৌতুহল, অনন্ত প্রশ্ন। মাটির বুকের কঠিন প্রস্তরকেও অধ্যয়ন করেছে অসীম অভিনিবেশে। আপন প্রয়োজনে তার রূপান্তর এনেছে। তার অনুসন্ধিৎসা মাটির সীমানা ছাড়িয়েও পরিব্যপ্ত হোয়েছে আকাশের বুকে গ্যাসীয় বস্তুকে কেন্দ্র করে। তার অস্তিত্বকে গভীরতর ভাবে বুঝবার জন্যে সে অধ্যয়ন করছে নক্ষত্রের জগত, বস্তুর মূল।

হয়ত অনাগত আরও হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ইতিহাস রচিত হবে পৃথিবীর বুকে। অন্য কোনো নক্ষত্রের সঙ্গে পৃথিবীর কোনো সংঘর্ষ হবে না এই ইতিহাসকে ধ্বংস করে দিতে। মানুষের জীবন স্তব্ধ ক'রে দেবে না কোনো হিম শীতল স্পর্শ কিংবা দূষিত বায়ুর করাল গ্রাস। নিজের মধ্যেই রয়েছে তার বিপদ।

পৃথিবীর বুকে সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ মানুষের সংগে শত্রুতাচরণ করে এসেছে। ডারউইনের "ক্রমবিবর্তনবাদ" অনুযায়ী সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত অতি ধীরে কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভাবে উন্নতির ধারা চলছে। অতীতে মানুষ প্রাকৃতিক শত্রুর বিরুদ্ধে আপনাকে রক্ষা করেছে। প্রচণ্ড তাপ প্রবাহ থেকে হিম প্রবাহের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। অবস্থাবৈষম্যের সংগে মানিয়ে চলার প্রয়োজনীয়তা তার বুদ্ধিকে, তার চিন্তা শক্তিকে বিকাশও করেছে। অধিকতর বিচক্ষনতার পরিচয় দিয়ে, সুষ্ঠুতর ভাবে কাজ নিষ্পন্ন করবার চেষ্টায় মানুষ চিরকালই নিরলস থেকেছে। এই দিক দিয়েই মানুষ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য প্রাণী জগত থেকে স্বতন্ত্র। কালের অগ্রগতির তালে তালে, মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিকতারও ক্রমবিকাশ ঘটেছে।

পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সংগে মানিয়ে চলতে শিখে মানুষ অতীতে নিজেকে রক্ষা করেছে। অধুনাকালে সে মহাজগত সম্পর্কে, মানব জাতি সম্পর্কে অনেক বেশী জেনেছে। সে আজ জানে অন্যান্য অধিকাংশ জীবের মতই মানুষ আজ পরস্পরের সঙ্গে একত্রে চলতে পারে। কিন্তু মানুষের এই যাত্রাকে সম্ভব করতে হলে নতুন যুগের মানুষের মনে এক নতুন বনিয়াদ গড়ে তুলতেই হবে। আমাদের অনুজাতকদের যদি শান্তি এবং সুখের অনুকূল মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হয়, তবে স্কুলে, কলেজে, গীর্জ্জায়, মন্দিরে, আপন গৃহ কোণে এই ভিত্তি আমাদের নিজেদেরই রচনা করতে হবে। ঘৃণা, স্বার্থপরতা এবং লোভের জায়গায় আনতে হবে প্রেম, দয়া এবং সংবেদনশীলতা। ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান। মানুষের প্রতি ভালবাসা ছাড়া এলক্ষ্যে উপনীত হওয়া যাবে না। বিশ্বজগত ও সময়, জড় ও শক্তি স্বতস্ফূর্তভাবে আমাদের এই লক্ষ্যে পেঁাছে দেবে না। কিন্তু আমাদের যাত্রাপথে নির্দেশক হবে এদের সম্যক জ্ঞান। প্রকৃতির নিয়মই হলো ঈশ্বরের বিধান। এই নিয়ম পৃথিবীতে আমাদের শান্তিতে বসবাস করতেই শিক্ষা দেয়, যে শান্তিতে আকাশচারী বস্তুপুঞ্জ বিরাজ করছে মহাজগতে।

আদিম মানুষ ছিল অবস্থার দাস। নির্ম্মম প্রকৃতি তার প্রত্যেক পদক্ষেপকে কঠিন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে। প্রকৃতি, পশু এবং তার সহযাত্রী মানুষ যারা তারই মত অবস্থার দাসত্ব করতে বাধ্য ছিল, তারা সকলে প্রতিনিয়তই তাকে বিব্রত করেছে। তখন তার প্রধান কাজ ছিল আহার এবং আশ্রয় যোগাড় করা। এরই জন্যে তাকে নিয়ত লড়াই করতে হ'য়েছে হত্যাও করতে হ'য়েছে। জীবন সংগ্রামই ছিল তার দৈনন্দিন কাজ।

ভূ-ত্বকে যে অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য দেখতে পাওয়া যায় মানব দেহ প্রায় সেই সব উপাদানেই তৈরী। সেই মানুষই আজ বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে তার থেকে কাজ আদায় করতে শিখেছে প্রকৃতির অনেক রহস্যকেই সে উদ্‌ঘাটন করতে সমর্থ হ'য়েছে নক্ষত্র এবং ছায়াপথের ইতিবৃত্তের আভাস পেয়েছে। পৃথিবীতে মৌলিক রাসায়ণিক উপাদান আবিষ্কার করে মানুষ তাদের বৈশিষ্ট্যের একটা তালিকা প্রস্তুত করেছে। সে জানে কেমন ক'রে ধাতু পরিশোধন করতে হয়, কেমন ক'রে সেই ধাতুর সাহায্যে ছোট এবং বড় যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হয়। একই সংগে জীরাসুম্হিত জ্বালানী শক্তিও আবিষ্কার করেছে মানুষ। এই জ্বালানীকে সে কাজে লাগিয়েছে জল থেকে বাষ্প তৈরী করতে। এই বাষ্প থেকে শক্তি উৎপাদন ক'রে সে আজ তার কাজকে সহজতর করেছে। দূরের লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত করবার মত অস্ত্রও সে তৈরী করতে শিখেছে। সে জানে কেমন করে আকাশে যন্ত্রপাতি নিয়ে যাওয়া যায়। জলের নীচে বিচরন করবার উপযোগী ডুবো জাহাজ প্রস্তুত করেছে। সম্প্রতি মানুষ কৃত্রিম উপগ্রহ তৈরী করেছে, যা চাঁদের মত পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করে। এখন সে অন্য গ্রহে পেঁাছবার জন্যে চেষ্টা করছে। তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরনের জ্ঞানকে যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজে লাগিয়েছে। পরমানুথেকেও শক্তি উৎপাদন করতে শিখছে। এটা নিশ্চিত যে এই মানুষই যদি ঘৃণার বদলে ভালবাসতে পারে, তবে পৃথিবীতে একসঙ্গে শান্তিতে এবং স্বচ্ছন্দে বসবাস করবার উপায়ও সে খুঁজে পাবে। ভ্রাতৃপ্রতিম প্রতিবেশীকে তখন আর শত্রু ব'লে ভাববার দরকার হবে না।

কীভাবে মহাজগতের সৃষ্টি হলো, কোন্ নিয়মেই বা পরিচালিত হচ্ছে এই জগত, এসব প্রশ্নের জবাব আমরা জন্মসূত্রে লাভ করিনি। বরং বহুশতাব্দী ধ'রে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষী এবং বিজ্ঞানী পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে এই চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। ধীসম্পন্ন এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী এইসব চিন্তানায়কেরা জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে তাঁদের জীবন নিয়োজিত করেছিলেন। আজ আমরা কেবলমাত্র উত্তরাধিকারের জোরে সেই মহাঐশ্বর্য্য বিনামূল্যে লাভ করেছি।

যাঁদের কাছে আমাদের এই অমূল্য ঋণ, কী তাঁদের পরিচয়? তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে কোন্ কোন্ যুগে? কী ছিল তাঁদের প্রকৃতি? মহাজগত সম্পর্কে বর্তমান ধারণার পিছনে কী কী অবদান রয়েছে তাঁদের প্রত্যেকের? চিন্তানায়কদের জীবন সম্পর্কে এসব কৌতুহল খুবই স্বাভাবিক।

এই সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে ঐসব প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। বহুশতাব্দী ধ'রে বিজ্ঞানের যে জয়যাত্রা চলেছে, তার মহাদিক্চক্রবালে চিন্তানায়কদের আভাস পেতে গেলে এই প্রয়াস যথেষ্ট ব'লে মনে হয়। যুগ যুগ ধ'রে ধীরে ধীরে বহু আয়াসে জগত সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান কীভাবে বিকাশ লাভ করেছে, এই সব বিজ্ঞানীদের জীবন আলেখ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তার জবাব মিলবে।

ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, কলা, সংগীত প্রভৃতি নানাদিকে এমন অনেক ক্ষণজন্মা পুরুষ আছেন, আমাদের বর্তমান সভ্যতায় যাঁদের অবদান অপরিসীম। বর্তমান পরিচ্ছেদে তাঁদের সকলের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। যন্ত্রবিদ্ হিসাবে যাঁদের কীর্তির সংগে লেখকের সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেছে, সেই সব কীর্তিমান বিজ্ঞানী ও দার্শনিকদের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

শ্রেষ্ঠ মনীষীদের জীবনধারার যে আলেখ্য আমরা এখানে রচনা করতে বসেছি, তার প্রথম চিত্রটি দু'হাজার বছরের বেশি প্রাচীন। তিনি হচ্ছেন থেল্স্, খৃষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্বে যাঁর জন্ম, জগতের 'প্রথম দার্শনিক' হিসাবে যাঁর পরিচয়।
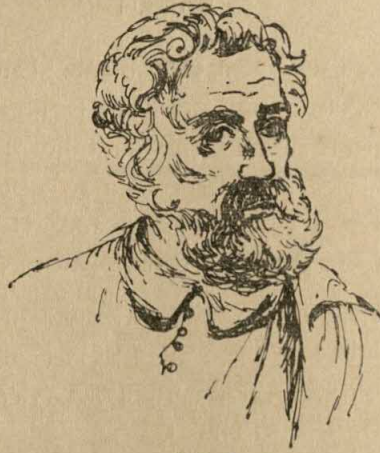
থেল্‌স্‌ (Thales)

এশিয়া মাইনরের একটি শহরের নাম মিলেটাস। সেখানকার অধিবাসী ছিলেন থেল্‌স্‌। প্রাচীন গ্রীসের যে ক'জন দার্শনিক বিজ্ঞানীর নাম আজও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে, থেল্‌স্‌ তাঁদের অন্যতম। তাঁর সঠিক জন্মকাল আজও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। কিন্তু তিনি যে খৃষ্টজন্মের দু'শো থেকে পাঁচশো বছর আগের লোক ছিলেন, তাতে কোনো সংশয় নেই। তাঁর পারিবারিক পরিচয় কিংবা তাঁর শিক্ষাদীক্ষার কোনো সঠিক তথ্য পাওয়া যায়নি। গ্রহ নক্ষত্র ও জ্যামিতিশাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। গ্রহণ সম্পর্কে প্রথম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের কৃতিত্ব তাঁরই। তাঁর মতে, অতীতে যখন সব গ্রহনই নির্দিষ্ট সময় অন্তর ঘটেছে, ভবিষ্যতেও নির্দিষ্ট সময় অন্তরই ঘটতে থাকবে। বিজ্ঞজনেরা থেল্‌স্‌কেই জগতের প্রথম বৈজ্ঞানিক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। স্থির তড়িৎ আবিস্কারের কৃতিত্বও তাঁরই। অ্যাম্বার নামক বস্তুকে রেশম দিয়ে ঘষে তিনি তড়িৎ উৎপাদন করেন। এই তড়িৎ টুকরো টুকরো কাগজের মতো হালকা বস্তুকে আকর্ষণ করতে পারে।

---

পিথাগোরাস (Pythagoras)

প্রাচীনকালের গণিতবিদ্‌দের অন্যতম ছিলেন পিথাগোরাস। তাঁর মতে

পৃথিবী এবং বিশ্বজগত গোলাকার। এবং এদের উভয়েরই নিজস্ব গতি আছে। খৃষ্টজন্মের ৫৮২ বছর আগে গ্রীসদেশে পিথাগোরাসের জন্ম। ইতালির দক্ষিণাঞ্চলে তিনি ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের একটি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি আত্মার নবকলেবর ধারণে (Transmigration) বিশ্বাস করতেন। এবং সে কারণে তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিরামিষাশী ছিলেন। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন, সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের বর্গ অপর দুই বাহুর বর্গের সমষ্টির সমান।

---

ইউক্লিড (Euclid)

জ্যামিতিশাস্ত্রের জনক হিসাবে এঁর সর্মাধক পরিচয়। আলেকজান্দ্রিয়া নগরী ছিল এই গ্রীসদেশীয় গণিতবিদের জন্মভূমি। খৃষ্টপূর্ব আনুমানিক তৃতীয় শতকে এঁর জন্ম। তিনি নিজে যেমন একজন শিক্ষক ছিলেন, সেই সংগে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যামিতি এবং সুসম কঠিন বস্তু সংক্রান্ত নানা ধরণের চিত্তাকর্ষক উপপাদ্য ছিল তাঁর মূল্যবান্ গবেষণার বিষয়বস্তু। থেল্স্, পিথাগোরাস্, প্লেটো এবং অন্যান্য অনেক প্রাচীন চিন্তানায়কের গবেষণার বিষয়গুলি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। সমস্ত জ্ঞাত উপাত্ত এবং ঘটনাগুলিকে একত্রিত করাই ছিল তাঁর মহত্তম অবদান। সংগৃহীত বিষয়গুলি তিনি এমন রীতিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, সেগুলি জ্যামিতি এবং গণিত-শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের পথে যুগে যুগে নানা নতুন ধারণার পথ ক'রে দিচ্ছে। বিশেষ ক'রে জ্যামিতিবিষয়ক গবেষণার কাজেই ইউক্লিডের সর্মাধক প্রতিষ্ঠা। প্রায় দু'হাজার বছর থেকে সুরু ক'রে আজও পর্যন্ত ইউক্লিড প্রতিষ্ঠিত সৃষ্টিকর্ম কার্য্যক্ষেত্রে সাক্ষাৎভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বহু প্রাচীন কালেই জ্যামিতি-শাস্ত্রটির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি বলতেন: 'যে ব্যক্তি জ্যামিতি জানেনা, আমি তার সংগে পরিচয় রাখিনা।' পরবর্তীকালে, আব্রাহাম লিঙ্কনও জ্যামিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সমপরিমাণ নিঃসংশয় ছিলেন। তিনি চল্লিশ বছর বয়সে

জ্যামিতি অধ্যয়ন করতে সুরু করেছিলেন চিন্তাকে যুক্তিবদ্ধ করবার রীতি আয়ত্ব করতে,—গণিতশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের উদ্দেশে নয়। বলবিদ্যা, শব্দবিজ্ঞান, আলোকবিজ্ঞান, পরমাণুবিজ্ঞান, জীববিদ্যা এবং কারিগরী বিদ্যার অধিকাংশ শাখাই ইউক্লিডের জ্যামিতির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল।

---

**ডিমোক্রিটাস (Democritus)**

ডিমোক্রিটাস ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ ও দার্শনিক। মহাশূন্য ও পরমাণু সম্পর্কে তিনি যে চিন্তাধারার উদ্ভাবন করেছেন, সেগুলিই তাঁকে খ্যাতির শিখরে তুলে দিয়েছিল। প্রাচীন গ্রীসের থ্রেস প্রদেশের অন্তর্গত ক্ষুদ্র শহর আবদেরায় তাঁর জন্ম খৃষ্টপূর্ব ৪৬৫ অব্দে। তিনি ছিলেন সক্রেটিসের (Socrates) সমসাময়িক। উত্তরাধিকার-সূত্রে অগাধ সম্পত্তি তাঁর করায়ত্ত ছিল। ফলে, তথ্যের অনুসন্ধানে বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে পর্যটন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তিনি বহুকাল মিশর দেশে বাস করেন। সেখানকার প্রাচীন বিদ্যালয়গুলিতে তিনি পদার্থবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ডিমোক্রিটাসের সৃষ্টিকর্ম প্লেটোর সমতুল্য ব'লে পরিগণিত হয়।

মানবদেহের গঠন প্রণালী সম্পর্কে ডিমোক্রিটাসের বিশদ জ্ঞান ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, মানবদেহের যেটি মহত্তম অংশ, সেটি হচ্ছে আত্মা। আত্মাকেও তিনি বস্তু হিসাবে গণ্য করতেন। তিনি মনে করতেন, মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি আর কিছুই নয়, বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ায় আত্মারই কতকগুলি পরিবর্তিত রূপ। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে রং-এর ব্যাখ্যা দিয়ে গেছেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং স্বরূপ হচ্ছে অগ্নিগোলকের তুল্য।

তিনি মনে করতেন, মহাশূন্য অসীম। এই অসীম শূন্যে অসংখ্য পরমাণু চলমান। পরমাণুগুলি চিরন্তন ও অপরিদৃশ্য। বিশ্বের ক্ষুদ্রতম বস্তু এরাই এবং

এদের আয়তন আর হ্রাস করা যায় না। নিশ্ছিদ্র এই বস্তুকণাগুলি তাদের অধিকৃত সমস্ত স্থান সম্পূর্ণরূপে দখল ক'রে আছে। প্রকৃতিগতভাবে কোনো বস্তু উষ্ণ বা শীতল, মধুর বা কষায়, কঠিন বা কোমল হয় না। বাস্তবজগতে মাত্র দু'টি জিনিসেরই অস্তিত্ব আছে, একটি পরমাণু এবং অপরটি শূন্য। তাঁর ধারণা ছিল, অনন্ত শূন্য জুড়ে যে অসংখ্য পরমাণু পরিব্যাপ্ত রয়েছে, তারা ক্রমাগতই নিচের দিকে পরিচালিত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত বড়ো মাপের পরমাণুগুলি সবেগে পতিত হ'য়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুকে অতিক্রম করে এবং তাদের সংগে অনবরত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফলে, নানাধরণের পার্শ্ব ও বিপরীত গতির সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে উদ্ভব হয় ঘূর্ণীচক্রের। এই ঘূর্ণীচক্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু একত্রিত হ'য়ে বৃহৎবস্তু ও জগতের সৃষ্টি করেছে। সমস্ত জগতের সৃষ্টিও বিনাশের সকলস্তরেই রয়েছে এই পরমাণুদের অস্তিত্ব। পৃথিবীতে এ ডিমোক্রিটাসই প্রথম চিন্তা নায়ক, যিনি পরমাণুর গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে চিন্তা ক'রে গেছেন। তাঁর মতে, পরমাণু এমনই একটি বস্তু যাকে ভেঙে আর ছোট করা যায় না। তিনি বলেন, প্রকৃতিদেবী পরমাণুদের সহায়তায় ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ—এই চতুর্মৌলিকের সৃষ্টি করেন। পরমানু অবিণশ্বর এবং এর কঠিনতা অভেদ্য। এরা অসংনম্য (Incompressible) এবং চিরকাল সর্বঅবস্থায় এরা অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে। ডিমোক্রিটাসের মত অনুসারে, পৃথিবীতে নানা প্রকার পরমাণুর অস্তিত্ব আছে,—কতকগুলি ছোট ছোট মসৃন গোলকের মতো আকৃতিবিশিষ্ট, কতকগুলি তীক্ষ্ণধার ঘনকের মতো, কতকগুলি আবার অসম আকার এবং অমসৃন তল বিশিষ্ট। কতকগুলি অমসৃন পরমাণুকে একত্রিত করলে তারা পরস্পরের সংগে যুক্ত হয় এবং সে-অবস্থায় তাদের বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোনো কোনো পরমাণু মসৃন এবং লঘু। তারা স্বচ্ছন্দে ভাসমান অবস্থায় চতুর্দিককে বিচরণ করে। ডিমোক্রিটাসের পরমাণু সংক্রান্ত গবেষণাবলী আজ আর নেই। তাঁর রচনা সম্ভারও বিনষ্ট। তাঁর শিক্ষাবলীর মাত্র কয়েকটি অংশ শতাব্দী পার হয়ে চলে এসেছে। বিদ্বজ্জনসমাজ বহুকাল ধরে তাঁর পরমাণবিক তত্ত্ব বিস্মৃত থেকেছে। এই বিস্মৃতির যে কারণ, সেটি হলো আরিষ্টটলের আবির্ভাব।

---
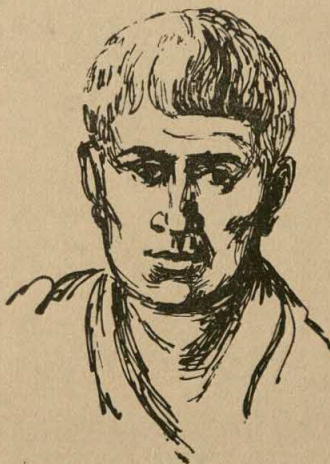
**আরিষ্টট্‌ল্ (Aristotle)**

আরিষ্টট্‌ল্ ছিলেন প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক। খৃষ্টপূর্বে ৩৮৪ অব্দে তাঁর জন্ম। তিনি চারশো থেকে হাজারের মতো গ্রন্থ রচনা ক'রে গেছেন।

সামুদ্রিক ও স্থলদেশ সম্পর্কিত জীবনধারনের বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। জীববিদ্যা ও প্রাণীবিদ্যায় তাঁর মূল্যবান্ অবদান আছে। প্রায় পনেরোশো বছর পর আলবার্টাস ম্যাগনাস (Albertus Magnus) আরিষ্টটলের কীর্তির পুণরুদ্ধার করেন। আরিষ্টট্ল্ পরমাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি যে মৌলিক উপাদানে বিশ্বাস করতেন, সেগুলি দৃষ্টিগোচর ও স্পর্শগ্রাহ্য। তাঁর মতে, বস্তুর ধর্ম চারপ্রকার,—উষ্ণ, শীতল, আর্দ্র এবং শুষ্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, মাটি হলো শুষ্ক ও শীতল, জল আর্দ্র ও শীতল, বায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং আগুন উষ্ণ ও শুষ্ক। উষ্ণতা, শীতলতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা যেমন বস্তুর ধর্ম, তেমনই মাটি, জল, বায়ু ও আগুন বস্তুর চার অবস্থা। জাগতিক এই ব্যাখ্যা একদিকে যেমন সরল, অপরদিকে তেমনই চিত্তগ্রাহী। এগুলি হৃদয়ঙ্গম করবার জন্যে ডিমাক্রিটাসের পরমাণুতত্ত্বের মতো কোনো অতীন্দ্রিয় ধারণার প্রয়োজন হয় না। আরিষ্টট্ল্ বস্তুকে তার স্বরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুর প্রকৃতি চোখ দিয়ে দেখা যায়, হাত দিয়ে স্পর্শও করা যায়। জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, উদ্ভিদের উপর সঞ্চিত শিশিরকণা থেকে পরগাছা কীট এবং গলিত বস্তু থেকে উপমক্ষিকার জন্ম। তিনি এ-ও মনে করতেন যে, পতনশীল বস্তুর গতিবেগ তার ওজনের সমানুপাতিক। পতনশীল বস্তু সংক্রান্ত গ্যালিলিওর বিখ্যাত পরীক্ষার আগে পর্যন্ত মানুষ এই মতকেই সত্য ব'লে স্বীকার করে নিয়েছিল। আরিষ্টট্ল্ ছিলেন তাঁর পরবর্তী জগতচিন্তার আদি রূপকার। তাঁর ধ্যান-ধারণাই কমবেশি দু'হাজার বছর ধ'রে মানুষের চিন্তাকে পরিচালিত করেছে। আরিষ্টট্লের আবির্ভাবের পর ডিমাক্রিটাস এবং তার পরমাণু-তত্ত্ব বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

---

আর্কিমিদিস (Archimedes)

পদার্থবিদের চোখে আর্কিমিদিস ছিলেন গণিতশাস্ত্রবিদ্, দার্শনিক এবং আপেক্ষিকগুরুত্ব তত্ত্বের স্রষ্টা। খৃষ্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে সিসিলীর এক গ্রীক পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ফাইদিয়াস (Pheidias)

ছিলেন জ্যোতির্বিদ্। পারিপার্শ্বিক্ ঘটনাবলীর দর্শক হিসাবে আর্কিমিদসের মতো সমজদার আর দেখা যায় না। পৃথিবীপৃষ্ঠে যা কিছু দৃশ্যমান, সেগুলি বুঝবার জন্যে তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। সবসময়ই তিনি নতুন নতুন আবিষ্কারের উন্মাদনায় থাকতেন। সে কালে আলেকজান্দ্রিয়া ছিল উচ্চতর শিক্ষার পীঠস্থান। আর্কিমিদসেরও শিক্ষালাভ ঘটে আলেকজান্দ্রিয়ায়। গণিতশাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। এছাড়া তিনি ইউক্লিডের অনুরাগী ও অনুবর্তী ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে একটি গল্প শোনা যায়ঃ—একদিন জলাধারে অবগাহণ করতে নেমে তিনি লক্ষ্য করলেন, জলের উপরিতল ক্রমশ পাত্রের উপরদিকে উঠে আসছে। যতই তিনি নিজেকে নিমজ্জিত করেন, ততই বেশি পরিমানে জল উপর দিকে ওঠে। এই ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তিনি অসম অপকৃতির বস্তুর ঘনত্ব পরিমাপ করবার উপায় উদ্ভাবন করেন। তাছাড়া, তিনি ছিলেন 'আপেক্ষিক গুরুত্ব' তত্ত্বের আবিষ্কর্তা।

নিচুতল থেকে জলকে উচুঁতলে উন্নীত করবার জন্যে আর্কিমিদস একটি যন্ত্র আবিস্কার করেন। লিভার (Lever) ও পুলি'র (Pulley) সম্পর্কিত সূত্রাবলীও তাঁরই আবিষ্কার। আধুনিক রাডার শুঙ্গকের (Radar antenna) অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট কুণ্ডলী (Spiral) নামে পরিচিত একটি জ্যামিতিক আকারও তাঁরই উদ্ভাবনা প্রসূত। শোনা যায়, তিনি একবার প্রতিফলক দর্পনের সাহায্যে দূরস্থিত রোমক জাহাজে অগ্নিসংযোগ করেছিলেন। আর্কিমিদসের সমসাময়িককালে, বিজ্ঞান ও গণিতবিষয়ে তাঁর মতো প্রতিভাধর আর কেউ ছিল না বললেই চলে। ঘটমান কোনো ঘটনা দেখা, তাকে হৃদয়ঙ্গম করা, এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যের সাহায্যে নতুন ধারণা সৃষ্টি করবার যে বৈজ্ঞানিকসুলভ ক্ষমতা, আর্কিমিদসের তা ছিল এবং তিনি তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারতেন। অন্যান্য অনেক বৈজ্ঞানিকের মতো তিনিও স্বীয় প্রতিভাকে যুদ্ধের প্রয়োজনে নিয়োজিত করেছিলেন।

---
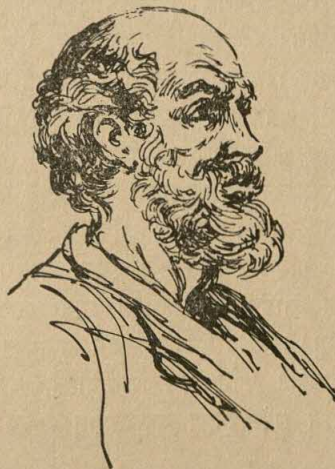
**হিপোক্রাতেস্ (Hippocrates)**

প্রাচীন গ্রীসের এই চিকিৎসক 'ভেষজবিদ্যার জনক' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় গ্রীসদেশে, খৃষ্টপূর্ব ৪৬০ থেকে ৩৭৭ সাল

পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সামান্যই জানা গেছে। এমনকি, অনেকের মতে, হিপোক্রাতেস্ নামে সেযুগে কেউ ছিলেন না; তাঁর ভেষজতত্বগুলি তৎকালীন অন্যান্য বহুলোকের সৃষ্টি। কিন্তু, প্লেটোর রচনায় ব্যক্তি হিসাবে হিপোক্রাতেসের উল্লেখ আছে। হিপোক্রাতেসের আগে শাস্ত্র হিসাবে ভেষজবিজ্ঞানের কোনো স্বীকৃতি ছিল না, রোগনিরাময়ের জন্যে লোকে দেবতা ও পুরোহিতের কৃপার উপর নির্ভর করতো। হিপোক্রাতেসই প্রথম এই কুসংস্কার দূর করবার জন্য সচেষ্ট হন। তৎকালীন পারস্য নৃপতি মহামারীর করাল গ্রাস থেকে সৈন্যদের জীবন রক্ষা করবার জন্যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে হিপোক্রাতেসের সাহার্য্য ভিক্ষা করেছিলেন। তখন গ্রীসের সংগে পারস্যের যুদ্ধ চলছিল, তাই তাঁর প্রার্থনা না মঞ্জুর হয়ে যায়। জনগণের জীবনে হিপোক্রাতেসের শিক্ষা এমন গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ভেষজবিজ্ঞানে নতুন নতুন আবিষ্কারগুলি মানুষকে বিশেষ আকর্ষণ করতে পারতো না। ফলে, পরবর্তী একশো বছর ধ'রে এই বিষয়ে বিশেষ কোনো অগ্রগতি ঘটেনি। উত্তর কালে গ্যালেন নামে জনৈক চিকিৎসক হিপোক্রাতেসের দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। গ্যালেন বলতেন, বিজ্ঞানের অগ্রগতির জন্যে উত্তরসাধক বিজ্ঞানীর সবসময়ই পূর্বসূরীর বক্তব্য পুনর্বিবেচনা ক'রে দেখা উচিৎ।

সেকালে শল্য চিকিৎসা ছিল নাপিতের ব্যবসার অন্তর্গত। তারা উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের রক্তক্ষরণ ক'রে দিত। দন্তচিকিৎসা করতে গিয়ে, তারা সজোরে দাঁত টেনে উপড়ে ফেলতো। এইসব দেখে শুনে, শল্যচিকিৎসকদের উদ্দেশ্য ক'রে হিপোক্রাতেস একটি শপথের বাণী রচনা করেন। মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসাব্যবসায় গ্রহণ করতে তিনিই মানুষকে শিখিয়ে গেছেন। তাঁর শপথবাণীর বিষয় ছিল চিকিৎসক এবং রোগীদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারক কতকগুলি আচরণবিধি। তাঁর মতে, চিকিৎসকেরা সর্বপ্রযত্নে রোগীদের নিরীক্ষণ ক'রে রোগের উপলক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। রোগীনিরীক্ষণের জন্যেও তিনি কতকগুলি পদ্ধতির নির্দেশ ক'রে গেছেন। তিনি চিকিৎসকদের উদ্দেশে রোগীর চোখ ও ত্বক্, দেহের উত্তাপ, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়ার দ্রুততা এবং ক্ষুধার অবস্থা সতর্কভাবে লক্ষ্য করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে তিনি শল্যচিকিৎসার আশ্রয় নিতেন। বিচ্ছিন্ন অস্থিগ্রন্থি ও ভগ্নাস্থির চিকিৎসাও তিনি করতেন। মস্তিষ্কের টিউমার হ'লে বর্তমানে যেমন রোগীর মাথায় অস্ত্রোপচার করা হয়, হিপোক্রাতেসও অনুরূপ অস্ত্রোপচারে অভ্যস্ত ছিলেন। সেকালে শল্যচিকিৎসায় বীজবারক ব্যবহারের প্রচলন ছিল না। হিপোক্রাতেস ক্ষতস্থানে আলকাতরা ব্যবহারের পরামর্শ দিতেন। ঋতু ও জলবায়ুর পরিবর্তনের সংগে নানা রোগের যোগাযোগ আছে, এ তথ্য তার অজ্ঞাত ছিল না। তিনি মনে করতেন, কৃশকায় লোকেরা স্থূলকায়দের তুলনায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। তাঁর মত অনুযায়ী, যুবকের তুলনায় বৃদ্ধের স্বল্পাহার প্রয়োজন। তিনি গ্রীষ্মকালে স্বল্পাহার ও শীতকালে গুরুভোজনের পরামর্শ দিতেন।

**গ্যালেন (Galen)**

প্রাচীন গ্রীসের একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন গ্যালেন। খৃষ্টজন্মের ১২৯ বছর আগে এশিয়ামাইনরের এক গ্রীক পরিবারে তাঁর জন্ম। সতেরো বছর বয়সে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে মনস্থ করেন। গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা, সংগীত ও বিভিন্ন ভাষায় প্রভূত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানে। চিকিৎসক হিসাবে তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। পৃথিবীতে শরীরবিদ্যার প্রথম ছাত্র হিসাবে তাঁকেই গণ্য করা হয়। শবদেহ ব্যবচ্ছেদ ক'রে মানবশরীরের অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করতে তিনি অপরিসীম আনন্দ পেতেন। কিন্তু, শব-ব্যবচ্ছেদের কাজে তৎকালীন সরকারের অনুমোদন ছিল না। তাই ইতর প্রাণীর শরীরিক গঠন প্রণালী সম্পর্কে তিনি অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। এর পর তিনি হৃদ্‌যন্ত্রে অস্ত্রোপচারের কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি জানতেন, হৃদ্‌যন্ত্রই শরীরে রক্তচালনা করে। তিনি বিভিন্ন ধমনী ও পত্রমারফৎ রক্তচলাচলের বর্ণনা দিয়ে গেছেন। শরীরের পেশী এবং বিভিন্ন কপাটকের বর্ণনাও তাঁর রচনার মধ্যে পাওয়া গেছে। নীর্ভতন্ত্র সম্পর্কে তিনি যে জ্ঞান আহরণ করেন, তা আধুনিক যুগে অর্জিত জ্ঞানের থেকে বেশি দূরে নয়। শারীরিক অবস্থার সংগে নাড়ী-স্পন্দনের দ্রুততার যে বিশেষ সম্পর্ক আছে, এ তথ্যও তাঁর অজ্ঞাত ছিল না। মেনডেলের (Mendel) জনিতত্ত্বের আভাস তিনি বহুকাল আগেই দিয়ে গেছেন। শিশুদের সংগে মাতাপিতার তুলনায় মাতামহ-পিতামহের ঘনিষ্ঠতর মিল লক্ষ্য ক'রেই তিনি উপরোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পেরেছিলেন। নিজে পরীক্ষা ক'রে সন্তুষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত কোনোকিছুই তিনি বিশ্বাসযোগ্য ব'লে মনে করতেন না। উত্তরসূরীদের জন্যে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় অগ্রগতির পটভূমিকা রচনা ক'রে যান। তাঁর বহু রচনা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। অবশ্য, তাঁর গ্রন্থে নানাধরণের ত্রুটি রয়েছে। মধ্যবর্তী যুগের চিকিৎসক ও গবেষকেরা এই ত্রুটিপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিও সঠিক ব'লে মেনে নিয়েছিলেন।

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)

ইনি ছিলেন সর্বযুগের ক্ষণজন্মা পুরুষদের অন্যতম। বিজ্ঞানের সকল শাখায় এবং বিশেষ ক'রে চারুশিল্পে তাঁর তুলনা নেই। ১৪৫২ খৃষ্টাব্দে এক ইতালীয় পরিবারে তাঁর জন্ম। একাধারে তিনি ছিলেন চিত্রকর, ভাস্কর, স্থপতি, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিল্প-সমালোচক। 'লাষ্ট সাপার' এবং 'মোনালিসা'র চিত্রকর হিসাবে তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাছাড়া, তিনি ছিলেন উদ্ভাবক, বাস্তুকার, জ্যোতির্বিদ্, ভূতাত্ত্বিক, ও শরীরবিদ্। এবং সকলক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। ষোলো বছর বয়সেই তিনি একজন নামজাদা কারুশিল্পী হিসাবে পরিগণিত হন। কাঠ, মার্বেল পাথর এবং নানাধরণের ধাতুর কাজে তাঁর জুড়ি ছিল না। স্বদেশের যুদ্ধের যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামের পরিকল্পনার ভার তাঁরই উপর ছিল। উত্তরকালে তিনি নগর পরিকল্পক নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেযুগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নক্সাগুলির পরিকল্পনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। শারীরতত্ত্বে আগ্রহশীল ছিলেন ব'লে মানবশরীরের কাঠামোর অনেক নক্সাও তিনি রচনা ক'রে গেছেন। ডুবো জাহাজ তৈরির পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। পরবর্তী কালে এক অতুলনীয় চিত্রশিল্পী হিসাবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন। শিল্পজগতে র‍্যাফেল ও মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর মতো তিনিও ছিলেন যুগোত্তর। তিনি বায়ুবেগ-পরিমাপক-যন্ত্র, ঘন্টামিনিট-নির্দেশক ঘড়ি, রোলারের অক্ষনাভি (Roller bearing) এবং জলোত্তলক পাম্পের পরিকল্পনাও রচনা ক'রে গেছেন। এমন কি, মাছের আকার পর্যবেক্ষণ ক'রে তিনি 'Streamline' জাহাজের নক্সা প্রস্তুত করেন। জলসেচন এবং নৌবাহন সমস্যা নিয়েও তিনি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন এবং নদীকে ভিন্নমুখে চালিত করবার জন্যে তিনি বিরাট বাঁধেরও আয়োজন করেন। এছাড়াও, ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে বিরাট পাখা সমন্বিত উড়োজাহাজের পরিকল্পনা ক'রে তিনি মাটির বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত ক'রে গেছেন। এমনকি শরীরবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাঁর মস্তিষ্ক ছিল সমান ক্রিয়াশীল। মানুষের করোটির নির্ভুল নক্সাও তিনি প্রস্তুত ক'রে গেছেন। হৃদ্যন্ত্রের যে নক্সাটি তিনি রচনা করেছেন, সেটি যেমন নির্ভুল, তেমনই বাস্তব।

**নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolaus Copernicus)**

লিওনার্দোর পর বিজ্ঞানজগতে সর্বাগ্রে যে দিক্‌পালের নামোল্লেখ প্রয়োজন, তিনি নিকোলাস কোপার্নিকাস। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিদ, গণিতজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, পুরোহিত এবং রাজনীতিজ্ঞ। এবং সকল ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দেন। ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত তোরিন সহরে তাঁর জন্ম। অন্যান্য গ্রহের মতো সূর্য্যও গতিশীল কিনা, এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাবার জন্যে তাঁর গবেষণার অন্ত ছিল না। তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস ছিল, পৃথিবী স্থির এবং অন্যান্য আকাশচারী বস্তুরা পৃথিবীকে কেন্দ্র ক'রে প্রদক্ষিণ করছে। (১৫০ খৃষ্টাব্দে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গ্রহগুলির ভবিষ্যৎ অবস্থান সম্পর্কে গণনা ক'রে মিশরীয় জ্যোতির্বিদ্ টলেমি (Ptolemy) খুবই সন্তোষজনক ফল পেয়েছিলেন।) কোপার্নিকাসের মতে, সূর্য্যের অবস্থান স্থির এবং তাকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী এবং গ্রহগুলি আবর্তন করছে। সূর্য্যই আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত, এই মৌলিক সত্যের আবিষ্কর্তা হিসাবেই কোপার্নিকাসের খ্যাতি।

দশবছর বয়সে কোপার্নিকাসের পিতৃবিয়োগ হয়। তিনি পিতৃব্যের দত্তক পুত্র রূপে পালিত হন। তাঁর পিতৃব্য ছিলেন পুরোহিত। তাই কোপার্নিকাস নিজেও পুরোহিতের পেশা গ্রহণ করতে মনস্থ করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি পোল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় ক্র্যাকোতে (Cracow) ভর্তি হন। সেখানে তাঁর অধ্যয়নের বিষয় ছিল দর্শন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জ্যামিতি এবং ভূগোল। কোপার্নিকাসের বয়স যখন উনিশ বছর, সে সময়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন। আইনশাস্ত্র পড়বার জন্যে তিনি ইতালি যান এবং সেখান থেকে 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী লাভ করেন। এর পর পোল্যাণ্ডে ফিরে চার্চের মঙ্গলের জন্যই চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে আরম্ভ করেন। সংগে সংগে তিনি জ্যোতির্বিদ্যাও অধ্যয়ন করতে থাকেন। তিনি প্রমান করেন, পৃথিবী একটি বৃত্তাকার গোলক। পৃথিবী, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের গতি সম্পর্কেও তিনি বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। পরবর্তীকালে কেপলার

তাঁর বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি সংশোধন করেন। কেপলারের বক্তব্য ছিল, গ্রহগুলির কক্ষপথ বৃত্তাকার নয়, বরং উপবৃত্তাকার।

কোপার্নিকাসের সমসাময়িক কালে পোল্যান্ড দেশ অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। নির্ভরযোগ্য কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না। দ্রব্য-মূল্যের ঊর্ধ্বগতির জন্যে মাঝে মাঝে যুদ্ধ ও অশান্তি দেখা দিত। কোপার্নিকাস জানতেন, ভালো টাকা (Good money) ও মন্দ টাকা (Bad money) যদি একই সংগে বাজারে চালু থাকে, তবে জনসাধারণ ভাল টাকা লুকিয়ে রেখে কেবল মন্দ টাকাই ব্যয় করতে থাকবে। বহুবছর পরে, এই ধারণা অর্থনীতিতে 'গ্রেসামের সূত্র' হিসাবে রূপায়িত হয়। পরবর্তীকালে, বৃটিশ সরকার অনুরূপ এক সমস্যা সমাধানের জন্যে আইজাক নিউটনের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। নিউটনও কোপার্নিকাসের অনুরূপ প্রস্তাব রাখেন এবং সরকার কর্তৃক সেই প্রস্তাবই গৃহীত হয়।

মহাজগত যে সৌরকেন্দ্রিক, কোপার্নিকাসই এই মতবাদের প্রথমতম উদ্ভাবক নন। তাঁরও আঠারোশো বছর আগে, সামোসের অধিবাসী গ্রীক জ্যোতির্বিদ্ আরিস্টারকাস (Aristairchus) অনুরূপ ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাসের মতো তিনি তাঁর মতবাদকে তত্ত্বগতভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে গেছেন। বৈজ্ঞানিক সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি সব সময় পরীক্ষামূলক গবেষণা করতেন। এই দিক থেকে বয়েল বিজ্ঞানজগতে একটি নতুন দিগন্তের সূচনা ক'রে গেছেন।

---

**স্যার আইজাক নিউটন (Sir Isaac Newton)**

গণিত, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসামান্য মৌলিক অবদানের জন্য মানবের চিন্তাজগতের ইতিহাসে আইজাক নিউটনের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছে। ইংলণ্ডে উল্‌স্‌থ্রপ (Woolsthrope) শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর জীবন-কালের পরিধি ছিল ১৬৪২ থেকে ১৭২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। এককালে ট্রিনিটি কলেজে তিনি ছিলেন তরুণতম অধ্যাপক। তিনি ছিলেন বীজগণিতের দ্বিপদ
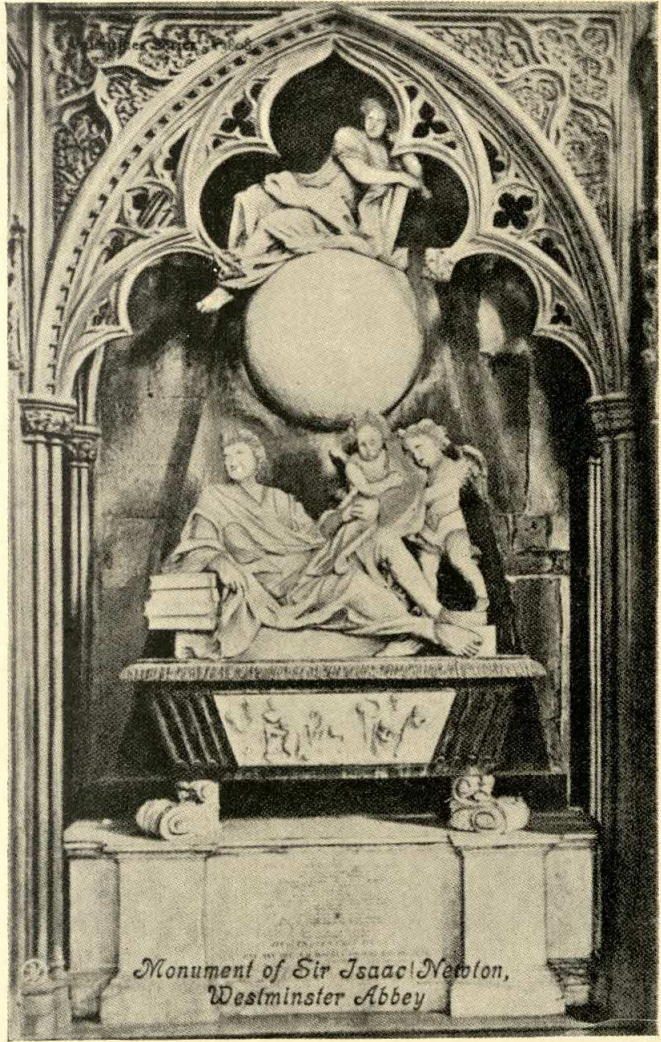
স্যার আইসাক নিউটনের স্মৃতিস্তম্ভ
—ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এ্যাবে
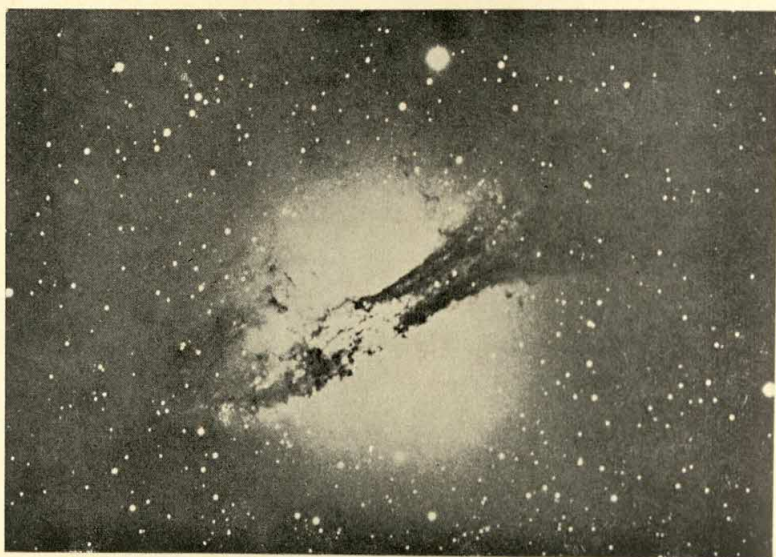
সেণ্টরাস নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত অস্বাভাবিক ধরণের এক নক্ষত্রমণ্ডল। এ জাতীয় নক্ষত্রমণ্ডলকে ক্ষুদ্ধ বেতার তরঙ্গের কারণ বলে অনুমান করা হয়

( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

বিরনো নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত কুণ্ডলীচক্র নীহারিকার পার্শ্ব চিত্র

( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

উপপাদ্যের (Binomial Theorem) আবিষ্কর্তা। এর পর তিনি গণিতের নতুনতর পদ্ধতি অন্তরকলন (Differential Calculus), সমাকলন (Integral Calculus), এবং অসম আকৃতির তল ও আয়তনের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করবার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। চাঁদ যে পৃথিবীর চারপাশে আবর্তন করছে, তা নিয়ে নিউটনের গবেষণার অন্ত ছিল না। তাঁর বক্তব্য ছিল, এই আবর্তনের একটিই মাত্র কারণ; সেটি হলো মহাকর্ষ বল। একই সংগে রং এবং আলোকবিজ্ঞানেও তাঁর গবেষণা সমানতালে এগিয়ে চলছিল। সূর্য এবং পৃথিবীর মধ্যে যে মহাকর্ষ বল কাজ করছে, সে বিষয়েও তিনি স্বীয় চিন্তাকে প্রসারিত ক'রে গেছেন। উপরোক্ত গবেষণার কাজে তিনি নিম্নোক্ত অংগীকারটিকে স্বীকৃত সত্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলেন। সূর্যদেহের যে কোনো বস্তুকণা অপর কোনো বহিঃস্থ বস্তুকণাকে আকর্ষণ করতে যে বল প্রয়োগ করে, সেই বল বস্তুকণা দু'টির ভরের গুণফলের সংগে সমানুপাতিক এবং উভয়ের কেন্দ্রদ্বয়ের দূরত্বের বর্গের সংগে ব্যস্তানুপাতিক। তাঁর এই অংগীকারটি যে সংকেত দিয়ে চিহ্নিত করা যায় সেটি হলো—

$$F = m_1m_2/d^2.$$

নিউটনীয় বলবিদ্যা বিজ্ঞানজগতে জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথের পথিকৃৎ।

**নিউটনের গতিসূত্র (Laws of motion)**

**প্রথম সূত্র**—বাহির হইতে প্রযুক্ত (Externally impressed) বল দ্বারা অবস্থার পরিবর্তন না করিলে স্থির বস্তু চিরকালই স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে সরলরেখা অবলম্বন করিয়া চিরকাল চলিতে থাকিবে।

**দ্বিতীয় সূত্র**—কোন বস্তুর ভরবেগের (Momentum) পরিবর্তনের হার বস্তুটির উপর প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে ঘটে।

**তৃতীয় সূত্র**—প্রত্যেক ক্রিয়ারই (Action) সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া (Reaction) আছে।

নিউটন বলেছিলেন, আলো হচ্ছে বিন্দু বিন্দু বস্তুকণার সমষ্টি। আলো সম্পর্কে নিউটনের বক্তব্য ঠিক কী ধরণের ছিল, সেটি তখনকার বিজ্ঞানী মহল সঠিক অণুধাবন করতে পারেন নি। দু'শো বছর পরে ম্যাকস্ প্ল্যাঙ্ক (Max Planck) অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে প্রমাণ ক'রে গেছেন, বস্তুকণা বা তরঙ্গের মারফৎ শক্তিকে শূন্যের ভিতর দিয়ে ধরাও যায় এবং পাঠানোও যায়।

**আঁতোয়া ল্যাভোসিয়ে (Autoine Lavvisier)**

পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, উভয় বিষয়েই সমান গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন ল্যাভোসিয়ে। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরে তাঁর জন্ম। প্যারিসের রাস্তা-ঘাট আলোকিত করবার সঠিক পদ্ধতি নিরূপণ করবার জন্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয়েছিল। কিঞ্চিদধিক বিশ বছর বয়সে ল্যাভোসিয়েকে সেই প্রতিযোগিতায় ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমী স্বর্ণ পদক পুরস্কার প্রদান করেন। তার মাত্র দু'বছর পরেই তাঁকে আকাদেমীর সভ্য নির্বাচিত করা হয়। তিনি দহন এবং মরিচা সম্পর্কে নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে গেছেন। সেই সময়ে তিনি গন্ধক ও ফসফরাস সম্পর্কেও নানা গবেষণা করছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেন, গন্ধক বা ফসফরাস পোড়ালে এদের ওজনের হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি ঘটে। পরীক্ষা ক'রে তিনি নিরূপন করলেন, দহনের সময় বায়ুর শতকরা ২০ ভাগ অংশ ব্যবহৃত হয় এবং বাকি ৮০ ভাগ অংশ কোনোভাবেই এই দহনের কাজে লাগে না। বায়ুর এই শতকরা ২০ ভাগ অংশকে তিনি অক্সিজেন (Oxygen) নামে চিহ্নিত করেছেন। ল্যাভোসিয়ের নাম বর্তমান রসায়নবিজ্ঞানের জনক হিসাবে পরিচিত। তিনি ছিলেন নিম্নোক্ত বিশ্ব-বিশ্রুত সূত্রটির প্রবক্তাঃ

"কোনো কিছু নিজে নিজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কোনো কিছু নিজে নিজে সৃষ্টও হয় না।"

আমাদের শরীরের ভাঙাগড়ার কারণগুলিও তিনি আবিষ্কার ক'রে গেছেন। আমরা যখন খাদ্য গ্রহণ করি, এবং শরীরের পক্ষে অব্যবহার্য অংশ বর্জন করি, তখন আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে নানা ধরণের রাসায়ণিক পরিবর্তন এবং শক্তির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ল্যাভোসিয়ে শরীরবৃত্ত এবং প্রাণরসায়ণ (Biochemistry) বিষয়েও অনেক গবেষণা পরিচালনা করেছেন এবং শরীরের মৌলিক বিপাক প্রক্রিয়া পরীক্ষা উপায় উদ্ভাবন করেন। আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের মতো ল্যাভোসিয়ের প্রতিভাও ছিল বহুমুখী। রসায়ন, শারীরবৃত্ত, বিজ্ঞান সম্মত কৃষি-বিদ্যা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনা এবং জনগণের শিক্ষা,—সর্ববিষয়েই সে যুগে তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক।

**এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner)**

বসন্ত প্রতিষেধক টীকা আবিষ্কার করবার গৌরব এডওয়ার্ড জেনারের। ইংলণ্ডের গ্লচেষ্টারশায়ার শহরে এঁর জন্ম। এঁর জীবনকালের ব্যাপ্তি ১৭৪৯ থেকে ১৮২৩ সাল পর্য্যন্ত। জেনারের পিতা ছিলেন ধর্মযাজক। প্রথমে স্থানীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে, পরে তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল থেকেই সজীব বস্তু ও জীববিদ্যায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছাত্রজীবন শেষ হ'লে তিনি গ্লচেষ্টারশায়ার শহরেই চিকিৎসা ব্যবসায় সুরু করেন। সেকালে আধুনিক যুগের মতো বিভিন্ন ধরণের ওষুধের প্রচলন ছিল না। কোনো কোনো গাছ পাতার মধ্যে যে রোগ প্রতিষেধক গুণ আছে, শুধু এটুকুই তৎকালীন মানুষের জানা ছিল। হৃদ্‌রোগে ব্যবহার করা হলো 'Digitalis' নামে একধরণের উদ্ভিদ্‌-জাত ওষুধ। পেনিসিলিন আবিষ্কারের অনেক আগে সেযুগে সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক হিসাবে একই ধরণের ওষুধের ব্যবহার ছিল। সেকালে মানুষের ধারনা ছিল, যে লোক একবার বসন্তরোগে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে গেছে, ভবিষ্যতে তার আর ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা নেই। গ্লচেষ্টারশায়ারের লোকেদের বিশ্বাস ছিল, যে ব্যক্তি একবার গোবসন্ত রোগে আক্রান্ত তারও ভবিষ্যতে আসল বসন্ত রোগ হবেই না। এই বিষয়টিতে জেনার বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং গোবসন্ত ও বসন্ত রোগ সম্পর্কে গবেষনা সুরু করেন। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, মানবশরীরের উপর পরীক্ষা সম্প্রসারিত করতে না পারলে ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। তখন থেকে তিনি এমন সব লোকের অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন যারা নিজেদের শরীরে পরীক্ষা করতে দিতে রাজি আছে। তিনি এক নম্বর রোগীর দেহে গোবসন্তের জীবানু এবং দু' নম্বর রোগীর দেহে আসল বসন্তের জীবানু অনু-প্রবেশ করিয়ে দিয়ে পরীক্ষা আরম্ভ করলেন। এক নম্বর বেঁচে উঠলো, কিন্তু দু' নম্বর রোগীকে বাঁচানো গেলো না। জেনার যখন তাঁর আবিষ্কারের ফলাফল জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তখন তাকে প্রবল বিরুদ্ধ জনমতের সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল। অনেকে তাঁকে প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে; অনেকে বলেছে, এ মতবাদ জেনারের নিজস্ব নয়, আগে থেকেই এরূপ মতবাদের প্রচলন ছিল। এই আবিষ্কারের জন্য অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় জেনারকে সম্মান সূচক ডিগ্রী প্রদান করেন এবং ধন্যবাদপত্র ও পারিতোষিকে বিভূষিত করেন।

**জন ডালটন (John Dalton)**

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রসায়ণবিদ্ হিসাবে ডালটনের খ্যাতি। ঈগলস্‌ফিল্ড শহরে তাঁর জন্ম (১৭৬৬—১৮৪৪)। ডালটন ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ও গবেষণার বিষয় ছিল মৌলিক বস্তুর গঠন প্রণালী। ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি কলেজে তাঁকে শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয়। ডালটন ছাত্রদের গণিত ও বিজ্ঞান পড়ানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন; এতে তাঁর এত বেশি ব্যস্ত থাকতে হতো যে তিনি অন্য কোনো কাজ করবার আর সময় পেতেন না। বায়ুমণ্ডল সম্পর্কে তিনি বিশদভাবে অধ্যয়ন করেছেন এবং সেই জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে তিনি পদার্থের পরমানবিক তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রে গেছেন। বায়ু ও বায়ুচাপ সম্পর্কেও তিনি বহুতর গবেষণা করে গেছেন। উত্তরকালে ক্যাভেণ্ডিস্, ল্যাভোসিয়ে এবং প্রিষ্টলী আবিষ্কার করেন। বায়ুমণ্ডলের উপাদান হ'লো অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), কার্বন ডাই অকসাইড ($CO_2$) এবং জল ($H_2O$)। ডালটন বায়ুর অনেক নমুনা সংগ্রহ ক'রে পরীক্ষা করে দেখেছেন, কার্বন ডাই অক্সাইড সবক্ষেত্রেই পাত্রের নিচের দিকে জমা হয়। নানা গবেষণার পর তিনি এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন যে, দুই ভিন্ন ভিন্ন গ্যাসের কণা পরস্পরকে বিকর্ষণ করে না, একই গ্যাসের বিভিন্ন কণার মধ্যেই বিকর্ষণবল কাজ করে। ডালটন প্রমান করেন, এই যৌগ প্রস্তুত করতে মৌলিক পদার্থগুলি কী পরিমাণে মিলিত হবে, সেটি মৌলিক পদার্থগুলির পরমানবিক ওজনের (Atomic weight) দ্বারা নির্নীত হবে। তিনি বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমানবিক ওজনের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করেন। তাঁর পরমানবিক তত্ত্ব নিম্নরূপ:—

সকল বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত।
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর পরমানুর গুণাবলীও ভিন্ন ভিন্ন।
একটি পরমাণু সম্পূর্ণভাবেই রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
রাসায়নিক যৌগ প্রস্তুতকালে পরমাণুগুলির গুণাবলী অপরিবর্তিত থাকে।
পরমাণু প্রস্তুত করা কিংবা ধ্বংস করা যায় না।

সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকেরা ডালটনের পরমানবিক তত্ত্ব স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। ফরাসী বিজ্ঞান আকাদেমীতে তাঁকে সভ্য নির্বাচন করা হয়। ডালটনের সূত্র পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নের মধ্যে একটি বিশেষ যোগসূত্র স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। বৈজ্ঞানিক জগতে ডালটনকে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বীকার করা হয়।

**মাইকেল ফ্যারাডে (Michael Faraday)**

শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্ ও পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে ফ্যারাডের পরিচয়। তিনি তড়িৎ-চুম্বকীয় বলরেখার সূত্র আবিষ্কার করেন। লণ্ডনের উপকণ্ঠে একটি ছোট শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর জীবনকালের ব্যাপ্তি ১৭৯১ থেকে ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি আবিষ্কার করেন, একটি তামার তারের কুণ্ডলীর ভিতর দিয়ে যদি একটি চুম্বককে চালিত করা যায়, তবে তারের ভিতর তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হবে। এই আবিষ্কারের ফলশ্রুতি বর্তমানযুগের তড়িৎ জেনারেটার ও তড়িৎ মোটর। তিনি আরো আবিষ্কার করেন, তড়িৎ প্রবাহ চৌম্বক বল সৃষ্টি করতে সক্ষম এবং অপরপক্ষে চুম্বকও তড়িৎ প্রবাহের উপর অনুরূপভাবে প্রভাবশীল। তাড়িতিক ও চৌম্বক বলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে ফ্যারাডের ধারণা মৌলিক। এই মৌলিক ধারণার উপর ভিত্তি ক'রে ম্যাক্সওয়েলের জগদ্বিখ্যাত সমীকরণটি গড়ে উঠেছে—তড়িৎ চুম্বকীয় বিষয়ে বর্তমান সব সূত্রাবলীর মূলে রয়েছে এই সমীকরণটি। গণিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ম্যাক্সওয়েল। তাই ফ্যারাডের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলি গাণিতিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। ম্যাক্সওয়েল তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে গুণগত যোগসূত্র ক'রে গেছেন। এ ব্যাপারে ফ্যারাডেই ছিলেন তাঁর পথ প্রদর্শক। অনুরূপভাবে ল্যাভোসিয়ের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলিকে ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে ডালটনে পরমানবিক তত্ত্ব। তাইচো ব্রাহের গবেষণার রাস্তা ধরে এগিয়ে কেপলার গ্রহের গতির রহস্য উদ্ঘাটন করেছেন; পতনশীল বস্তু সম্পর্কে গ্যালিলিও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গিয়েছিলেন বলেই উত্তরকালে নিউটনের পক্ষে গতিসূত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

**লুই পাস্তুর (Louis Pasteur)**

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবাণুবিদ্ ও রসায়ণবিজ্ঞানীদের একজন ছিলেন লুই পাস্তুর। রসায়ণ ও জীববিদ্যায় তিনি যেসব আবিষ্কার করে গেছেন তার ফলে পৃথিবীতে অকালমৃত্যুর হার বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ঔষধবিজ্ঞানে একক আবিষ্কারক হিসাবে সম্ভবতঃ তাঁর থেকে বড়ো আর কেউ নেই। পাস্তুরের জন্মভূমি ফরাসীদেশ। ১৮২২ থেকে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত; পরবর্তীকালে তিনি ষ্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ণের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। জীবনের অধিকাংশ কালই তিনি গবেষণার কাজে ব্যয় করেছেন। রসায়ণবিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় ছিল সন্ধান (Fermentation) প্রক্রিয়া; তাঁর গবেষণার ফলে ফরাসী মদ্য শিল্প বিশেষ উপকৃত হয়। সন্ধান প্রক্রিয়া সম্পর্কে জীবাণুতত্ত্বের তিনিই প্রথম প্রবক্তা। বহুতর গবেষণার পর তিনি জানতে পারেন প্রকৃতিতে বস্তুর কতকগুলি পরিবর্তনের মূলে রয়েছে নানা ধরণের জৈবপদার্থ, যেগুলি অণুবিক্ষণ যন্ত্র ছাড়া খালি চোখে দেখাই যায়না। এ থেকেই উদ্ভব হয়েছে 'পাস্তুর প্রক্রিয়া'র (Pasteurization Process) যার সাহায্যে দুধ ও অন্যান্য অনেক খাদ্যকে জীবাণুমুক্ত রাখা যায়। এ ছাড়াও তিনি মাইক্রোব (Microbes) বীজাণুর আবিষ্কারক। তিনি লক্ষ্য করেছেন, এই বীজাণু এবং অন্যান্য জীবাণুগুলি নানা পথে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, প্রশ্বাসের সংগে যে বায়ু আমরা গ্রহণ করি, যে খাদ্য ও পানীয় আমরা খাই সেগুলির ভিতর দিয়ে এবং শরীরের ক্ষতস্থানের মাধ্যমে এই সব জীবাণুগুলি শরীরে প্রবেশ করে। তাঁর আবিষ্কারের আগে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল স্বতঃ জনন (Spontaneous generation) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপ্রাণ বস্তুতে প্রাণের সঞ্চার হয়। পাস্তুর প্রমান করলেন, সব জৈব পদার্থই অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে উদ্ভুত। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখালেন, আমাদের চতুস্পার্শে জীবাণুদের অস্তিত্ব রয়েছে, ভৌতিক ও রাসায়ণিক পদ্ধতির সাহায্যে তাদের ধ্বংস করা যায়, তাদের বংশবিস্তার প্রক্রিয়াকেও আয়ত্বে আনা যায়।

জীবাণুবিদ্যায় পাস্তুরের আবিষ্কারগুলিকে পারম্পর্য্য অনুসারে তালিকাবদ্ধ করা যায়। তিনি সারাজীবন ধ'রে বিশেষভাবে গ্যাংগ্রীন (Gangrene), রক্তদোষ, জ্বর, এবং অন্যান্য নানা অসুখ সম্পর্কে অনেক গবেষণা করেছেন এবং অধিকাংশ অসুখেরই প্রতিষেধক আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তাঁর জীবনদর্শনের মূলকথাটি তাঁরই নিম্নোক্ত উক্তি থেকে উপলব্ধি করা যাবেঃ—

"আমি নিশ্চিতভাবে জানি, বিজ্ঞান ও শান্তি একদিন অজ্ঞানতা ও যুদ্ধের বিভীষিকা জয় করতে সক্ষম হবে; জাতিগুলি পরস্পর মিলিত হবে ধ্বংসের জন্য নয়,—গঠনের প্রচেষ্টায়; মানবের দুঃখ কষ্ট দুর্দ্দশা দূরীকরণের কাজে যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছেন, ভবিষ্যৎ তাঁদের কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পন করবেই।"

---

**রয়েণ্টগেন (Wm. Roentgen)**

বিজ্ঞানী রয়েন্টগেনের জীবিতকাল ১৮৪৫ থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত। একটি আকস্মিক ঘটনার ভিতর দিয়ে উইল্‌হেল্‌ম্‌ রয়েন্টগেন আবিষ্কার করেন যে, যতবারই একটি ক্যাথোড রশ্মি নলকে প্রজ্বলিত করা যায়, ততবারই নিকটস্থ একটি প্রতিপ্রভ (Flourescent) লবন মাখানো পর্দা আলো বিকীর্ন করতে থাকে। রয়েন্টগেন জানতেন, কাচনলের দেয়াল বেয়ে ক্যাথোড রশ্মি বেরিয়ে যেতে পারে না। তবু কোনো অজ্ঞাত কারণে পর্দার উপর একটি অদৃশ্য বিকিরণ পতিত হচ্ছে। এই বিকিরণ এতই শক্তিশালী যে, পর্দা এবং নলের মাঝে যদি মোটা কাঠের তক্তা বা কাচের অথবা ধাতুর আবরণ রাখা যায়, তবু পর্দাটি আলো বিকীর্ন করতে থাকে। শেষপর্য্যন্ত রয়েণ্টগেন আবিষ্কার করলেন, এই রশ্মি মানবশরীরের মাংসের আস্তরন ভেদ ক'রে পর্দায় হাড়ের ছায়া ফেলতে পারে। তিনি এই রশ্মিকে চিহ্নিত করবার জন্য বীজগণিতে সংকেত চিহ্ন এক্স্‌ (X) অক্ষরটিকে নির্বাচন করলেন। ক্যাথোড-রশ্মি থেমে গেলে দ্রুতসঞ্চরণশীল ইলেক্ট্রনগুলি যখন হঠাৎ গতিহীন হয়ে পড়ে, তখনই এই বিশেষ রশ্মির উদ্ভব হয়। এক্স্‌-রশ্মি নলটি সঞ্চরনশীল ইলেকট্রন-গুলিকে নিশ্চল করবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সম্বলিত ক্যাথোড রশ্মি নল ছাড়া

আর কিছু নয়। সাধারণতঃ নিশ্চল করবার কাজে আনোড়-এ ব্যবহৃত ধাতুটিকে কাজে লাগানো হয়। বন্দুক থেকে উৎক্ষিপ্ত একটি কার্তুজ কোনো গাছের দ্বারা প্রতিহত হলে যে-ধরণের ঘটনা ঘটবে, এক্স-রশ্মির উৎপত্তির ঘটনাটিও অনেকটা সেই রকম। কার্তুজটি গাছের ভিতর প্রবিষ্ট হবে এবং তার চলশক্তি তাপে রূপান্তরিত হবে; অনুরূপভাবে ইলেকট্রন অ্যানোড-এ প্রবিষ্ট হবে এবং তার শক্তি এক্স্-রশ্মির মাধ্যমে প্রকাশ পাবে। এক্স্-রশ্মি হলো অত্যুচ্চ-কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ; বেগনি পারের আলো (Ultraviolet Ray) থেকে এর কম্পাঙ্ক উচ্চতর এবং তেজষ্ক্রিয় পরমাণুর অতি পরমাণু (Nuclei) দ্বারা সৃষ্ট গামা রশ্মি থেকে কম। যাতে অ্যানোড-এর গায়ে ইলেকট্রনগুলি দ্রুততর গতিতে প্রতিহত হয়, তারজন্য খুব উচ্চ বিভবপার্থক্য (Voltage) ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষা ক'রে জানা গেছে, যেসব এক্স্-রশ্মি বেশি দূর প্রবেশ করে, সেগুলি উচ্চতর কম্পাঙ্কবিশিষ্ট। ইলেকট্রনের গতির সংগে কম্পাঙ্কের একটি সম্পর্ক আছে। আলোকের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব রয়েণ্টগেনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যগুলির সংগে সম্পূর্ণভাবে মিলে যায়।

যদি আমরা ধরে নিই,

$m =$ ভর (mass)

$v =$ গতি (velocity)

$h =$ প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (Planck's constant)

$f =$ কম্পাঙ্ক (frequency)

তবে $\frac{1}{2}mv^2$ কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট এক্স্-রশ্মি ফোটনের শক্তির মান হবে $hf$.।

**মেরী কুরি (Marie Curie)**

মেরী কুরিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি ইউরেনিয়াম আকরের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি একে রেডিয়াম ও পলোনিয়াম নামে অভিহিত করেছেন। মেরীকুরির জন্ম পোল্যাণ্ডের ওয়ারশ নগরে। ১৮৬৭ থেকে ১৯৩৪

সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। মেরীর স্বামী পিয়ের কুরি (Pierre Curie) তড়িৎ ও চুম্বক সম্পর্কিত গবেষণায় সারা জীবন ব্যস্ত থেকেছেন। প্রথমে মেরীও স্বামীর পাশে পাশে গবেষণাগারে তড়িৎ ও চুম্বক বিষয়ে গবেষণার কাজ সুরু করেন। এই সময় দিয়ে জার্মানীতে উইল্‌হেল্‌ম্‌ রয়েন্টগেন প্রভূত প্রবেশ ক্ষমতার অধিকারী রশ্মি আবিষ্কার করেন। ১৮৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি বিজ্ঞান-জগতে এই রশ্মির পরিচয় দেন এবং এটির নামকরণ করেন এক্স্‌-রশ্মি। অধ্যাপক ব্যাকেরেল (Bacquerel) অনুপ্রভাবিষয়ক (Phosphorescence) সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। পরীক্ষার কাজে মেরী কুরির বিশেষ দক্ষতা তিনি লক্ষ্য করেন। ব্যাকেরেল তাঁর সমস্যাটি মেরীর নিকট উপস্থাপিত করেন। মেরী এবং পিয়ের সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা ক'রে স্থির করলেন, অন্যান্য গবেষণার কাজ আপাতত স্থগিত রেখে অনুপ্রভাবিষয়ক সমস্যাটির সমাধানের কাজে সাময়িকভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে।

প্রথমে রেডিয়ামের জন্যে কাঁচা মাল, বহু টন পিচব্লেণ্ড (Pitchblend) গবেষণাগারে জমা করা হলো। কাঁচা লোহার ষ্টোভে গালিয়ে এগুলি পরিশুদ্ধ করবার ব্যবস্থাও করা হলো। আগুনের উত্তাপ যখন ঘরের পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠলো তখন গৃহসংলগ্ন বাগানে ধাতু পরিশোধনের কাজ করা হতে লাগলো। এই কাজে দুজনকেই অসম্ভব পরিশ্রম করতে হয়েছে। মেরী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, পিয়ের কিন্তু ধুনী জ্বালিয়েই রাখলেন। তিন মাসকাল রোগভোগের পর মেরী ফিরে এসে আবার কাজে যোগ দিলেন।

১৮৯৭ সালে তখনও তারা পিচব্লেণ্ড পরিশুদ্ধ করে চলেছেন। দু'বছরের অসহনীয় একঘেয়েমীর শেষে তাঁরা সামান্য পরিমান বিস্‌মাথ্‌ যৌগের সন্ধান পেলেন। এই বিসমাথ যৌগ ইউরেনিয়ামের চেয়েও তিনশো গুণ বেশি সক্রিয়। মেরী আরো কোনো রহস্যের সন্ধানে গবেষণাগারে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সারা পৃথিবীকে একটি নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কারের কথা জানালেন—নিজের প্রিয় স্বদেশের নাম অনুসারে নবাবিস্কৃত মৌলিক পদার্থটির নামকরণ করলেন পোলোনিয়াম (Polonium)। মেরী অক্লান্তভাবে কাজ করে চললেন। পোলোনিয়াম সংগৃহীত হবার পর যা পড়ে রইলো সেটি পোলোনিয়াম থেকে অনেক বেশি সক্রিয়।

আরো কাজ বাকি থেকে গেছে—পরিশোধন ও স্ফটিকীকরণের কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে থাকলো। অবশেষে আর একটি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেল—সেটির নাম দেওয়া হলো রেডিয়াম (Radium)। এই নতুন মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়ামের চেয়ে দশলক্ষ গুণ বেশি সক্রিয়। রেডিয়াম বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের অনুগুলিকে আয়নিত করে। রেডিয়াম যৌগগুলি অন্যান্য যৌগিক পদার্থের সংগে মিলিত হলে প্রতিপ্রভার উদ্ভব হয়। রেডিয়াম বিকিরণ বীজের বৃদ্ধি রোধ করে, জীবাণু ধ্বংস করে, এমনকি ছোটো ছোটো জন্তুজানোয়ারকেও মেরে ফেলতে পারে। রেডিয়াম বিকিরণ শরীরের কলাগুলিকে ধ্বংস করতে পারে তাই কর্কট রোগের চিকিৎসা হিসাবে রেডিয়াম বিকিরণ ব্যবহৃত হচ্ছে। কুরিদের নোবেল পুরস্কার

দান ক'রে সম্মানিত করা হয়। পিয়ের কুরি অধ্যাপক নিযুক্ত হন কিন্তু একটি দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে মেরী কুরি বিশুদ্ধ রেডিয়াম প্রস্তুত করতে সক্ষম হন এবং এই কীর্তির জন্য তাঁকে দ্বিতীয় বার নোবেল পুরস্কার দিয়ে যোগ্য সম্মান দান করা হয়।

---

জেম্‌স্‌ ম্যাক্সওয়েল (James Maxwell)

ম্যাক্সওয়েল আবিষ্কার করেন যে, আলোক তরঙ্গ হলো তড়িৎ-চুম্বকীয় এবং যেসব তরঙ্গ তড়িৎ-চুম্বকীয় তারা শূন্যের ভিতর দিয়ে আলোর গতিতে চলে। স্কটল্যাণ্ডের এডিনবরায় ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার জন্যে তিনি স্কটল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। ১৮৫৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি অর্জন ক'রে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে আরো লেখাপড়া করতে মনস্থ করেন। সেই সময়েই তাঁর মৌলিক গবেষণার ফল হিসাবে তিনি একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার করেন। লাল সবুজ ও নীল এই তিনটি প্রাথমিক রংকে বিশেষ-ভাবে মিলিত করতে পারলে যেকোনো রং উৎপন্ন করা যায়। তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বর্তমানকালের বর্ণ-দূরেক্ষণ যন্ত্রের (Color television) সূত্রপাত হিসাবে চিহ্নিত করা চলে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি তড়িৎচুম্বকীয় ক্ষেত্রের বিষয়ে যে তত্ত্বের অবতারনা করেন, তার সূত্র ধরে আজ রেডিয়ো, দূরেক্ষণ এবং রাডার প্রভৃতি এমন সব যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে যেগুলি ইলেকট্রনীয় তরঙ্গের উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের উপর সরাসরি নির্ভরশীল।

শনিগ্রহে বলয়ের অবস্থান এবং গ্যাসের চলাচল সম্পর্কে তিনি মৌলিকভাবে গাণিতিক বিশ্লেষণ করে গেছেন। কিন্তু তড়িৎ ও চুম্বক সম্পর্কিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান এত গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের উজ্জ্বলতা এই অবদানের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ সম্পর্কে ফ্যারাডের যে তত্ত্বটি রয়েছে, সেটি তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। চৌম্বক ধর্ম থেকে তড়িতের উৎপাদন, এই হলো তত্ত্বটির প্রতিপাদ্য বিষয়। ফারাডে চুম্বকের চারপাশে বলরেখার
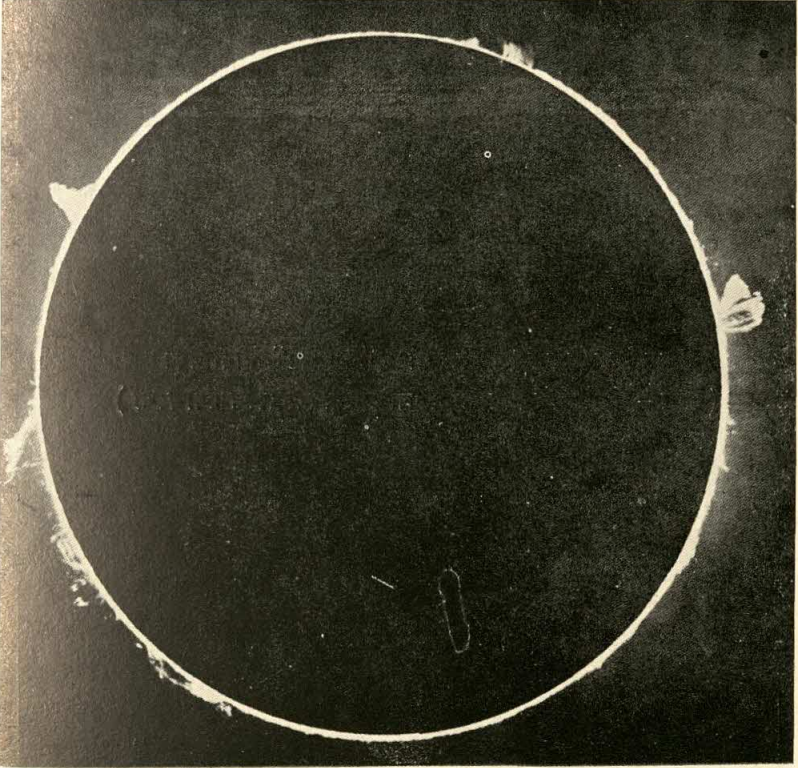
সূর্যের অভিক্ষিপ্তাবস্থা
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

অরিয়ন নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত "অশ্বমুণ্ড" নীহারিকা
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

আন্দ্রোমেদা নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত কুণ্ডলীচক্র অতিকায় নক্ষত্রমণ্ডলী
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। ম্যাক্সওয়েল চৌম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে একটি চিত্র মনে মনে খাড়া করলেন। এই মানসচিত্র থেকে তিনি এই মৌলিক সত্যটির উদ্ভাবন করলেন যে, চৌম্বক বলরেখাগুলি চতুর্দিকে আবদ্ধ, বলরেখাগুলির কোনো দিকে কোনো রন্ধ্র নেই।

---

**চার্লস্ রবার্ট ডারউইন (Charles Robert Darwin)**

ডারউইনের নাম সমস্ত পৃথিবীতে বহুলপ্রচারিত একটি নাম। জীববিদ্যাবিষয়ক বিজ্ঞানের 'বিবর্তন তত্ত্বে'র উদ্ভাবক ছিলেন তিনি। ইংল্যাণ্ডের স্রুসবেরি (Shrewsbury) সহরে তাঁর জন্ম। তাঁর জীবনকালের বিস্তার ১৮০৯ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি বহু ঘটনা এবং বহু উদাহরণ একত্র সমাবিষ্ট করেছেন এবং সেগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেছেন। বলা যেতে পারে, ডারউইন হচ্ছেন জগতের শ্রেষ্ঠ স্বভাববাদী বৈজ্ঞানিক—যাঁর অভূতপূর্ব সামান্যী-করণের (Generalisation) তত্ত্ব সমগ্র মানবসমাজ কর্তৃক সাগ্রহে গৃহীত হয়।

১৮৩১ থেকে ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি আটলান্টিকের দ্বীপগুলিতে আবিষ্কারমূলক অভিযান চালান। তিনি দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলবর্তী দেশগুলিতে ভ্রমন করেছেন, তাহিতি দ্বীপ পরিদর্শন করেছেন, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, টাস্মেনিয়া এবং নিকটবর্তী অন্যান্য দেশগুলিতেও পদার্পন করেছেন। এই পৃথিবী ব্যাপী অভিযান শেষ না ক'রে তিনি স্বদেশে ফেরেন নি। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে তিনি জীবাশ্মের অনুসন্ধানে কালহরণ করেছেন, গাছপালা, জীবজন্তু এবং ভূতত্ত্ব বিষয়েও গবেষণা চালিয়ে গেছেন।

তিনি দ্বীপের ও নিকটবর্তী মহাদেশের জীবজন্তুর মধ্যে এবং জীবিতপ্রাণী ও অধুনালুপ্ত জীবজন্তুর মধ্যে সম্পর্কগুলি লক্ষ্য করেছেন, সেইসব স্থানের জীবাশ্ম সম্পর্কে গবেষণা করেছেন, অবশেষে "প্রজাতির রূপান্তর" (Modification of species) বিষয়ে তিনি এক নতুন তত্ত্বের অবতারনা করলেন। ঘনিষ্ঠভাবে

সম্পর্কান্বিত ভিন্নজাতীয় জীবেরা কালের অগ্রগতির সংগে সংগে যেভাবে একটি অপর একটির সংগে রূপ অদলবদল করে, তা দেখে তিনি চমৎকৃত হন। তিনি জানতেন, সমস্ত প্রজাতিগুলিই "পরিবর্তনের আইনের" (Laws of change) অধীন এবং পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে ভাসতে কোনো কোনো প্রজাতি একদিন ধরাপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়।

১৮৩৮ সালে শিষ্যদের নিকট একটি অভিভাষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রভূত অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিশ্চিতভাবে জেনেছেন যে সকল জীবই অবিরত অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম (Struggle for existence) চালিয়ে যাচ্ছে। যে পরিবর্তনগুলি জীবের জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন, সেগুলিই কালক্রমে রক্ষিত হয় এবং যেগুলি বাঁচবার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, সেগুলি ক্রমশঃ অবলুপ্ত হয়। পরিবর্তনগুলির ভিতর দিয়ে ক্রমশ নতুন নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়।

১৮৫৯ সালে ডারউইন তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি "প্রজাতির উৎপত্তি" (Origin of species) গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। প্রজাতির উৎপত্তির মূলে রয়েছে প্রাকৃতিক নির্বাচন অথবা জীবনযুদ্ধে যোগ্যতর শ্রেণীগুলির টিঁকে থাকা। যেদিন এই গ্রন্থটি লোকসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করলো, সেদিনেই এর সব কটি প্রতিলিপি (১২৫০ খানি) বিক্রি হয়ে গেলো।

আর একজন স্বভাববাদী বৈজ্ঞানিকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের অধিবাসী, নাম আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস। ডারউইনের গ্রন্থ প্রকাশিত হবার অল্প কিছু দিন আগে বিবর্তন প্রসঙ্গে ওয়ালেস একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বিবর্তন সম্পর্কে উভয়ের ধারনার মধ্যে যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এঁরা দুজনে যেসব নীতি ও সত্য উদ্ভাবন ক'রে গেছেন, আজোপর্যন্ত সেইগুলিই প্রায় অবিকৃতভাবে জীববিজ্ঞানের নির্ভুল তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত।

---

**আরেনিয়াস (S. A. Arrhenius)**

দ্রবনের পরিবাহিতার তড়িৎ বিশ্লেষ্ট বিষঙ্গ (Electrolytic dissociation) প্রসঙ্গে প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন আরেনিয়াস। তাঁর জন্মভূমি সুইডেন। ১৮৫৯ থেকে

১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। শৈশবেই গণিতে তিনি অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুইডেনের আপসালা (Uppsala) বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে তড়িৎবিশ্লিষ্ট বিষঙ্গ বিষয়ে তিনি একটি নিবন্ধ রচনা করেন। এই নিবন্ধটির জন্য তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনিই প্রথম অতিতরল রাসায়নিক দ্রবনের তড়িৎ পরিবাহিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এর পর তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল তড়িৎ-বিশ্লিষ্ট বিষঙ্গ এবং সক্রিয়তা সহগ (Activity coefficient)। এরপর জৈবপদার্থের রসায়নের নানা সমস্যার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেইসূত্রে তিনি অধিবিষ (Toxin), প্রতিবিষ (Antitoxin) এবং তাদের নানা ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কে সুইডেনস্থ বিজ্ঞানীমহলে একটি ভাষণ দেন। জীববিদ্যা বিষয়ক রসায়ন বিজ্ঞান সম্পর্কেও তিনি অনেকগুলি ভাষণ দিয়েছিলেন। সৃষ্টিক্রম বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কেও তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। তিনি এই ধারনা প্রচার করেন যে, সারা পৃথিবীতে নানা স্থানে জীবন বিক্ষিপ্ত রয়েছে, এবং বাসের অনুকূল স্থান থেকে অনবরতই রেনুর (Spore) আকারে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যুগ যুগ ধরে বছরের পর বছর শূন্য পরিক্রমা করে চলেছে। এর অধিকাংশই প্রজ্বলিত নক্ষত্রের তাপে ধ্বংস-প্রাপ্ত হচ্ছে, কিন্তু কিছুটা অংশ যে সব দেহ বাসোপযোগী অবস্থায় এসে পেঁাছেছে তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করছে। তড়িৎবিশ্লিষ্ট বিষঙ্গ তত্ত্বের উদ্ভাবক হিসাবে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে যখন তাঁকে রসায়নে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়, তখন থেকেই সমগ্র বিশ্বে তিনি সুপরিচিত। অনুরূপ বিষয় সম্পর্কে তিনি বহু পুস্তক প্রণয়ন করেছেন, যেমন—'গঠনের পথে জগত', 'দ্রবনের তত্ত্ব', 'জীববিদ্যাগত রসায়নের মাত্রিক সূত্রাবলী' (Quantitative laws), ইত্যাদি।

**জোহানেস কেপলার (Johannes Keplar)**

জ্যোতির্বেত্তা ও গণিতজ্ঞ হিসাবে কেপলারের প্রসিদ্ধি। জার্মানীর ভাইল শহরে তাঁর জন্ম। ১৫৭১ সাল থেকে ১৬৩০ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনকাল। প্রথমজীবনে দেশের মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান পাবার উচ্চাশা তাঁর মনে বাসা বাঁধে। কিন্তু সৌরমণ্ডল সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ জাগ্রত হবার পর থেকে তিনি তাঁর সংকল্পের পরিবর্তন করেন।

তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ছিল, "সৌরমণ্ডলের বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ডগুলি কীভাবে তাদের কক্ষপথে বিরাজ করছে?" সতেরো বছর বয়সে তিনি কোপার্নিকাসের তত্ত্বগুলি অধ্যয়ন করেন। যদিও কেপলার ছিলেন বৈজ্ঞানিক, তবু জ্যোতিষশাস্ত্রেও তাঁর বিশ্বাস ছিল। জানা গেছে, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানের সংগে মিলিয়ে তিনি নিজের প্রতিদিনের রোজনামচা লিখে রাখতেন। অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে জোতিষশাস্ত্রে অবিশ্বাসের ভান করতেন; কিন্তু সেযুগের নানা ধরনের কুসংস্কার থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। জোতির্বিদ্যা বিষয়ে কেপলার বহুতর পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে গেছেন। তাঁর অধীনে যে গবেষণা কার্য্য পরিচালিত হতো, তাতে দু'শোর-ও বেশি নতুন নক্ষত্রসম্পর্কে অনুসন্ধান চালানো হয়েছে। গ্রহের আবর্তন সম্পর্কে কেপলার তিনটি সূত্র আবিস্কার ক'রে গেছেন।

(১) প্রত্যেক গ্রহই সূর্য্যকে নাভিতে (Focus) রেখে উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করে।

(২) সূর্য্যকেন্দ্র ও গ্রহকেন্দ্রের সংযোজক সরল রেখা সমান সমান সময়ে সমান সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করে।

(৩) সূর্য্যের চারপাশে পূর্ণ আবর্তন করতে দুটি গ্রহের যে সময় লাগে তাদের বর্গদ্বয় সূর্য্য থেকে তাদের গড় দূরত্বে সমানুপাতিক।

---

**রবার্ট বয়েল (Robert Boyle)**

একাধারে পদার্থবিজ্ঞানী ও রসায়নবিদ্ ছিলেন বৈজ্ঞানিক বয়েল। তিনি বায়ু ও অন্যান্য গ্যাসের সংকোচন ও প্রসারণ সম্পর্কে নানা ধরনের গবেষণা ক'রে গেছেন। তাঁর আবিস্কৃত সূত্র বয়েলের সূত্র (Boyle's Law) নামে সমধিক খ্যাত। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন, উষ্ণতা অপরিবর্তিত রেখে চাপ বৃদ্ধি করলে বায়ুর আয়তন হ্রাস পায়। আবার, চাপ অপরিবর্তিত রেখে যদি তাপমাত্রা বাড়ানো যায় তবে আয়তনও বৃদ্ধি পায়। নিজের এই কীর্তির আনন্দে তিনি কখনও আত্মহারা হননি। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানের সকল শাখা প্রশাখায় তিনি তাঁর গবেষণাকার্য্য সম্প্রসারিত

ক'রে গেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, শব্দের গতিবেগ, রংএর বিভিন্নতার কারণ, স্ফটিকের গঠন এবং স্থির তড়িৎ। অল্পের জন্য অক্সিজেন গ্যাস আবিস্কারের সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। তিনি একটি ভ্যাকুয়াম পাম্প প্রস্তুত ক'রে সেটির সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, বায়ুহীন স্থানে কোনো প্রাণী জীবিত থাকতে পারে না। তিনি কম চাপে তরলের স্ফুটন ও শিলীভবন (Freezing) সম্পর্কে গবেষণা ক'রে গেছেন। অল্প চাপে চাপমান যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কেও তিনি অনেক দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

---

**মেণ্ডেলেফ (D. I. Mendalayev)**

মেণ্ডেলেফের বিশ্ববিশ্রুত কীর্তি হলো পর্যাবৃত্ত সারনীর (Periodic Table) উদ্ভাবন, যার সাহায্যে সকল মৌলিক পদার্থের ধর্মগুলিকে একটি বিশেষ নিয়মের মধ্যে আবদ্ধ করা যায়। পরমানবিক ওজনের ভিত্তিতে তিনি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থগুলিকে পর্যাবৃত্তসারনীতে সমাবদ্ধ করেন। মেণ্ডেলেফ ছিলেন রুশদেশীয় রসায়নবিদ্; তাঁর জন্ম সাইবেরিয়ার অন্তর্গত তোবল্‌স্ক্ শহরে। ১৮৩৪ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বিজ্ঞান অধ্যয়ন করবার জন্য তিনি সেণ্ট পিটার্সবুর্গে যান এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে সেখান থেকে রসায়ন বিষয়ে ডিগ্রি লাভ করেন। পরে, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেণ্টপিটার্সবুর্গের কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্রে রসায়নের অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেন। সেই সময়ে আরও অনেক রসায়নবিদ্ই উপরোক্ত বিষয়ে গবেষণায় নিরত ছিলেন। কিন্তু মেণ্ডেলেফই একমাত্র বৈজ্ঞানিক, যিনি সমগ্র বিষয়টির সঠিক সামান্যীকরণ করতে পেরেছেন। তিনি মৌলিক পদার্থগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে গেছেন, কতকগুলি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, একটি বিশেষ "প্রাকৃতিক নিয়ম" হিসাবে। শুধু তা-ই নয়, এই প্রাকৃতিক নিয়মকে ভিত্তি ক'রে মৌলিক পদার্থগুলির ধর্ম সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী পর্যন্ত করা যায়।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি সারণীর শূন্যস্থানের অনুরূপ তিনটি অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করেন। সেই মৌলিক পদার্থ তিনটি এবং তাদের বিভিন্ন যৌগের ধর্ম সম্পর্কেও তিনি সম্যক্ ধারণা ক'রে গেছেন। এই তিনটি মৌলিক পদার্থ হলো যথাক্রমে একা-বোরণ, একা-অ্যালুমিনিয়াম এবং একা-সিলিকন। মাত্র পনেরো বছরের মধ্যে তাঁর কল্পনার বাস্তবতা নির্ভুলভাবে প্রমানিত হয়েছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দেই আবিস্কৃত হয়েছে গ্যালিয়াম (Gallium), ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে স্ক্যাণ্ডিয়াম (Scandium) এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে জারমেনিয়াম (Germanium)। এমনকি, কতকগুলি ক্ষেত্রে তিনি স্বীকৃত পরমানবিক ওজনের নির্ভুলতা সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করেছেন। কারণ, সেসব ক্ষেত্রে পর্যাবৃত্ত সারণীর নিয়মগুলি লঙ্ঘিত হ'তে দেখা গেছে। উক্ত বিষয়ে পরবর্তী কালের গবেষণা থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মেণ্ডেলেফের সন্দেহের কারণগুলি ছিল সঠিক।

বিভিন্ন তরলের তাপীয় প্রসারণ (Thermal expansion) সম্পর্কেও মেণ্ডেলেফ গবেষণা করে গেছেন এবং তাপীয় প্রসারণের একটি গাণিতিক সূত্র ও আবিস্কার ক'রে গেছেন। তাঁকে ১৮৮২ ডেভি (Davy) স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়। সমসাময়িক কালে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

---

**আর্নেস্ট রাদার ফোর্ড (Ernest Rutherford)**

রাদারফোর্ডকে বলা হয় অতিপরমানু (Nuclear) বিজ্ঞানের জনক। তিনি ছিলেন আনবিক তত্ত্বের উদ্ভাবক। রাদারফোর্ড আবিস্কার করেন, প্রোটন এবং ইলেক্ট্রন দিয়ে অনুগুলি গঠিত। প্রোটনগুলি থাকে ধনাত্মক আধানে আহিত এবং তাদের অবস্থান অনুর কেন্দ্রস্থলে। অপরপক্ষে, ইলেক্ট্রনগুলি আহিত থাকে

ঋণাত্মক আধানে এবং প্রোটনের চারপাশে তারা থাকে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চরমান। এই ব্রিটিশ পদার্থবিদের জন্মভূমি নিউজীল্যাণ্ড। ১৮৭১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের ব্যাপ্তি। তাঁর ছাত্রজীবন প্রথমে কেটেছে নেলসন কলেজে, এবং পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর প্রথম গবেষণার বিষয় ছিল তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ। এরপর টমসন-এর (Thomson) সংগে একত্রে তিনি গ্যাসের অস্থায়ী পরিবহনের বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করেন; এই পরিবহনের সূত্রপাত হতে পারে এক্স্ রশ্মি থেকে উদ্ভূত আয়নায়ন (Ionization) থেকে।

আল্ফা রশ্মি (Alpha rays) সম্পর্কেও তিনি বহু গবেষণা করে গেছেন। তিনি পরীক্ষা করে দেখেছেন, ইউরেনিয়াম থেকে এমন এক শক্তিশালী বিকিরণ লাভ করা সম্ভব, যা অ্যালুমিনিয়াম পাতের কয়েক সেণ্টিমিটার পর্যন্ত ভেদ করতে পারে। রাদারফোর্ড এই বিকিরণের নামকরণ করেছেন বিটা রশ্মি (Beta rays)। এগুলি উচ্চগতি সম্পন্ন ইলেকট্রন ছাড়া আর কিছু নয়।

তাঁর পরবর্তী গবেষণার বিষয় ছিল থোরিয়ামের নিঃসরণ (Thorium emanation); সেই মূল্যবান্ গবেষণার ফলশ্রুতি হলো থোরণ (Thoron) নামে একটি নতুন গ্যাসের আবিস্কার। রাদারফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরাই তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে আধুনিকতম তত্বের উদ্ভাবক।

১৯০৯ সালে শিক্ষক হিসাবে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯১২ সালে ম্যাঞ্চেষ্টার ল্যাবরেটারিতে কাজ করবার জন্য ইংল্যাণ্ডে এলেন নীল বোর। এখানে এসে তিনি রাদারফোর্ডের পরমানবিক গঠন এবং ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়াণ্টাম তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলেন। পরমানবিক গঠন সম্পর্কে নীল বোর যে ধারনা পোষণ করতেন, বর্ণালীবীক্ষণকারীদের পরীক্ষামূলক গবেষণার সংগে তার কোনো বিরোধ নেই।

এই সময়ে বৈজ্ঞানিক মোস্‌লীর (H. G. Moseley) সংগে রাদারফোর্ডের পরিচয় হয় এবং ১৯১৩ সালে দুজনে একসংগে গবেষণা করতে থাকেন। মোস্‌লী বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের অণুকে ক্যাথোড রশ্মির সংগে বিস্ফোরিত করেন এবং প্রমান করেন যে, অণুগুলির আভ্যন্তরীন গঠন এমন কতকগুলি রেখার ইঙ্গিত করে, যাদের সাহায্যে মৌলিক পদার্থগুলিকে সাধারণ পূর্ণসংখ্যার মতো চিহ্নিত করা যায়। তারপর থেকে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থকে চিহ্নিত করতে একটি ক'রে 'পরমানবিক সংখ্যা' (Atomic number) কল্পনা করা হচ্ছে। 'পরমানবিক সংখ্যার' সংগে মৌলিক পদার্থের ধর্মগুলির সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে। তাই এই আবিস্কারের গুরুত্ব অপরিসীম।
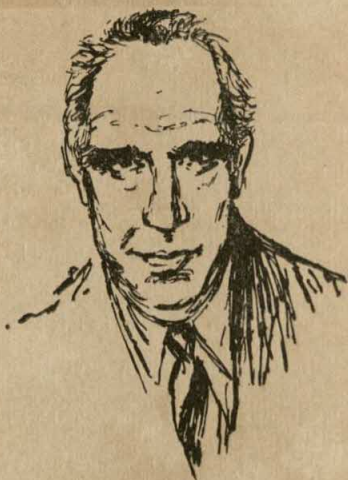
**নীল বোর (Neils Bhor)**

তত্ত্বগত পদার্থবিদ্যায় বর্তমানকালের অনন্যসাধারণ ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকদের অন্যতম ছিলেন নীল বোর। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে কোপেনহাগেন থেকে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৮৫ সালে নীল বোর-এর জন্ম, মৃত্যু ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে। স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হ'য়ে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ম্যাঞ্চেষ্টার অঞ্চলে স্যার আর্নেষ্ট রাদারফোর্ডের অধীনে গবেষণা কাজে ব্রতী হন। আলফা-রশ্মির বিচ্ছুরন (Scattering) সম্পর্কে গবেষণা ক'রে তিনি যে সব তথ্য সংগ্রহ করেন, তা থেকে তিনি পরমানবিক গঠনের ক্ষেত্রে নতুন এক অতিপরমানবিক তত্ত্বের অবতারনা করেন। কয়েক বছর আগেই জার্মান বৈজ্ঞানিক ম্যাক্স্ বিকিরণ সম্পর্কে এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন। বিকিরণ সম্পর্কিত এই তত্ত্বের নাম হ'লো "কোয়াণ্টাম প্রকল্প" (Quantum hypothesis)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী যে কোনো পরমাণুর শক্তি গ্রহণ নির্ভর করে একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থাৎ 'কোয়াণ্টা'র উপর। পরমাণু কর্তৃক বিকীর্ণ শক্তির ব্যাখ্যার জন্য নীল বোর প্ল্যাঙ্ক-এর এই তত্ত্বকে রাদারফোর্ড-প্রস্তাবিত পরমাণুর মডেলে ব্যবহার করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি দুটি ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করেন, যা পরমাণুর গঠন প্রকৃতির আধুনিক তত্ত্বগত ক্ষেত্রে মৌলিক। এই দুটি ধারণা হলো নিম্নরূপ:—

(১) যখন পরমাণু গঠনকারী ইলেকট্রনের প্রত্যেকটি তাদের অনুকূল শক্তির স্থির অবস্থায় থাকে, কেবলমাত্র তখনই এই ইলেকট্রনগুলি পরমাণুর এক স্থায়ী বিকিরণহীন অবস্থা।

(২) কোনো বিচ্ছিন্ন পরমানবিক ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত বা বর্জিত তেজপুঞ্জ অবিমিশ্র এক তরঙ্গ বিশিষ্ট এবং তেজপুঞ্জের এই গ্রহণ বা বর্জন কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হয়; যখন পরমাণু গঠনকারী ইলেকট্রনের এক নির্দিষ্ট কথা (Stationary orbit) থেকে অন্য কোনো নির্দিষ্ট কক্ষে উত্তরণ ঘটে।

এই দুইটি ধারনার উপর ভিত্তি ক'রে বোর পরমানবিক হাইড্রোজেনের বর্ণালীর (Spectrum of atomic hydrogen) সমস্ত তরঙ্গের কম্পাঙ্ক গণনা করতে সক্ষম

আন্দ্রোমেদা নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত ও নক্ষত্রমণ্ডলী পরিবৃত অতিকায় নীহারিকা।

( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )
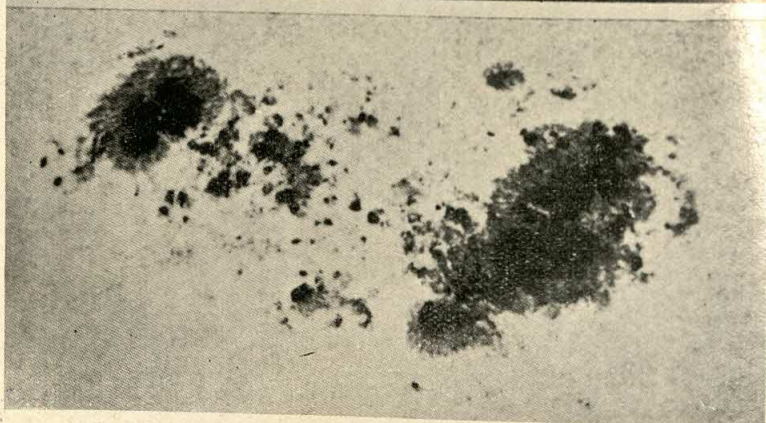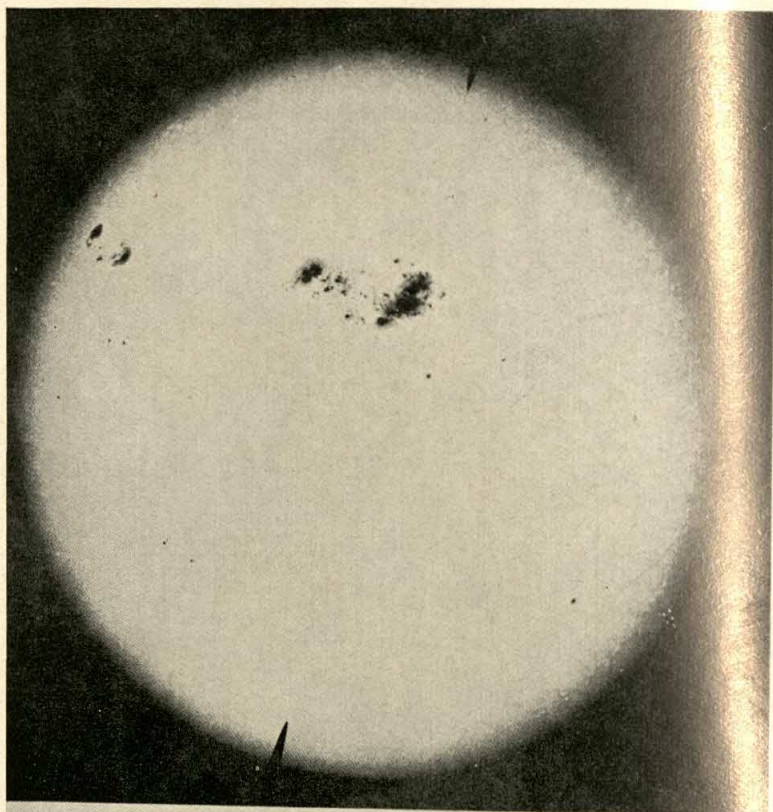
পূর্ণ-সূর্য ও ১৯৪৭ সালের ৭ই এপ্রিল গৃহীত সূর্য কলঙ্কের বর্ধিত চিত্র
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

হন। পরীক্ষালব্ধ কম্পাঙ্কের যে মান পাওয়া যায়, গণনাকৃত মানের সাথে তার কোনো বিরোধ নেই।

১৯২২খৃঃ তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তাছাড়াও তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের জন্য অন্যান্য বহুসম্মানে তাঁকে ভূষিত করা হয়। অতিপরমাণুর ঘটনা সংক্রান্ত "লিকুইড-ড্রপলেট" মডেলেরও তিনি ভিত্তি রচনা করেন। এই মডেলের সাহায্যেই পরমাণুর অভ্যন্তরের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টা চলেছে।

সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণু—একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রন দিয়ে গঠিত। বরের পরমানবিক মডেল অনুযায়ী এই ইলেকট্রন প্রোটনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিন করছে যেমনভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিন করছে গ্রহ। ইলেকট্রনকে তার কক্ষপথে ধরে রেখেছে প্রোটনের বিষম তড়িতের আকর্ষণ। অভিকর্ষ বলের মতই এই আকর্ষণ প্রোটন এবং ইলেকট্রনের দূরত্বের বর্গের সাথে ব্যস্তানুপাতিক। গ্রহব্যবস্থায় এক একটি গ্রহ নিরন্তর একই কক্ষপথে অবস্থান করে, কিন্তু পরমাণু ব্যবস্থায় বিভিন্ন সময়ে ইলেকট্রন বিভিন্ন সম্ভাব্য কক্ষে অবস্থান করতে পারে। প্রোটনকে কেন্দ্র অনুমোদিত (Permitted) কক্ষগুলির ব্যাসার্ধ পূর্ণ সংখ্যার বর্গের সমানুপাতিক। ক্ষুদ্রতম কক্ষের ব্যাসার্ধ প্রায় এক আঙ্‌স্ট্রম দৈর্ঘের অর্ধেক ($10^{-8}Cu=1Å$)। যতক্ষণ কোন ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষেই আবর্তন করে, ততক্ষণ পরমানু কোন তেজ গ্রহণ বা বর্জন করে না। প্রোটনের আকর্ষণ অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর কক্ষে উত্তীর্ন হবার উপযুক্ত পরিমান তেজ ইলেকট্রনের উপর বর্ষিত হলেই পরমানু সেই পরিমান শক্তি গ্রহণ করে। ফলে ইলেকট্রন বৃহত্তর কক্ষে উন্নীত হয়। তৎক্ষণাৎ আবার সেই ইলেকট্রন পূর্ব কক্ষপথে ফিরে গিয়ে গৃহীত শক্তিকে বিকীর্ণ করে দেয়। বিশদভাবে পরমানু সংক্রান্ত তত্ত্বগত মূলক গবেষণা কার্যে তিনি আলবার্ট আইনষ্টাইনের সংগে প্রিন্সটনের "ইনষ্টিটিউট ফর এ্যাডভান্স ষ্টাডি"তে (Institute for advance study) মিলিত হন। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদের কাছে ইউরেনিয়াম পরমানু বিভাজনের যে সংবাদ তিনি লাভ করেন, প্রিন্সটনে অবস্থান কালে তিনি সেই সংবাদ সেখানকার বৈজ্ঞানিক মহলে পরিবেশন করেন। অতিপরমানবিক বিভাজনের এই আবিষ্কারের ফলেই পরমানু বোমা তৈরি সম্ভব হয়েছে।

---
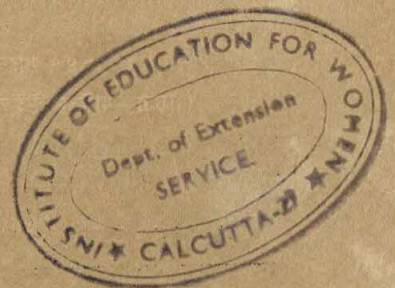
**ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক্ (Max Planck)**

ডেনমার্কের অন্তর্গত সামুদ্রিক বন্দর কিয়েল-এর (Kiel) এক জার্মান পরিবারে ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্কের জন্ম। তিনি ছিলেন থার্মোডিনামিক্স্ (Thermodynamics) বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞ। আলো এবং তাপ পরস্পরের সংগে সম্পর্কিত; এরা শক্তির দুটি ভিন্ন রূপ মাত্র। প্ল্যাঙ্ক এই আলো-তাপ সংক্রান্ত এক নতুন তত্ত্বের সৃষ্টি করেন, যা কোয়াণ্টাম তত্ত্ব (Quantum theory) নামে খ্যাত। কোনো বস্তুকে উত্তরোত্তর উত্তপ্ত করলে বস্তু থেকে প্রথমে লাল, তারপর ক্রমশঃ কমলা, হল্‌দে এবং অবশেষে সাদা রং-এর আলো নির্গত হ'তে থাকে। আতপ্ত বস্তুর বিকীর্ণ তেজের সংগে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এবং তাপমাত্রার সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন স্থানে নানা গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গাণিতিক উপায়ে প্ল্যাঙ্ক এমন একটি সমীকরণ উদ্ভাবন করেন, যা পরীক্ষালব্ধ সকল তথ্যকে সিদ্ধ করে। তাঁর মতে, বিকীর্ণ তেজ নিরবচ্ছিন্ন নয়, পুঞ্জাকার। তিনি এই তেজপুঞ্জের নাম দিয়েছেন "কোয়াণ্টা" (Quanta)।

$E = h\nu$, $h$ = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক (Planck's constant)
$= 6.62 \times 10^{-27}$.
$\nu$ = বিকীর্ণ তেজের কম্পাঙ্ক।

আইনষ্টাইন প্রমান করেছেন, এই 'কোয়াণ্টাম তত্ত্ব' আলোক-তড়িতের (Photo-electricity) কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট ব্যাখ্যা করতে পারে। এই আলোকপুঞ্জ যখন কোনো ধাতুখণ্ডে আপতিত হয়, তখন ধাতু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয়। আপতিত আলোর তীব্রতা বাড়লে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে যায়। আলো যদি তরঙ্গাকার হয়, তবে আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির সংগে সংগে নির্গত ইলেকট্রনের সংখ্যাবৃদ্ধি না ঘটে' ইলেকট্রনের গতিবেগ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

এই সময় থেকেই প্ল্যাঙ্ক এবং আইনষ্টাইন পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানীদের মনোযোগের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হন।

বিজ্ঞানের দরবারে এমন কী ছিলো প্ল্যাঙ্কের অবদান যা বিজ্ঞানীদের বিস্মিত করেছে? বিখ্যাত ডাচ্ বিজ্ঞানী হেনড্রিক এ লোরেঞ্জ বলেছেন, "আমরা আজ এতদূর এগিয়ে এসেছি যে, প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক কেবল মাত্র যে বিকীর্ন তেজের প্রাবল্য এবং এই ধ্রুবক কর্তৃক সর্বাধিক মান নির্দ্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘের ব্যাখ্যার ভিত্তি রচনা করেছে তাই নয়, কঠিন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ, আলোর আলোক-রাসায়নিক ক্রিয়া (Photochemical effect), ইলেকট্রনের কক্ষপথ, বর্ণালীর বর্ণরেখার তরঙ্গদৈর্ঘ, নির্দ্দিষ্ট গতিবেগ সম্পন্ন ইলেকট্রনের আঘাতপ্রসূত রয়েণ্টগেন রশ্মির কম্পাঙ্ক, গ্যাসের অনুদের ঘূর্ণানুক্রম গতিবেগ, কেলাস গঠক বস্তুকণার মধ্যস্থিত দূরত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে গুনগত সম্পর্ক বর্তমান তাও ব্যাখ্যা করছে।"

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে বর্তমান পরমানবিক বিজ্ঞানের মূলে রয়েছে প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব। বস্তুকণা কিংবা তরঙ্গগতির মাধ্যমে শক্তির স্থানান্তর করা যেতে পারে। ইলেকট্রন, পজিট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন প্রভৃতি সাধারণতঃ বস্তুকণা হিসাবে পরিগণিত হয়। একস্-রশ্মি, গামা-রশ্মি প্রভৃতিকে তরঙ্গ হিসাবে গণ্য করা হয়।

তরঙ্গের বৈশিষ্ট হলো তার কম্পাঙ্ক, বিস্তারের গতিবেগ এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ। সমস্ত তরঙ্গগতির সংগে সংশ্লিষ্ট হলো প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং ব্যতিচার।

১৯০০ খৃঃ প্ল্যাঙ্ক এই তরঙ্গ তত্ত্বের বিরোধিতা করে' এক বৈপ্লবিক ধারণার সৃষ্টি করলেন যে, তড়িচ্চুম্বকীয় তেজ গ্রহণকারী এবং নির্গতকারী বস্তুর শক্তি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরিবর্তন করা যায় না। আলোক কণিকা (Photon) বা কোয়াণ্টাম নামে পরিচিত মৌলিক এককের অখণ্ড গুণিতক হিসাবে শক্তির পরিবর্তন সম্ভব এবং এই শক্তির পরিমান বিকীর্ণ তেজের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে।

**বস্তুকণার তরঙ্গ প্রকৃতি**

তড়িৎচুম্বকীয় তেজের প্রকৃতি ফ্রান্সের দ্য ব্রগলির মনে বস্তুকণা সম্পর্কেও এক অনুরূপ ধারণার সৃষ্টি করে। তত্ত্বগতভাবে তিনি বস্তুকণার তুল্য তরঙ্গদৈর্ঘ্য গণনা করেন :—

$$\lambda = \frac{h}{mv}.$$

এখানে $h$ = প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক,

$v$ = ইলেকট্রনের গতিবেগ,

$\lambda$ = তড়িৎচুম্বকীয় তেজের তরঙ্গ দৈর্ঘ।

এই সূত্র থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে, সমস্ত বস্তুই তরঙ্গে গঠিত। আমরা যে জগতে বাস করি তাকে বলা যেতে পারে তরঙ্গজগত বা বস্তুকণাজগত।
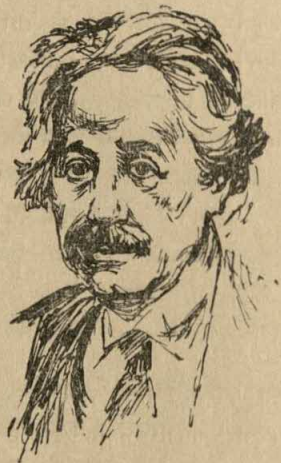
**আলবার্ট আইনষ্টাইন (Albert Einstein)**

বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্ ছিলেন আইনষ্টাইন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে জার্মানীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বীজগণিত ও জ্যামিতি বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো অপরিসীম। জ্যামিতির প্রতিপাদ্যগুলি প্রমান করতে যে বিশেষ ধারা অবলম্বন করা হয়, যে যুক্তিপারম্পর্য রক্ষিত হয়, সেগুলি শৈশবেই তাঁকে মুগ্ধ করেছিলো।

সুতরাং প্রথম জীবনে তিনি স্থির করেছিলেন, গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞান অধ্যয়নেই তিনি জীবন নিয়োজিত করবেন। পলিটেকনিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ আইনষ্টাইনের গাণিতিক দক্ষতা লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হন এবং সেই বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এখানকার শিক্ষন রীতি আইনষ্টাইনের কাছে খুবই আকর্ষণীয় ছিলো,—কারণ, অধীত বিষয় সম্পর্কে এখানে ছাত্রদের চিন্তাশক্তি বিকশিত করবার চেষ্টা করা হতো। শিক্ষকেরা সাগ্রহে নানা ধরনের আলোচনা ক'রে ছাত্রদের সাহায্য করতেন। আইনষ্টাইন এখানেই পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক হ'তে মনস্থ করেন। পরবর্তীকালে সুইজারল্যাণ্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছিলেন ব'লে তাঁকে এখানে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়নি। বার্ণ (Berne) শহরে তিনি একটি সুইস্ পেটেণ্ট (Swiss Patent) অফিসে পরীক্ষকের চাকরী গ্রহণ করেন।

**আপেক্ষিতাবাদ**

পেটেণ্ট অফিসে চাকরী করতে করতেই ১৯০৫ খৃঃ তিনি এক নতুন আপেক্ষিতাবাদ (Special theory of relativity) সৃষ্টি করেন। আইনষ্টাইনের এই নূতন তত্ত্বের পূর্ব পর্যন্ত সমস্ত পদার্থবিজ্ঞানের মূলে ছিল নিউটনের গতিসূত্র। এই গতিসূত্রের উপর ভিত্তি করেই পদার্থবিদ্যার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর মিলতো। কিন্তু ক্রমশ কতকগুলি জটিলতা দেখা দিতে লাগলো। যেমন চলন্ত কোন উড়োজাহাজ থেকে গতিমুখে রকেট নিক্ষেপ করলে নিউটনের সূত্রানুযায়ী রকেটের মোট গতিবেগ হবে রকেটের নিজস্ব গতিবেগ এবং উড়োজাহাজের গতিবেগের সমষ্টি। সুতরাং এই গতি সূত্রানুযায়ী চলমান প্রভব থেকে নির্গত আলোর

বেগ বেড়ে যাবে যদি আলো চলমান প্রভবের দিকেই ধাবিত হয় এবং বিপরীত মুখে গেলে এই গতিবেগ যাবে কমে। কিন্তু আন্নাপোলিসের "যুক্তরাষ্ট্রীয় নাভাল আকাদেমির" শিক্ষক একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী এ. এ. মাইকেলসন বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে আলোর গতিবেগ নিউটনের গতিসূত্র মেনে চলে না।

### আলোর অপরিবর্তনীয় গতিবেগের নীতি

মাইকেলসনের পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে আইনষ্টাইন নতুন ভাবে চিন্তা সুরু করলেন এবং এক নতুন বক্তব্য উপস্থিত করলেন। এই বক্তব্য অনুযায়ীঃ আলোর গতিবেগ প্রভব এবং গ্রাহকের গতিবেগের উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ প্রভবের গতিবেগ যাই হোক না কেন, নির্গত আলোক রশ্মি সচল কিংবা অচল যে কোন দর্শকের কাছে সমবেগে ধাবিত হবে। এই হলো আলোর অপরিবর্তনীয় গতিবেগের নীতি। এই বক্তব্য অনুযায়ী স্থির অবস্থার ঘড়ির তুলনায় গতীয় অবস্থার ঘড়ির সময় হবে মন্হর। অর্থাৎ স্থির অবস্থায় স্থিত ঘড়ি যে সময় নিদের্শ করবে চলমান বস্তুর সংলগ্ন ঘড়ি নিদের্শ করবে তার চেয়ে কম সময়। সচল ব্যবস্থার সংগে যুক্ত অনুরূপ ভাবে দৈর্ঘ পরিমাপক দণ্ডের দৈর্ঘও নির্ভর করে গতিবেগের উপর। বিভিন্ন গতিবেগে একই বস্তুর দৈর্ঘও হবে বিভিন্ন। চলমান বস্তুর গতিবেগ বেড়ে গেলে বস্তু সংলগ্ন ঘড়ির সময় মন্হর হয়ে আসে আর গতিমুখ বরাবর পরিমাপক দণ্ডের দৈর্ঘ-সংকোচন হয়। সময় ও দৈর্ঘের এই পরিবর্তন কোন যান্ত্রিক অবস্থাগত নয়। কারণ সমবেগ সম্পন্ন ব্যক্তি ঘড়ির এবং দৈর্ঘমাপক দণ্ডের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করবে না। কেবলমাত্র চলমান ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্থির ব্যক্তির কাছেই এই পরিবর্তন লক্ষনীয়।

### আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ

সচল ব্যবস্থার গতিবেগ যতই বৃদ্ধি পাবে সময় এবং দৈর্ঘের ততই সংকোচন হবে। কোন দৈর্ঘমাপক দণ্ডের গতিবেগ যদি আলোর গতিবেগের শতকরা নব্বুই ভাগ হয়, তবে দণ্ডটিও এক তৃতীয়াংশ সংকুচিত হয়ে যাবে। তারপর সংকোচনের হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দণ্ডটি আলোর গতিবেগ অর্জন করলে তার দৈর্ঘও হারিয়ে ফেলবে। তেমনি আলোর গতিবেগ সম্পন্ন ঘড়িও কোন সময় নির্দেশ করবে না। সুতরাং কোন বস্তুরই গতিবেগ আলোর গতিবেগ অতিক্রম করতে পারেনা। "এই বিশ্বজগতে সকল গতিবেগের সর্বোচ্চ সীমা হলো আলোর গতিবেগ।"

$L = L_0\sqrt{1-v^2/c^2}$ $L$ = সচল বস্তুর দৈর্ঘ

$L_0$ = বস্তুটির স্থির অবস্থায় দৈর্ঘ

$V$ = বস্তুটির গতিবেগ

$C$ = আলোর গতিবেগ।

মোটর, উড়োজাহাজ কিংবা ভি-২ রকেটের গতিবেগ আলোর তুলনায় সামান্য বলে' সময়ের মন্হরতা একেবারেই নগণ্য। এই গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুল্য হলেই কেবল সম্ভব এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে, আলোর গতিবেগের নিকটবর্তী বেগে ধাবমান ব্যক্তির হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ মন্হর হবে। কিন্তু

যেহেতু তার ঘড়িও সেই অনুপাতে মন্হর হয়ে যাবে সেই ব্যক্তির কাছে হৃদ্স্পন্দনের মন্হরতা অনভূত হবে না।

$E = mc^2$

ইতিপূর্বেই ভরের শক্তিতে রূপান্তরের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে; আলোর অপরিবর্তনীয় গতিবেগের নীতি থেকেই আইনষ্টাইন ভরের শক্তিতে রূপান্তরের সূত্রটিও উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন। এই সূত্র থেকেই প্রথম সূর্যশক্তির উৎসের ব্যাখ্যা পাওয়া গেলো। সূর্যকে যদি জ্বালানির যোগানের উপর নির্ভর করতে হতো, তবে এতদিনে সূর্য সমস্ত তাপ হারিয়ে শীতল বস্তুতে রূপান্তরিত হতো। কিন্তু, আইনষ্টাইনের সূত্র $E = mc^2$ অনুসারে, সূর্যের ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে দীর্ঘকাল ধরে তেজ বিকিরণ করছে এবং অনাগত আরো কোটি কোটি বছর ধরে একইভাবে তেজ বিকিরণ করতে থাকবে।

ভৌত জগতের বলবিদ্যার তত্ত্বগুলি প্রকাশ করবার জন্য যে এককগুলির প্রয়োজন, তারা হলো সময়, দূরত্ব, এবং ভর। যেহেতু সময় ও দূরত্ব পরস্পর-সম্পর্কান্বিত, সুতরাং গতিশীলতার উপর ভরের নির্ভরতা আশা করাও স্বাভাবিক।

$$M = \frac{M_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}, \qquad E = mc^2,$$

M = সচল অবস্থায় বস্তুর ভর,

$M_0$ = অচল অবস্থায় বস্তুর ভর,

E = শক্তি,

V = বস্তুটির গতিবেগ,

C = আলোর গতিবেগ।

বস্তু যখন তার ভর হারিয়ে আলোর গতিতে ছুটে চলে, তখন তাকে বলা হয় তেজ বা শক্তি; অপরপক্ষে, শক্তি যখন নবরূপে দানা বাঁধে, তাকে বলা হয় বস্তু।

**সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্ব**

মহাকর্ষ এবং তড়িচ্চুম্বক—হলো এই মহাবিশ্বের দুটি মৌলিক বল। এই দুটি বলের ক্ষেত্রকে সমন্বিত করার তত্ত্বই হলো "সমন্বিত ক্ষেত্র তত্ত্ব" বা "য়ুনিফাইড ফিল্ড থিয়োরী" (Unified field theory)। এই তত্ত্ব নিয়ে আইনষ্টাইন পঁচিশ বছরেরও উপর গবেষণারত ছিলেন। তাঁর মতে সমস্ত বস্তুই পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণুরা আবার গঠিত তড়িৎ কণা দিয়ে। মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে এক আশ্চর্য মিল দেখা যায়। সূর্যের মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে যেমন গ্রহগুলি ঘূর্ণ্যমান, পরমানবিক কেন্দ্রেস্হিত অতিপরমানুর তড়িচ্চুম্বকীয় বলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ-ভাবেই ইলেকট্রনগুলি ঘূর্ণ্যমান। এই পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক বিশেষ। সূর্যের এবং অন্যান্য নক্ষত্রেরও চুম্বকক্ষেত্র বিদ্যমান। প্রোটন ধনাত্মক এবং ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎ দিয়ে গঠিত। আবার সম তড়িতে বিকর্ষণ এবং বিষম তড়িতে আকর্ষণ হয়। সুতরাং সমতড়িত সম্পন্ন প্রোটন কিংবা ইলেকট্রনের মধ্যে পরস্পর বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। কিন্তু মিলিত প্রোটন ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রনদের আপন কক্ষপথে আবদ্ধ রেখেছে।

আইনষ্টাইন ছিলেন ধর্মচেতা ব্যক্তি। তিনি যেমন জগতকে বিশ্বাস করতেন, তেমনি বিশ্বাস করতে জগতস্রষ্টাকে। তাঁর রচনার এক জায়গায় আছে, "আমি বিশ্বাস করিনা যে ঈশ্বর জগতকে নিয়ে পাশা খেলেন।" সঙ্গতিপূর্ণ শৃঙ্খলাবদ্ধ জগতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। জিজ্ঞাসু মানুষ একদিন সত্যে উপনীত হবে এ সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। এই বিশ্বাসই তাঁকে নিয়ে গেছে নক্ষত্রের জগত অতিক্রম করে সময় ও শূন্যের গভীরে।

---

**হাইসেনবার্গ (Heisenberg)**

হাইসেনবার্গ হলেন একজন স্বনামধন্য জার্মান বিজ্ঞানী। তাঁর খ্যাতির মূলে হলো "অনিশ্চয়তার নীতি" (Principle of uncertainty)। এই নীতি সৃষ্টি ক'রে তিনি পদার্থবিদ্যায় এক যুগান্তর রচনা করেন। তা ছাড়া "কোয়াণ্টাম তত্ত্ব", পরমাণুর গঠন রীতি, "জীমান এফেক্ট" (Zeeman effect) এবং "কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা" (Quantum mechanics) প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনন্য-সাধারণ। ১৯০১ খৃঃ জার্মানীর অন্তর্গত দুইস্‌বুর্গে (Duisburg) তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন একজন অধ্যাপক। তত্ত্বগত পদার্থ বিজ্ঞান নিয়েই হাইসেনবার্গ গবেষণা করেন। ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করে তিনি কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। অতঃপর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করে তিনি "ম্যাক্‌স প্ল্যাঙ্ক ইনষ্টিটিউটে"র (Max Planck Institute) অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

হাইসেনবার্গের "অনিশ্চয়তার নীতি" আজ প্রত্যেক পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে সুপরিচিত। "কোয়াণ্টাম তত্ত্বের" উপর তাঁর গবেষণা পরমানবিক এবং অতি-পরমানবিক পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতিকে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত করেছে।

হাইসেনবার্গ প্রমান করে দেখান কোন পরীক্ষাই সম্পূর্ণ নির্ভুল হতে পারেনা। পরীক্ষিত বস্তু যতবেশি ক্ষুদ্র হবে তার অবস্হানগত পরিমাপ ততই

অনিশ্চিত হয়ে উঠবে। তাঁর কারণ হলো এই যে সূক্ষ্মতম নিরীক্ষণ যন্ত্রও পরীক্ষিত বস্তুর অবস্থান কিংবা তার প্রকৃতি পরিবর্তিত করে দেয়। পরমানু জগতে তাই এই "অনিশ্চয়তার নীতি" পরীক্ষার এক অলঙ্ঘ্য সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। এই সীমা ছাড়ালে পরীক্ষা অর্থহীন হয়ে উঠবে। সুতরাং কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি বস্তুকণার অবস্থান ও গতিবেগ যুগপৎ নিশ্চিত ভাবে বলা যেতে পারে না। কেবলমাত্র বহুসংখ্যক বস্তুকণার পরিসাংখ্যিক (Statistical) প্রকৃতি নিরূপন করা যেতে পারে।

কোয়াণ্টাম বলবিদ্যা, পরমানবিক পদার্থবিজ্ঞান এবং মহাজাগতিক রশ্মি সম্পর্কে তিনি বহু মূল্যবান গ্রন্থ এবং নিবন্ধ রচনা করেছেন।

---

শ্রোয়েডিঙ্গার (Schrodinger)

শ্রোয়েডিঙ্গার পরমানবিক পদার্থবিদ্‌দের অন্যতম। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধি "ওয়েভ-মেকানিকসের" (Wave mechanics) উপর গবেষণা মূলক কাজের জন্য। কোয়াণ্টাম তত্ত্বের তিনি গাণিতিক রূপ দেন। অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ভিয়েনাতে তাঁর জন্ম। ১৮৮৭ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। ম্যাক্‌স প্ল্যাঙ্কের পরে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপকের পদ তিনিই অলংকৃত করেন। ফরাসী পদার্থবিদ্‌ দ্য ব্রগলির (De Broglie) চিন্তাধারা অনুসরণ ক'রে তিনি গবেষণা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। নীল বরের পরমানুর চিত্র হলো এই যে, পরমানুর কেন্দ্রে রয়েছে একটি অতিপরমানু (Nucleus)। কতকগুলি নির্দিষ্ট কক্ষে ইলেকট্রনগুলি এই অতিপরমানুকে প্রদক্ষিন করছে। ইলেকট্রন যখন এক কক্ষপথ থেকে অন্য কক্ষপথে যায় তখনই পরমানু হয় শক্তি গ্রহণ করে কিংবা পরমানু থেকে তেজ নির্গত হয়। শক্তির এই পরিবর্তন ধারাবাহিকতাবিহীন। পরমানুর তেজবিকিরণহীন বিভিন্ন অবস্থাকেই স্থির অবস্থা বলা হয়। দ্য ব্রগলির "ওয়েভমেকানিকস" তত্ত্ব বা বস্তুতরঙ্গ বরের পরমানুর এই চিত্রের কিছু পরিবর্তন সাধন করে। বস্তুতরঙ্গ অনুযায়ী প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনের অনুষঙ্গী হলো একটি তরঙ্গ যার তরঙ্গ দৈর্ঘ ইলেকট্রনের কক্ষপথের দৈর্ঘের অর্ধগুণিতক। শ্রোয়েডিঙ্গার পরমানুর গঠনরীতির

মোনোসেরোস নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত শঙ্কু নীহারিকা
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )
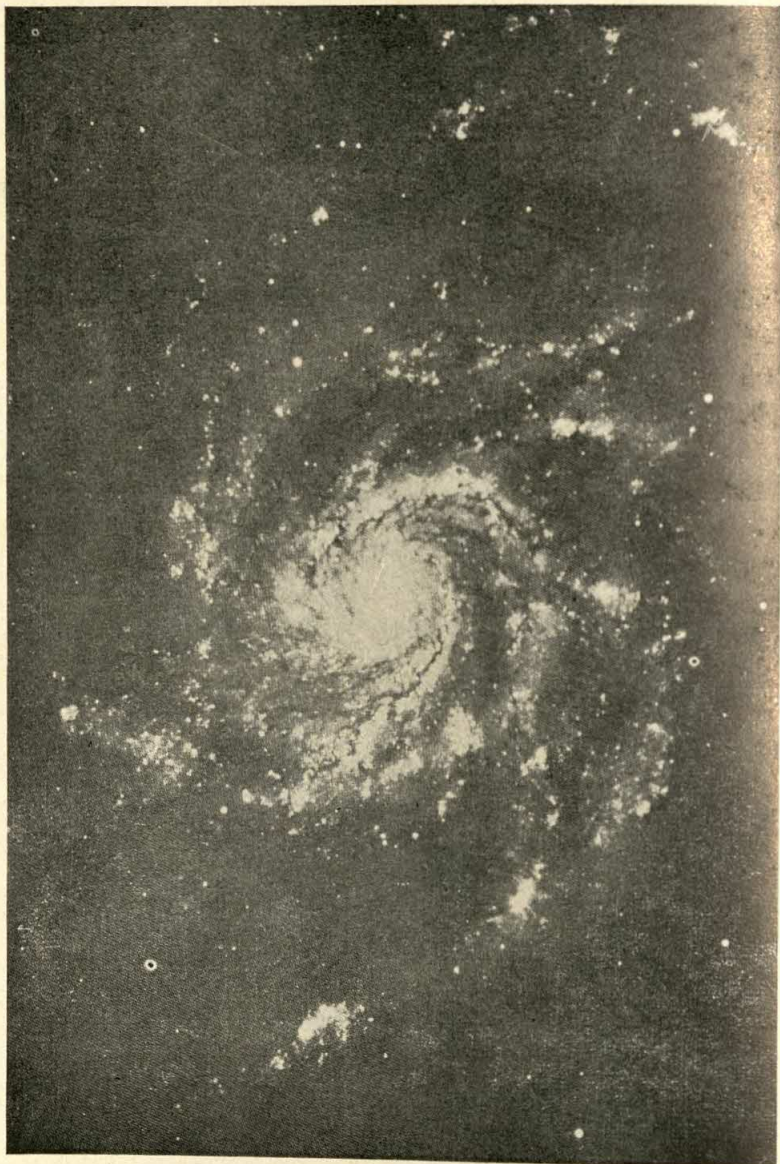
উরসা মেজর নক্ষত্রপুঞ্জের অন্তর্গত কুণ্ডলীচক্র নীহারিকা।
( চিত্র—মাউণ্ট উইলসন ও পালোমার মানমন্দিরের সৌজন্যে )

এই ধারণাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি ধ'রে নিলেন যে ইলেকট্রনের অনুষঙ্গী তরঙ্গগুলির পরস্পর উপরিপাত ঘটা সম্ভব। সুতরাং পরমাণু থেকে যে তেজ নির্গত হয় তার কম্পাঙ্ক এবং ইলেকট্রনের কাক্ষিক কম্পাঙ্ক (Orbital frequency) পরস্পরসম্পর্কিত এবং এই কম্পাঙ্ককে দুই স্থানু তরঙ্গের (Stationary wave) কম্পাঙ্কের পার্থক্য দিয়ে সূচিত করা যায়। এই সব ধারণার গাণিতিক প্রয়োগ পরবর্তীকালে পরীক্ষালব্ধ তথ্যের সাহায্যে সমর্থিত হয়েছে। আইনষ্টাইনের মহাকর্ষতত্ত্ব সম্পর্কেও স্রোয়েডিঙ্গার গবেষণা করেছেন।

স্রোয়োডিংগার ছিলেন একজন বিজ্ঞানমরমী। তাই তাঁর জিজ্ঞাসাও ছিল বিচিত্রমুখী। মৌলিক জীবতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর অপরিসীম আগ্রহ ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি "হোয়াট ইজ লাইফ" (What is life) নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তিনি ভৌতধারণার সাহায্যে জীবনের ঘটনা ব্যাখা করতে চেষ্টা করেছেন।

---

আন্দ্রে ভেসালিয়াস (Andreas Vesalius)

এই সুনামখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জন্ম ব্রাসেল্‌স্‌ শহরে। ১৫১৪ থেকে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি জীবিত ছিলেন। ভেসালিয়াসের সমকালে তাঁর মতো বিরাট চিকিৎসক এবং শরীরবিজ্ঞানী আর কেউ ছিলেন না বললেই চলে। যৌবনকালে তিনি বহু পশুপাখির, বিশেষ করে ইঁদুরের শরীর ব্যবচ্ছেদ ক'রে জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়েছেন। প্রথমে তিনি লুভ্যাঁ (Louvain) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তারপর প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাঁর ছাত্রজীবনের শেষ অধ্যায় কাটে পাদুয়া (Padua) বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরবর্তীকালে পাদুয়াতেই তিনি শারীর তত্ত্ব ও শল্যাবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চিকিৎসা বিষয়ে যে গ্রন্থটি তিনি প্রকাশ করেন, তাতে তিনি গ্যালেনের ভুলভ্রান্তির সমালোচনা ক'রে গেছেন। কিন্তু, কাজটি তৎকালীন আইনের চোখে অপরাধ ব'লে গণ্য হয় এবং ভেসালিয়াসের পদচ্যুতি ঘটে। তখন, বেলজিয়াম ত্যাগ ক'রে স্পেনদেশে গিয়ে তিনি চিকিৎসা

ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তাঁর মনোভাব ছিল, মানবশরীর সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান অর্জন করতে না পারলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া বৃথা। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি মনুষ্যদেহের অস্থিসন্ধি জানেনা, সে সেই দেহের কল্যাণসাধন করবে কীভাবে?" এই বিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে তিনি মানবশরীর সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞান অর্জনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। মানুষের শব সহজলভ্য নয় ব'লে, আইনের চোখ বাঁচিয়ে তিনি কবরখানা থেকে মৃতদেহ অপহরণ করতেন। অবশেষে রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের মৃতদেহ সংগ্রহ ক'রে তিনি তাঁর জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করেছেন। অপরের হাতে শব ব্যবচ্ছেদ করবার ভার দিয়ে তিনি খুশি হতেন না—স্বহস্তে ব্যবচ্ছেদ ক'রে দেখতে না পারলে তাঁর তৃপ্তি হ'তো না। সমসাময়িক অন্যান্য চিকিৎসকদের তিনি তীব্রভাবে সমালোচনা ক'রে গেছেন। সে যুগে, পথ্যবিধান করতো নার্সেরা, ঔষধ প্রস্তুত করতো ঔষধবিক্রেতারা, শল্যবিদ্যা প্রয়োগ করবার ভার ছিল নাপিতের উপর। সুতরাং রোগীর সম্পর্কে চিকিৎসকের কোনো করণীয় ছিলনা। চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব চিকিৎসকের হাতে ফিরিয়ে আনবার জন্য তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে যে গ্রন্থটি রচনা ক'রে গেছেন, সেটির চিত্রাঙ্কনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ক্যালসার (Jan Stephen Van Calcar)। চিত্রাঙ্কনের কাজটি এমন নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল যে, গ্রন্থটি আজো চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি অমূল্য সম্পদ্ ব'লে পরিগণিত হয়। মানবদেহের অভ্যন্তরের এই চিত্রগুলি যেমন নিখুঁত, তেমনই বাস্তব।

---
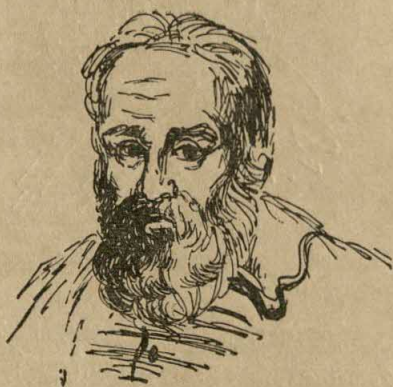
গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei)

আধুনিক প্রায়োগিক বিজ্ঞানের প্রবর্তক হিসাবে গ্যালিলিও-র প্রসিদ্ধি। তিনিই প্রথম দূরবীনের সাহায্যে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা তথ্য আবিস্কার করেন। ১৫৬৪ সালে এক ইতালীয় পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন একাধারে জ্যোতির্বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, দক্ষ সংগীতশিল্পী এবং চিত্রকর। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। গ্যালিলিও-ই প্রথম পতনশীল বস্তু সম্পর্কে আরিস্টটলের তত্ত্বের বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন। আরিস্টটলের বক্তব্য ছিল, ক্ষুদ্র বস্তুর তুলনায় বৃহৎ বস্তু তাড়াতাড়ি মাটির দিকে নেমে আসে। পক্ষান্তরে,

গ্যালিলিও বললেন, ছোট হোক, বড়োই হোক, সকল বস্তুর সমান উচ্চতা অতিক্রম ক'রে মাটিতে নেমে আসতে একই সময় লাগে। এই মতবাদ প্রচারের অপরাধে তিনি গীর্জাতন্ত্রের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তৎকালীন ইউরোপীয় বিজ্ঞানীমহলে অপাঙ্‌ক্তেয় বিবেচিত হন। অবশেষে পিসা নগরীর এক বিদ্বজ্জনসভায় তিনি স্বীয় মতবাদ পরীক্ষার সাহায্যে প্রমান করেন। তিনি এমন সাফল্যের সংগে তাঁর প্রমান উপস্থাপিত করেছিলেন যে, উপস্থিত বিদ্বজ্জনমণ্ডলী তাঁর মতবাদ স্বীকার করতে বাধ্য হন। গ্যালিলিও এইভাবে নিজের লুপ্ত সুনাম পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। পুনর্বার, নানা বিষয়ে তাঁর গবেষণার কাজ অব্যাহত গতিতে চলতে লাগলো। পিসা নগরীর ক্যাথিড্রালের ঘড়ির দোলকের দোলনকাল তাঁর লক্ষ্যগোচর হ'লো। প্রত্যেকটি দোলন যে একই সময়ে ঘটছে এ তথ্য তাঁর অজ্ঞাত রইলো না। এ থেকে দোলকের দোলনকাল সম্পর্কিত সূত্র আবিস্কৃত হ'লো। রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুধাবন করবার জন্য তিনি দোলক ব্যবহারের প্রস্তাব করেছিলেন। পিসা নগরীর প্রসিদ্ধ হেলানো গম্বুজ থেকে তিনি উপস্থিত অধ্যাপক ও ছাত্রমহলের সামনে ভিন্ন ওজনের বস্তুর সম উচ্চতা অতিক্রম করতে যে একই সময় লাগে এই তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিত করেন। সৌরমণ্ডল সম্পর্কে গ্যালিলিও কোপার্নিকাসের তত্ত্বের অনুগামী ছিলেন এবং আরিস্টটলের বিরুদ্ধমত পোষণ করতেন। গ্যালিলিও প্রথমে ত্রিগুণ বিবর্ধক দূরবীন আবিষ্কার করেছিলেন। শেষপর্য্যন্ত তিনি দূরবীনের বিবর্ধন ক্ষমতা বত্রিশগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গ্রহ ও নক্ষত্র যে ভিন্নপ্রকৃতির আকাশচারী বস্তুপিণ্ড, এ তথ্য তিনি দূরবীনের সাহায্যে জানতে পারেন। বরং চাঁদের সংগে গ্রহগুলির মিল আছে; কারণ, চাঁদের মতো গ্রহগুলির আলোও অন্য উৎস থেকে ধার করা। গ্যালিলিও অনুধাবন করেছিলেন, নক্ষত্রগুলি এমন সব জ্যোতিকণার সমষ্টি যা থেকে সবদিকে আলোকরশ্মি নির্গত হয়। বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির মধ্যে চারটি গ্যালিলিও-র দূরবীনে ধরা পড়ে। চাঁদের অন্ধকার পিঠটিও তাঁর অগোচর ছিল না। গ্যালিলিও সিদ্ধান্ত করেছিলেন, অন্য সব গ্রহগুলির মতো আমাদের পৃথিবীও যে আলো প্রতিফলিত করে তা সূর্য্য থেকে পাওয়া।
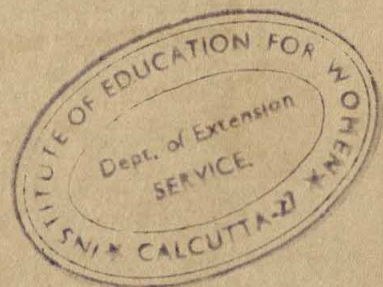
এনরিকো ফের্মি (Enrico Fermi)

এনরিকো ফের্মি হলেন একজন খ্যাতনামা পরমানু বিজ্ঞানী। তিনিই প্রথম "পরমানবিক পাইল" (Atomic pile)-এর পরিকল্পনা রচনা করেন এবং ১৯৪২ খৃঃ অতি-পরমানুর "শৃংখল বিক্রিয়া" (Chain reaction) সম্ভব করে তোলেন। পরমানবিক বোমা উৎপাদনে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউ, এস, এ, ই, (U.S.A.E.) কর্তৃক তিনি পুরস্কৃত হন। তাঁর জন্মস্থান হলো ইতালীর রোম নগরীতে। ১৯০১ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৩৪ খৃঃ তিনি দেখান, নিউট্রন বর্ষণ ক'রে যে কোন মৌলিক বস্তুরই অতি-পরমানবিক রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। বিভিন্ন উপাদানে নিউট্রন বর্ষণ ক'রে তিনি দেখেন যে তেজস্ক্রিয় পরমানু সৃষ্টির জন্য মন্হরগতি নিউট্রনই সবচেয়ে কার্যকর। তাঁর এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী ছিল। কারণ পরবর্তীকালে এই মন্হরগতি নিউট্রনের সাহায্যেই তিনি ইউ-২৩৫ পরমানুর বিভাজন সম্ভব করেছিলেন।

১৯৩৮ খৃঃ ফ্যাসিস্ট কবল থেকে পালিয়ে এসে তিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই বসবাস সুরু করেন। তাঁকে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করা হয়। এইখানেই তিনি আবিষ্কার করেন যে নিস্তারিং হওয়ার জন্য নিউট্রন অতি-পরমানবিক রূপান্তরের পক্ষে খুবই কার্যকর।

ফের্মিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে নিউট্রনবর্ষিত যে সব উপাদানে অতি-পরমানবিক রূপান্তর সৃষ্ট হয়, ইউরেনিয়াম তাদের মধ্যে অন্যতম। মাইস্নার (L. Meitsner) এবং অটো হান (Otto Hahn) ইউরেনিয়াম নিয়ে বার্লিনে বিস্তৃত গবেষণা চালান। ১৯৩৮ খৃঃ অটো হান এবং এফ স্ট্রাসমান (F. Strassman) দেখেন যে বিধ্বস্ত ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন উপাদানগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটি হলো বেরিয়ামের (Barium) আইসোটোপ (Isotope)। অটো ফ্রিশ্ (Otto Frisch) এবং মাইসনার

এবং দুই সপ্তাহকাল পরে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই হান্ এবং স্ট্রাসমান এই ঘটনাকে ইউরেনিয়াম অতি-পরমানুর দুই সমান অংশে ভেঙ্গে যাওয়া হিসাবে সূচিত করেন। অতি-পরমানুর এই ভেঙ্গে যাওয়া প্রক্রিয়ার নামই হলো বিভাজন (Fission)।

প্রোটনে থাকে একটি ধনাত্মক আধান আর নিউট্রন হলো নিস্তড়িৎ। ফলে জড়বস্তুর ভিতর দিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এই দুই বস্তুকণিকার মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য দেখা দেয়। দ্রুতবেগসম্পন্ন প্রোটনের পথে কোন পরমানু পড়লে, প্রোটনের আঘাতে পরমানু থেকে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং এই প্রোটনের পথে বহুল পরিমানে আয়ন সৃষ্টি হতে থাকে। নিউট্রন নিস্তড়িৎ হওয়ার ফলে এ জাতীয় আয়ন সৃষ্টি করতে পারেনা—কিন্তু পরমানবিক কেন্দ্রে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে সরাসরি আঘাত করে।

আয়ন সৃষ্টির অক্ষমতার ফলে যতক্ষণ না কোন পরমানুর সংগে সংঘর্ষ হয়, নিউট্রনে শক্তি হ্রাস হয় না। যেহেতু পরমানুর সংগে নিউট্রনের সংঘর্ষ কদাচিৎ ঘটে, শক্তি নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা বিচরণ করতে পারে। ফলে তাদের বিচরণ-পথ হয় দীর্ঘ। কিন্তু আয়ন সৃষ্টি করার জন্য শক্তি ব্যয় হয়ে যাওয়ায় প্রোটনের বিচরণ পথ নাতিদীর্ঘ হয়।

---

**আর্নেষ্ট লরেন্স (Earnest Lawrence)**

লরেন্সই প্রথম "সাইক্লোট্রন" (Cyclotron) তৈরি করেন। অতিপরমানবিক বস্তুকণাকে দ্রুতগতিবেগসম্পন্ন করবার একটি উপায় হলো সাইক্লোট্রন যন্ত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে লরেন্স সাইক্লোট্রন যন্ত্রের সাহায্যেই ইউরেনিয়ামের আইসোটোপগুলি পৃথক করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি "সিনক্রো-সাইক্লোট্রন" (Synchro-cyclotron) তৈরি ক'রে প্রথম কৃত্রিম 'মেসন' (Meson) সৃষ্টি করেন। ১৯০১ খৃঃ দক্ষিন ডাকোটার ক্যান্টন সহরে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে তাঁর

মৃত্যু হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদদের মধ্যে তিনি অন্যতম। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে সাইক্লোট্রন আবিষ্কারের জন্য পদার্থবিদ্যায় তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে (Yale University) গবেষণা করে তিনি পি, এইচ, ডি (Ph.D.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯২৮ খৃঃ তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সহ-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনি সেখান অধ্যাপক এবং ডিরেক্টর হন। অতিপারমানবিক, জীবতাত্ত্বিক এবং ভেষজ সংক্রান্ত পদার্থবিদ্যায় তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ।

---

**অ্যালবার্ট আব্রাহাম মাইকেলসন (Albert Abraham Michelson)**

স্বনামধন্য পদার্থবিদ মাইকেলসন পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আলোকবিজ্ঞানের নানা সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন। বিশেষ ক'রে, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিলো আলোর সঠিক গতি। বিজ্ঞানের অগ্রগতির মূলে তাঁর অবদান এতই ব্যাপক যে, তিনি নিজের প্রতি ও স্বদেশ আমেরিকার প্রতি সমস্ত পৃথিবীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। মাইকেলসনের জন্মভূমি জার্মানী স্ট্রেলনো প্রদেশে। ১৮৫২ থেকে ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের ব্যাপ্তি। সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিদ্‌দের একজন। তিনিই প্রথম আমেরিকান বৈজ্ঞানিক, যিনি নোবেল পুরস্কার অর্জন করেছেন। আবহবিদ্যা ও বর্ণালীবীক্ষণ বিষয়ে তাঁর চমকপ্রদ আবিষ্কারের জন্য ১৯০৭ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার দান করা হয়। তাঁর পিতামাতা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং ভার্জিনিয়া শহর ও সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কো প্রদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। মাইকেলসন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে স্নাতক হন এবং ১৮৭৫ থেকে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত সেখানেই পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮০ থেকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বার্লিন ও হাইডেলবার্গ শহরে, 'কলেজ দ্য ফ্রান্স' শিক্ষায়তনে এবং প্যারিসের 'একলে (Ecole) পলিটেকনিক' বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি নৌ-শিক্ষাকেন্দ্র থেকে পদত্যাগ

করেন। ১৮৮৩ সালে ওহিও প্রদেশের ক্লীভল্যাণ্ড শহরে ফলিত বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিদ্যালয় 'কেস স্কুল'-এ পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ছয় বছর পরে তিনি উর্‌চেষ্টার-এর ক্লার্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুরূপ একটি পদ অলংকৃত করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে নবগঠিত শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক এবং পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ের প্রধান নিযুক্ত হন।

প্রথমদিকে মাইকেলসনের গবেষণার বিষয় ছিলো আলোর গতি; পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যতিচার-যন্ত্র (Interferometer) নামে একটি নতুনধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করেন; এই যন্ত্রের সাহায্যে আলোর প্রত্যক্ষ গতির উপর পৃথিবীর ঘূর্ণনের প্রভাব নির্ণয় করা যায়। মাইকেলসন এবং মরলী (Morley) ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে তাঁদের বিখ্যাত পরীক্ষা পরিচালনা করেন—তাঁদের প্রতিপাদ্য ছিলো, যেকোনো অবস্থানেই আলোক সর্বদাই নির্দিষ্ট গতিতে চলে। যে পাঠক বিশদভাবে বিষয়টি জানতে চান, তিনি "মাইকেলসন-মরলী এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট" গ্রন্থটি পাঠ ক'রে নিজের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটাতে পারেন। এই যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাহায্যে যেকোনো দূরত্ব নির্ভুলভাবে নিরূপণ করতে সক্ষম হন। আলোকের গতিসম্পর্কে মাইকেলসনের আবিষ্কার আইনষ্টাইনের 'আপেক্ষিকতাবাদ' তত্ত্বের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ক'রে গেছে।

মাইকেলসনের আর একটি কৃতিত্বপূর্ণ অবদান হলো দৈর্ঘ্যের একটি নির্দিষ্ট একক নির্ণয়। বিভিন্ন মৌলিকপদার্থের বর্ণালীরেখা পর্যালোচনা ক'রে তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, ক্যাডমিয়াম-এর লাল রেখাগুলি সঠিকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব। তাই তিনি দৈর্ঘ্য পরিমাপের নির্দেশক হিসাবে এটিকে গ্রহণ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ওজন ও মাপের আন্তর্জাতিক কমিটি তাঁর নির্দিষ্ট নির্দেশকটি সঠিক ব'লে গ্রহণ করে।
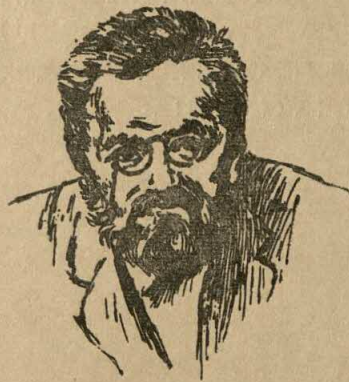
## চার্লস্‌, পি, স্টাইন্‌মেৎস্‌ (Charles P. Steinmetz)

পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহের তত্ত্বের ক্ষেত্রে এবং মনুষ্যসৃষ্ট তড়িতের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই যন্ত্রবিদের নাম সমগ্রবিশ্বে সুপরিচিত। জার্মানীর ব্রেসলাউ শহরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি

জীবিত ছিলেন। ব্রেসলাউ, জুরিখ এবং বার্লিন শহরে শিক্ষা গ্রহণ ক'রে তিনি গণিত, তড়িৎ যন্ত্রবিদ্যা এবং রসায়ন বিষয়ে বিশিষ্টতা অর্জন করেন। সমাজতন্ত্রের প্রতি আসক্তি, দারিদ্রজনিত অক্ষমতা, রাজনীতিগত দুর্ভাগ্য এবং শারীরিক অসুস্থতা ইত্যাদি নানা কারণে তিনি বাধ্য হয়ে দেশত্যাগ ক'রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যান। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে একটি কারখানায় তিনি কর্মসংগ্রহ করেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কারখানাটি "জেনারেল ইলেকট্রিক কোম্পানী" নামক সংস্থার পরিচালনাধীনে আসে এবং স্টাইন্‌মেৎস্‌কে পরামর্শদাতার কাজে নিয়োগ করা হয়। যোগ্যতাবলে তাঁর পদোন্নতি ঘটে এবং শীঘ্রই দেখা গেলো, আমেরিকা মহাদেশে তড়িৎ বিষয়ে স্টাইন্‌মেৎস্‌-এর থেকে বড়ো প্রতিভাশালী ব্যক্তি আর কেউ নেই। তিনি ছিলেন ইউনিয়ন কলেজের অধ্যাপক। তড়িৎবিজ্ঞানে তাঁর তিনটি মহৎ অবদান আছে।

(১) চুম্বকত্ব বিষয়ে নানা ধরনের গবেষণা পরিচালনা ক'রে তিনি হিস্‌টেরিসিস্‌ (Hysteresis)-এর সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন। চুম্বকের অবস্থানের ফলে বৈদ্যুতিক ক্ষমতার যে অংশটির অপব্যয় হয় তিনি সেটি হিসাব করবার সূত্র আবিষ্কার করেন। ক্রমশ তিনি মোটর, জেনারেটার, ট্রান্সফর্মার এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেন।

(২) সেকালে পরিবর্তী তড়িৎ প্রবাহের তত্ত্বগুলি অল্পলোকেরই বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিলো। এই তড়িৎ প্রবাহ পরিমাপ করবার জন্য তিনি একটি প্রতীক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তাঁর এই আবিষ্কারের ফলে পরিবর্ত্তী তড়িৎ-বিষয়ক যন্ত্র প্রস্তুতির দ্রুত প্রসার ঘটে।

(৩) তড়িৎ সম্পর্কিত গবেষণার ফলে তিনি যে তত্ত্বের উদ্ভাবন করেন, সেটির উপর ভিত্তি ক'রে সহজেই তিনি উচ্চ ভোলটেজ চলাচলের পথটি সুরক্ষিত রাখতে পেরেছেন।

যদিও স্টাইন্‌মেৎস-এর বিশেষ পারদর্শিতা ছিলো গণিতে, কিন্তু নানাধরণের যন্ত্র সম্পর্কে তাঁর নামে অন্তত দু'শোটি পেটেন্ট (Patent) ছিলো। তড়িৎ যন্ত্র-বিদ্যা বিষয়ে, বিশেষ ক'রে পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহ সম্পর্কে তিনি অনেকগুলি মূল্যবান্‌ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ক'রে গেছেন।

---

টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison)

টমাস এডিসনই সম্ভবতঃ ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম আবিষ্কারক। মাত্র পঞ্চাশ বছর সময়ের মধ্যে তাঁর নামে এক হাজারেরও বেশি জিনিস "পেটেন্ট" হিসাবে বাজারে চালু হয়েছে। এডিসনের মতে, প্রতিভার সংজ্ঞা হলো, "শতকরা একভাগ অনুপ্রেরণা (Inspiration) এবং বাকি নিরানব্বই ভাগ পরিশ্রম (Perspiration)"। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ওহিও-র মিলান শহরে তাঁর জন্ম। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এডিসনের পিতার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন ওলন্দাজ এবং মায়ের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী।

বাল্যকালে নিতান্ত অল্পকালের জন্য এডিসন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। বারো বছর বয়সে তিনি রেলরাস্তায় সংবাদপত্র বিক্রয় করতেন। পনেরো বছর বয়সের পর থেকে টেলিগ্রাফ অপারেটারের কাজ ক'রে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতে আরম্ভ করেন। সবসময় নানা ধরণের পরীক্ষামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া তাঁর নেশার মতো হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর প্রথম পেটেন্ট বাজারে বার হয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, সেটি হলো তড়িৎচালিত ভোট পরিগণক। এরপর তিনি আবিষ্কার করেন ষ্টক টিকেট, স্বয়ংক্রিয় টেলিগ্রাফ এবং তড়িৎকলম যার থেকে শেষপর্য্যন্ত মিমিয়োগ্রাফের (Mimeograph) উদ্ভব। কার্বন প্রেরক (Carbon transmitter) তাঁরই কীর্তি; এতে এমন সরঞ্জাম আছে যাতে প্রয়োজন অনুসারে রোধ (Resistence) পরিবর্তন করা যায়। টেলিফোন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে কার্বন প্রেরকের অবদান অসামান্য। কার্বন প্রেরকের জন্যই বেল টেলিফোনকে (Bell Telephone) কার্য্যকরভাবে ব্যবহার করা সহজ হয়েছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর কীর্তি হলো স্বরধরযন্ত্রের (Phonograph) প্রবর্তন; এটি হচ্ছে টিনের পাতে মোড়া একখানি চোঙ্, হস্তচালিত ক্র্যাঙ্ক-এর (Crank) সাহায্যে এটিকে চালানো যায়। এর দশবছর পর তিনি মোটরচালিত একটি যন্ত্রের প্রচলন করলেন; এই জনপ্রিয় যন্ত্রটিতে চোঙ্ আকৃতি মোমের রেকর্ড বসানো আছে। পরে এর থেকেই তিনি হীরকবিন্দু সমন্বিত চক্রফলক আবিষ্কার করেন, যার সাহায্যে

একবার যে গান করা হয়েছে, সেটি বারবার বাজানো যায়। ভাস্বর আলো সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, ভাস্বর আলোতে একটি তড়িৎদ্বার ধনাত্মক তড়িতে আহিত হয়। তাঁর এই আবিষ্কারের নামকরণ করা হয়েছে "এডিসন এফেক্ট" (Edison effect)। জন ফ্লেমিং (John Ambrose Fleming) এই আবিষ্কারকে দ্বি-তড়িৎদ্বার বেতার ধারক যন্ত্রে সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। এই যন্ত্রটির নাম ফ্লেমিং ভাল্‌ভ্ (Fleming valve)। বৈজ্ঞানিক ডি-ফরেষ্ট (De Forest) এই যন্ত্রের সংগে আরো একটি তড়িৎদ্বার যুক্ত ক'রে "Vacuum tube amplifier" নামে একটি নতুন যন্ত্রের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে, এই যন্ত্র থেকেই "Vacuum tube oscillator" নামক যন্ত্রের উদ্ভব হয়। আজকাল যে সারা পৃথিবী জুড়ে রেডিয়ো-যোগাযোগ চলছে এবং রাডার ধারক প্রণালী চালু হয়েছে, সে সবের মূলে রয়েছে বিখ্যাত "এডিসন এফেক্ট"।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এমন একটি ভাস্বর-আলোকবর্তিকা প্রস্তুত করেন যার মধ্যে একটি কার্বনিত তুলোর সুতোর লুপ অন্ততঃ চল্লিশ ঘণ্টাকাল দীপ্যমান থাকে। এরপর দশ বছর ধরে তিনি কতকগুলি উন্নয়নমূলক কাজে নিজকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত রাখেন। তড়িৎ, আলোক, তাপ ও শক্তি ইত্যাদি যাতে সুলভে উৎপন্ন ও সহজতর উপায়ে পরিচালিত হয়, তিনি সেজন্যে বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রে গেছেন। তিনি মোটর ও জেনারেটারের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। এরপর তিনি বৈদ্যুতিক রেলপথ গড়ে তোলেন, যাতে ক'রে জিনিসপত্র এবং মানুষকেও বয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত তিনি লৌহখনির ধাতুর ঘনীকরণের (Concentration) জন্য একটি চৌম্বক পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টায় নিমগ্ন থাকেন। ১৯০০ থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত সময়ের ভিতর তিনি একটি নতুন ধরনের তড়িৎ-সঞ্চায়ক কোষ (Storage battery) আবিষ্কার করেন; এই কোষের দ্রবনটি অ্যালকালি-মিশ্রিত, নিকেল হাইড্রেট এটিতে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এবং লৌহ-অক্সাইড ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি আরেকটি পেটেণ্ট বার করেন—সেটি হলো "Kinetescopic Camera"। এটিতে আছে ফিল্মের বাক্সের উপর সচল ছবি তোলবার ব্যবস্থা। ছবি তুলবার জন্য প্রথমে বাক্সটির ভিতর চোখ রাখতে হবে এবং তারপর পর্দায় অভিক্ষেপ ফেলতে হবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের কালে সরকারের পক্ষ থেকে তিনি নৌ-সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হন এবং ফিনাইল ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ প্রস্তুতির কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৭ সালে তাঁকে জাতীয় বিজ্ঞান আকাদেমীর সভ্য হিসাবে নির্বাচিত করা হয়। অন্ততঃ পঞ্চাশ বছর ধরে তিনি নানা ধরনের উন্নয়নমূলক গবেষণার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর অতি আধুনিক ল্যাবরেটারিতে ছিল নানা ধরনের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি, আর ছিলেন হাজার হাজার কর্মী, সমাজের কল্যাণের কাজে যাঁদের অবদান অসামান্য।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন (Benjamin Franklin)

আমেরিকাবাসীদের মধ্যে ফ্রাঙ্কলিনের মতো সর্বতোমুখী প্রতিভা আর দেখা যায়নি। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিক, আবিষ্কারক, দার্শনিক এবং দেশপ্রেমিক। ১৭০৬ খৃষ্টাব্দের সতেরোই জানুয়ারি তারিখে ম্যাসাচুসেট্‌স্‌ প্রদেশের বোষ্টন শহরে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন ইংল্যাণ্ড থেকে এদেশে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর তিনটি সন্তান ছিল। জোসিয়া ফ্রাঙ্কলিন ছিলেন কর্মী পুরুষ। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি পুনর্বার বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাঁর দশটি সন্তান হয়—ছ'টি ছেলে এবং চারটি মেয়ে। ছেলেদের মধ্যে বেঞ্জামিন ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। আট বছর বয়সে বেঞ্জামিন ব্যাকরণ বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তারপর হাতের লেখা এবং গণিতের জন্য তিনি জর্জ ব্রোনেল-এর বিদ্যালয়ে শিক্ষা নিতে সুরু করেন। দশবছর বয়সেই তিনি পিতার ব্যবসায়ে শিক্ষানবিসী আরম্ভ করেন। বৈমাত্র ভাই জেম্‌স্‌-এর মতো বেঞ্জামিন ও ছিলেন মুদ্রক। হাতের কাছে যে-বই পেতেন তাই-ই পড়ে ফেলা ছিল তাঁর অভ্যাস। সতেরো বছর বয়স পর্য্যন্ত তিনি ভাইয়ের সংগে ছিলেন। বোষ্টন শহরে তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, সেটির নাম "The New England courant"। এই পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র আমেরিকায় আলোড়ন প'ড়ে যায়। বেঞ্জামিনের পিতামাতা অথবা ভ্রাতৃবর্গ কেউই তাঁর মতবাদ সমর্থন করেন নি। অবশেষে, সকলের সংগেই তাঁর মনোমালিন্য ঘটে এবং তিনি সকলকে পরিত্যাগ করেন। তিনি নিউ ইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়ায় গিয়ে মুদ্রকের কাজ সংগ্রহ করেন। সেইসময়ে পেন্‌সিলভেনিয়ার গভর্ণর উইলিয়াম কীথ তাঁর প্রকাশিত রচনাগুলি সম্পর্কে অবহিত হন এবং তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন। মুদ্রন সম্পর্কে বিশদ শিক্ষা লাভ করবার জন্য এবং একটি মুদ্রন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কীথ প্রায় জোর করেই বেঞ্জামিনকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মুদ্রনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবার জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করবার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি উইলিয়াম কীথ। ফলে, যৎসামান্য অর্থ সম্বল ক'রে বেঞ্জামিন সেখানে একেবারে একলা পড়ে গেলেন, নির্ভর করবার মতো বন্ধুবান্ধব পর্য্যন্ত তাঁর ছিল না। নিজস্ব ব্যবসাই তখন তাঁর জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল।

তিনি নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে মুদ্রনের কাজ সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং এইভাবে কিছু লোকের সংগে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হলেন। যদি তিনি স্থায়ীভাবে ইংল্যাণ্ডে বসবাস আরম্ভ করতেন, তবে সার্থকভাবে জীবন কাটানো তাঁর পক্ষে কঠিন হতো না। কিন্তু তিনি ফিলাডেলফিয়ায় প্রত্যাবর্তন করাই সাব্যস্ত করলেন। ১৭৩২ সালে তিনি প্রকাশ করেন তাঁর প্রথম গ্রন্থ—"দরিদ্র রিচার্ডের রোজনামচা"। এই গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তাঁর অসীম পাণ্ডিত্য ও ক্ষুরধার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকার উপনিবেশগুলির প্রত্যেক ঘরে ঘরে তাঁর এই অমূল্য গ্রন্থটি স্থান পেলো। মুদ্রনের ক্ষেত্রে তাঁর বিরাট কর্মকাণ্ডের প্রসার ক্রমশ বেড়েই চললো। ধনী ব্যক্তিদের সংগে অংশীদার হিসাবে তিনি অনেকগুলি শহরে সংবাদপত্রমুদ্রন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অবসর সময়ে, তিনি ইতালীয়, স্প্যানিশ, ফরাসী এবং লাতিন ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন। বেঞ্জামিন একটি নতুনধরনের খোলা চুল্লী (Open stove) আবিষ্কার করেন। লিডেন-জার নিয়ে নানা ধরনের গবেষণার কাজ ক'রে তিনি সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তড়িৎ-বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহ থাকার ফলে এবং বুদ্ধি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হওয়ায় তিনি কল্পনা করেন, সাধারণ তড়িৎ এবং আকাশের বিদ্যুতের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তড়িৎ বিষয়ে তিনি একটি নতুন তত্ত্বের প্রবর্তন করেন; তাঁর বক্তব্য ছিল, তড়িতের মধ্যে ভালো এবং মন্দ দুটো দিকই আছে। তড়িৎবিষয়ে তিনি গবেষণার সূত্রপাত করেন ১৭৫২ সালে, আজ থেকে দুশো বছরেরও বেশি আগে। বলা যেতে পারে, পৃথিবীতে তাঁর আগে আর কেউ উক্তবিষয়ে গবেষণার কাজ করেন নি। ঝড়বাদলের দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে তিনি প্রমান করেন, আকাশের বিদ্যুৎ ও সাধারণ তড়িৎ একই বস্তু। বজ্রের বিদ্যুৎ ঘুড়িটিকে আঘাত ক'রে সুতো বেয়ে নিচে ঝোলানো চাবিতে এসে ধাক্কা দেয় এবং ফলে একটি স্ফুলিঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হয়। এরপর তিনি যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করলেন সেটি হলো তড়িৎদণ্ড। ফ্রাঙ্কলিন যে ভাবে তড়িৎঘটিত পরীক্ষা পরিচালনা করেছেন, তাতে যেকোনো সময়ে তাঁর জীবনহানি ঘটতে পারতো। একবার তিনি তড়িতাহত হয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। তড়িতের সাহায্যে একটি টার্কি পাখি মারতে গিয়ে যন্ত্রপাতির কোনো গোলযোগের দরুণ পাখির বদলে তিনি নিজেই আঘাত পান। জ্ঞান ফিরবার পরই তিনি মন্তব্য করলেন: "ভেবেছিলাম টার্কি শিকার করবো, কিন্তু আর একটু হলে হাঁস শিকার ক'রে ফেলতাম।"

ফ্রাঙ্কলিন আবিষ্কার করেন, তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বকগুণসম্পন্ন এবং লৌহখণ্ডকে আকর্ষণ করতে পারে। তড়িৎপ্রবাহের এই ধর্মটিকে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ এবং তড়িৎ-মোটরের ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়েছে। ফ্রাঙ্কলিন ষ্টোভ আবিষ্কার করেন। তিনি আমেরিকার আবহাওয়া পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনিই প্রথম উপসাগরীয় স্রোতের মানচিত্র প্রস্তুত করেন।

রাজনীতিবিদ্ হিসাবে তিনি টমাস জেফারসনকে স্বাধীনতার সনদ প্রস্তুত করতে সাহায্য করেন। সামাজিক নেতা হিসাবে তিনি ফিলাডেলফিয়ার রাজপথগুলির সংস্কার করান এবং কার্যকর নগরশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তনী পাঠাগারের তিনিই প্রথমতম প্রবর্তক।

এ ছাড়াও তিনি ছাপার হরফ এবং কালি প্রস্তুত করেছেন, সার্থকভাবে বই বাঁধানোর ব্যবস্থা প্রচলন করেছেন; তিনি ছিলেন মুদ্রক, লেখক, সম্পাদক, ব্যবসায়ী, কূটনীতিজ্ঞ, গ্রন্থপ্রকাশক এবং দার্শনিক।

তিনি রাজনীতিজগতে আত্মপ্রকাশ করেছেন ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে এবং সেখানেও নানা ঘটনার কেন্দ্রস্থলে তিনি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো বিরাজ করেছেন। ফ্রাঙ্কলিনের কীর্তি এমন বিরাট এবং ঘটনাবহুল যে তার সঠিক বিবরণী দেওয়া প্রায় অসম্ভব। ফ্রাঙ্কলিনের সমকালে তাঁর মতো সৃজনক্ষম মানুষ খুবসম্ভব আর কেউ ছিলেন না।

---

**মাইকেলেঞ্জেলো (Michelangelo)**

সর্বদেশের, সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী ছিলেন মাইকেলেঞ্জেলো। নবজাগরণের (Renaissance) যুগে ফ্লোরেন্স নগরের চিত্রশিল্পীরা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাইকেলেঞ্জেলো ছিলেন এঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইতালির ক্যাপ্রিস্ শহরের তাঁর জন্ম। ১৪৭৫ থেকে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। নিতান্ত শৈশবেই তিনি চিত্রশিল্পী হ'তে মনস্থ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভাও তাঁর ছিলো, আর ছিলো ভাস্কর্যের প্রতি সুগভীর আকর্ষণ ও নিষ্ঠা। মানবদেহের প্রস্তর মূর্তি গড়তে তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিলো। সারাজীবন ধরে মানবদেহের গঠন সম্পর্কে তিনি গবেষণা ক'রে গেছেন। যেটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম শিল্পকর্ম, সেটি হলো: রোমের ভাটিকান শহরে সিস্টিন গীর্জার ভিতরের ছাদের দেওয়ালচিত্র। এখানে প্রজনন বিষয়ে নয়টি ছবি আছে, সাতজন ইহুদী অবতারের চিত্র আছে, আর আছে পাঁচজন পৌরাণিক নারী অবতারের চিত্র।

সিস্টিন গীর্জার উপাসনাঘরের দেওয়ালে তাঁর যে বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকর্মটি খোদিত আছে, সেটি হলো "শেষ বিচার"। তিনি শক্তিমান্ যীশুখৃষ্টের ছবি

এঁকেছেন। তার নিচেই আঁকা হয়েছে খৃষ্টের গৌরবময় উত্থান এবং বেদনাদায়ক পতনের দৃশ্যাবলী।

মাইকেলেঞ্জেলো সেন্ট পিটার্স্ গীর্জার পরিকল্পনায় আত্মনিয়োগ করেন। পোপ-এর অনুরোধে তিনি এই অর্ধসমাপ্ত কাজটির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালের ভাস্করেরা তাঁর পরিকল্পনার অনেক অংশই নির্মমভাবে অবহেলা করেছেন, কিন্তু মাইকেলেঞ্জেলোর মৃত্যুর পর গীর্জার গম্বুজটি তারই পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত হয়েছিল। জীবিতাবস্থায় চিত্রকর হিসাবে তাঁর এত প্রসিদ্ধি ছিল যে, অন্যান্য চিত্রকর ও ভাস্করেরা তার চিত্রনরীতির সরাসরি অনুকরণ করতেন। কিন্তু মাইকেলেঞ্জেলোর মৃত্যুর পর অন্ততঃ দু'শো বছর পর্য্যন্ত নানা কারণে তাঁর সুনাম কথঞ্চিৎ ক্ষুন্ন হয়েছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার নতুন ক'রে তাঁর শিল্পকর্মের মূল্যায়ন করা সুরু হয়। মাইকেলেঞ্জেলোর চিত্রকর্মের মধ্যে কোনো এক যুগে এক বিরাট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। খুব সম্ভব, তাঁর রীতিপরিবর্তনের মূলে ছিলেন অসীম ব্যক্তিত্বের অধিকারী লিওনার্দো দা-ভিঞ্চি। পরবর্তীকালে লিওনার্দো ও মাইকেলেঞ্জেলো দু'টি প্রাচীর নির্মাণের কাজ একই সংগে ক'রে গেছেন।

তাঁর প্রসিদ্ধ ভাস্কর্যকীর্তির মধ্যে যেগুলির বিশেষ নামোল্লেখ প্রয়োজন, সেগুলি হলোঃ

(১) সিষ্টিন গীর্জা,

(২) জুলিয়ান গম্বুজ,

(৩) মেডিসি ও শেষবিচার।

---
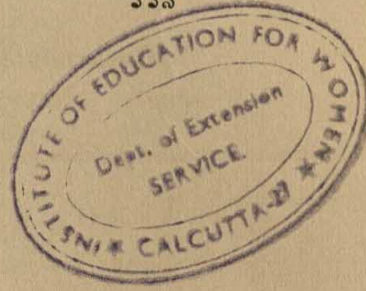
**রাফেল (Raphael)**

ইতালীয় নবজাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ছিলেন রাফেল। ইতালির আর্বিনো (Urbino) শহরে তাঁর জন্ম। ১৪৮৩ সালে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৫২০ খৃষ্টাব্দে। তিনি আম্ব্রিয়াতে চিত্রকর পেরুগিনোর (Perugino) সংগে একত্রে শিক্ষাগ্রহণ করেন। নিতান্ত বাল্যকালেই তৈলচিত্রের জন্যে তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। পেরুগিনোর পরিকল্পনার নিক্তি, তাঁর আলোক-চেতনা, শুদ্ধ রং, মূর্তির সৌষ্ঠব এবং লাবণ্য, ভূভাগ-দৃশ্যের বিশালতা, এই সমস্ত গুণের বিশেষ উন্নতিসাধন করে গেছেন রাফেল। পেরুগিনোর চিত্রধর্ম কখনোই তিনি বিস্মৃত হননি। রাফেলের জীবনের এই যুগটিকে বলা যেতে পারে 'আম্ব্রিয়া যুগ'।

লিওনার্দোর কাছ থেকে তিনি চিত্রের সৌন্দর্য শিক্ষা করেন, মাইকেলেঞ্জেলোর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন মূর্তির শারীরিক গঠনের সৌষ্ঠব। রাফেলের জীবনে এই যুগটির নাম দেওয়া যেতে পারে 'ফ্লোরেণ্টাইন যুগ'। এই সময়ে তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ চিত্রকর্ম "সমাধি" (The entombment) চিত্রণ করেন; তাঁর প্রসিদ্ধ ম্যাডোনাগুলির অধিকাংশই এই সময় নির্মিত হয়।

জীবনের শেষ বারো বছর রোম নগরীতে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্রকর্মগুলি প্রস্তুত করেন। পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস-এর আগ্রহে তিনি ভাটিকান শহরে অনেকগুলি দেওয়ালচিত্র অঙ্কন করেন। এই দেওয়ালচিত্রের মধ্যে আছে বিশ্ববিখ্যাত 'পার্নাসাস' (Parnassus) এবং 'এথেন্সের শিক্ষাকেন্দ্র'।

সমস্ত চিত্রকরদের তুলনায় সারা পৃথিবীতে রাফেলই সবচেয়ে বেশি প্রশংসা পেয়েছেন, তাঁর জনপ্রিয়তাও ছিল অসামান্য; চিত্রজগতের আদর্শস্থানীয় হিসাবে তাঁকেই গণ্য করা হয়। রাফেলের চেতনায় সমগ্র প্রকৃতি বিশেষ ক'রে মানুষ হলো সৌন্দর্য ও শান্তির প্রতীক। তাঁর শেষ মহৎ কীর্তি "খৃষ্টের রূপ পরিবর্তন"

("Transfiguration of Christ") চিত্রটি বর্তমানে রোমনগরীর বোরগীজ গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। এই চিত্রের যে অংশটি রাফেল সম্পূর্ণ ক'রে যেতে পারেননি, সেটি পরিসমাপ্ত করেন রাফেলেরই যোগ্য শিষ্য গুলিয়ো রোমানো (Giulio Romano)। এই চিত্রকর্মে তিনি রাফেলের নাটকীয় ভঙ্গীটি সার্থকভাবে অনুসরণ করে গেছেন।

১৫০৬ খৃষ্টাব্দের শেষ দিকে রাফেল ফ্লোরেন্স শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে তিনি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ চিত্র প্রস্তুত করেন। তিনি এগুলির কাজ অতি নিপুণভাবে সমাপ্ত করেন এবং এদের অধিকাংশই আগাগোড়া তাঁর নিজের হাতের কাজ। রাফেলের প্রতিভা ছিল সর্বতোমুখী; গীর্জার যজ্ঞবেদী চিত্রণের কাজই হোক্, বৃহৎ ঐতিহাসিক দেওয়াল-চিত্রই হোক্ বা পৌরাণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাঁক-জমক পূর্ণ কোনো চিত্রই হোক্, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসামান্য। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সবরকম মূর্তিই তিনি দক্ষতার সংগে গড়তে পারতেন।

রাফেলের উৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্ম হলো "ম্যাডোনা টেম্পি", "কাস্তিগ্লিয়ন-এর ছবি" এবং দেওয়াল-চিত্র "গালাতেয়া"। প্রথমটি রক্ষিত আছে মিউনিকের অন্তর্গত আল্‌তে পিনাকোথেক্ নামক স্থানে, দ্বিতীয়টি আছে পারিসের লুভার-এ, এবং তৃতীয়টি রোমের ফারনেসিয়াতে।

---
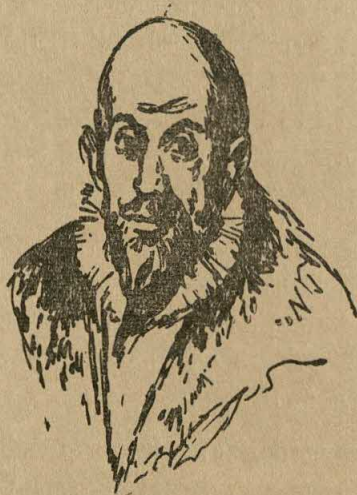
এল্ গ্রেকো (El Greco)

চিত্রজগতের সর্বোত্তম চিত্রকরদের অন্যতম ছিলেন এল্ গ্রেকো। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ক্রীট দ্বীপে তাঁর জন্ম। ১৬১৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ভেনিস শহরে গিয়ে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী টাইটান-এর (Titan) নিকট শিক্ষানবিসি করেন। গ্রেকোর আদর্শস্থানীয় ছিলেন দু'জন ইতালীয় চিত্রকর—কোরেগিয়ো (Correggio) এবং মাইকেলেঞ্জেলো। গ্রেকোর শিল্পকর্ম এই দুই প্রতিভাধরের দ্বারা বিপুলভাবে

প্রভাবিত হয়। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টিকর্মই তিনি স্পেনদেশের মাটিতে বসে গ'ড়ে তুলেছেন। সেইজন্য তাঁর বেশিরভাগ চিত্রই নানাভাবে স্পেনদেশের ধর্মীয় ভাবালুতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছে। তাঁর সমস্ত ছবিতেই দীর্ঘকৃত পাকানো মূর্তির সমাবেশ দেখা যায়। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তির একটি হলো "কাউণ্ট অরগাজ-এর সমাধি"। শিল্পের মাধ্যমে নিজের মনোভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করবার অসীম ক্ষমতা তাঁর ছিলো, আর ছিলো প্রাকৃতিক এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনার মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবার বিরল ক্ষমতা।

এল্ গ্রেকো অনেক ধর্মমূলক চিত্ররচনা করে গেছেন; তাদের একটি হলো "ক্রুশবাহী যীশুখৃষ্ট"। মানবপ্রতিকৃতি রচনা করতে গিয়ে তিনি অনেক সময় শারীরিক গঠনের নির্ভুলতা অগ্রাহ্য করেছেন কিন্তু তিনি প্রতিকৃত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তুলিতে বিধৃত করেছেন নির্ভুলভাবে। তাঁর 'টলেডোর দৃশ্য' নামক ছবিটি ভূভাগ-দৃশ্য সৃষ্টির ইতিহাসে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম বলে পরিগণিত হয়।
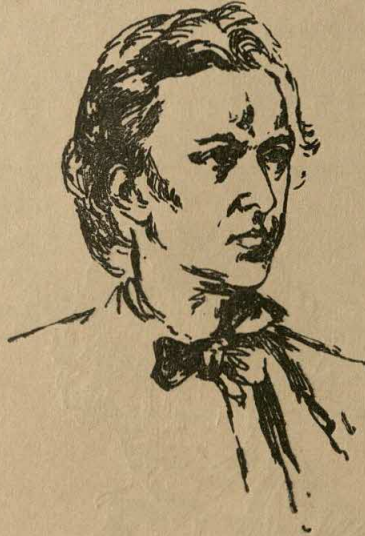
**ফ্রেডারিক সোঁপ্যা (Frederic F. Chopin)**

পোল্যাণ্ডের রাজধানীর ওয়ারশ'র নিকটবর্তী জিলাজোয়া-ওলা নামক স্থানে ১৮১০ খৃষ্টাব্দের বাইশে ফেব্রুয়ারী সোঁপ্যার জন্ম। সোঁপ্যা ছিলেন সুরস্রষ্টা। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩৯ বছর বয়সের তাঁর অমূল্য জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমস্ত পৃথিবীতে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পিয়ানো-বাদকদের মধ্যে তিনি একজন। পিয়ানোবাদ্যের জন্য তিনি দু'শোরও বেশি সুর সৃষ্টি ক'রে গেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম এত উৎকৃষ্ট যে, আজও তিনি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্টা হিসাবে পরিচিত।

সার্থক পিয়ানোবাদনের মধ্যে যে গভীর ভাবের উদ্ভব হয়, সোঁপ্যা সেটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারতেন। মাত্র আট বছর বয়সেই তাঁর জনসমাবেশে পিয়ানো

বাজানোর অভিজ্ঞতা ঘটে এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যেই তিনি সুরসৃষ্টি করতে আরম্ভ করেন। তিনি ওয়ারশ' কনজারভেটারিতে লেখাপড়া সুরু করেন; পরে স্থায়ীভাবে পারিস নগরীতে বসবাস করতে থাকেন। ছাবিবশ বছর বয়সে তিনি পোল্যাণ্ডদেশীয়া এক মহিলার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করেন, কিন্তু পাত্রীর পিতামাতার বাধাদানে সে-বিবাহ সংঘটিত হয়নি। পরে জর্জ স্যাণ্ড (George Sand) নামে এক মহিলা ঔপন্যাসিকের সংগে তিনি বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন এবং উভয়ে একত্রে ভূমধ্যসাগরের মেজরকা দ্বীপে পর্যটন করেন। এমন সময়, দুর্ভাগ্য-বশতঃ সোঁপ্যা যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন এবং সেকারণে তিনি জর্জ স্যাণ্ডের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেখান থেকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য তিনি স্কটল্যাণ্ডে যান, কিন্তু সেখানে আরো অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর ফরাসী বিপ্লবের ঘটনায় তিনি যে মানসিক আঘাত পান, তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

সোঁপ্যার সোনাটা (Sonata) নামক গৎগুলি অতিশয় শ্রুতিমধুর ছিল। কিন্তু যেসব মৌলিক সুর তিনি সৃষ্টি ক'রে গেছেন বা পূর্বসূরীদের যেসব কীর্তি গুলি তিনি সম্পূর্ণায়িত করেছেন, সেগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টিকর্ম। কোনো কোনো লেখকের মতো, সোঁপ্যা ছিলেন পোল্যাণ্ডের একজন দেশপ্রেমিক। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে অন্ততঃ সতেরো বছর পর্যন্ত তিনি পোল্যাণ্ডে পদার্পন করেননি। তাঁর সংগীতগুলির চরিত্র যে-পরিমান ফরাসীদেশীয়, সে-পরিমানই পোল্যাণ্ড দেশীয়। আসল কথা, তাঁর পরিচয় জাতীয়তাবাদী হিসাবে নয়—তিনি ছিলেন সার্থকনামা গীতিকার।

---

**লুডভিগ্ ফান্ বীটোফেন (Ludwig Van Beethoven)**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জার্মান সুরস্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন বীটোফেন। জার্মানীর বন্ শহরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের পনেরোই ডিসেম্বর তারিখে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন অর্গানবাদক। সংসার যাত্রা নির্বাহ করবার জন্য অতি শৈশবেই তাঁকে

পিতার পাশে দাঁড়াতে হয়েছিল। পরে ভিয়েনায় গিয়ে তিনি স্বনামখ্যাত মোৎসার্ট-এর (W. A. Mosart) সংগে সাক্ষাৎ করেন। মোৎসার্ট খুব শীঘ্রই তাঁর অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পান। অল্প কিছু দিন পরে মায়ের অসুস্থতার জন্য তাঁকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। মায়ের মৃত্যুর পর নাবালক ভাইদের রক্ষণাবেক্ষনের ভার বীটোফেনের উপর পড়ে।

বীটোফেন বন্‌শহরেই সংগীত শিক্ষা দিতে সুরু করেন এবং থিয়েটার অর্কেষ্ট্রায় বেহালাবাদকের কাজ নেন। ভিয়েনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করাকালীন তিনি সংগীতজগতের দিক্‌পালদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে থাকেন। পরে, ভিয়েনায় তিনি পিয়ানোবাদক হিসাবে পরিচিত হন এবং প্রভূত যশ অর্জন করেন। মাত্র আঠাশ বছর বয়সে তিনি অনুভব করেন তাঁর শ্রবণশক্তি ক্রমশ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে। তখন বাজানোর চাকরি একেবারে ছেড়ে দিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত সময় সুরসৃষ্টির কাজে নিয়োগ করেন এবং দারিদ্র, ভগ্নস্বাস্থ্য ও আসন্ন বধিরত্ব নিয়ে জীবনসংগ্রামে লিপ্ত থাকেন। বধিরত্বের কারণে নিরন্ধ্র একাকীত্বের মধ্যে তাঁকে দিন কাটাতে হতো—সেই সময়ে শ্রেষ্ঠ সুরসৃষ্টির কাজগুলি তিনি করে গেছেন। মৃত্যুর সময়ে সংগীতের তদানীন্তন দিক্‌পালেরা তাঁর অমূল্য প্রতিভাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দান করেছেন। বীটোফেনের সময়ে রাজা এবং অভিজাতদের অনুগ্রহের আওতা থেকে মুক্ত হয়ে সংগীত ক্রমশঃ জনসমাজে সম্মানের আসন লাভ করেছে।

বীটোফেন নয়টি ঐকতান সংগীত (Symphony) রচনা করেছেন। পিয়ানো এবং অর্কেষ্ট্রার প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন পাঁচটি সংগীত (Concert)। বেহালা ও অর্কেষ্ট্রার মিলিত প্রয়োজনে তিনি কেবলমাত্র একটি সংগীতই সৃষ্টি ক'রে গেছেন। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ বেহালাসংগীত রচয়িতা হিসাবে বীটোফেনের খ্যাতি। তিনি পিয়ানোর জন্য তৈরি করেছেন বত্রিশটি সোনাটা জাতীয় গৎ। অর্কেষ্ট্রা ছাড়াও তিনি অন্যান্য তার-যন্ত্রের চৌপদী রচনার জন্যও বিখ্যাত।

মানসিক ও শারীরিক উভয়দিক থেকেই বীটোফেন ছিলেন লৌহমানব। সংগীতের মাধ্যমে মানুষের মনে সবসময় তিনি সাহস সঞ্চার ক'রে গেছেন।

---

**জোহান সেবাষ্টিয়ান বাখ (Johann Sebastian Bach)**

কালজয়ী সুরস্রষ্টাদের অন্যতম ছিলেন সেবাষ্টিয়ান বাখ। ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু। শুধুমাত্র নিজের সমসাময়িক কালের সংগীতের যাবতীয় ধারাই তিনি আয়ত্ব করেছিলেন তা-ই নয়, ভবিষ্যতের দিকেও তাঁর সমান লক্ষ্য ছিলো। জীবিতকালে সুরস্রষ্টা হিসাবে তিনি যতোটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তার থেকেও বেশি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন অর্গান-বাদক হিসাবে। মৃত্যুর অনেক পরে তাঁর সংগীতরচনাগুলি পণ্ডিতমহলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। জন কয়েক জার্মান সংগীতশিল্পী ও প্রকাশক তাঁর সম্পূর্ণ রচনাবলী প্রকাশ করবার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছেন। বাখের রচনা সমগ্র পৃথিবীতে অভূতপূর্ব সাড়া জাগায় এবং পৃথিবীর বহু দেশেই তাঁর সংগীতকে কেন্দ্র ক'রে স্মারক উৎসবের আয়োজন করা হয়।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দের একুশে মার্চ তারিখে জার্মানীর আইসেনাখ্ শহরে বাখের জন্ম হয়। তাঁদের পরিবারের সকলেই কয়েক পুরুষ ধ'রে ছিলেন সংগীতশিল্পী। বাখের দশবছর বয়সের সময়ে তাঁর পিতামাতার মৃত্যু হয়। তখন থেকে বড়ো দাদার কাছে তিনি লালিত পালিত হন। পনেরো বছর বয়স থেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁকে উপার্জন আরম্ভ করতে হয়। তিনি প্রথমে ছিলেন গায়ক, পরে বেহালাবাদক। যখন সাধারণের মাঝখানে তিনি অর্গানবাদক হিসাবে সুপরিচিত হন, তখন ভাইমারের ডিউকের গৃহে তাঁকে সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। সেই সময়ই তিনি প্রথম অর্গান সম্পর্কিত সংগীত রচনা করেন। একই সময়ে তিনি আন্‌হাল্‌ত্ কোথেনের প্রিন্স লিওপোল্ড-এর সংগীত পরিচালক নিযুক্ত হন। গীর্জায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সাধারণ সংগীতসম্মেলনেও তিনি বহুবার সংগীত পরিচালনা করেছেন।

বাখ দুইবার দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম স্ত্রীর ছিলো সাতটি সন্তান, দ্বিতীয় স্ত্রীর তেরোটি। এই কুড়িটি পুত্রকন্যার জনক ছিলেন সেবাষ্টিয়ান বাখ। বাখের চার পুত্র সুরস্রষ্টা হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন ক'রে গেছেন।

বাখের তিনটি বৃহৎ ধর্মবিষয়ক রচনা আছে। জন্মদিন ও বিবাহ উৎসব উপলক্ষে এবং গীর্জার প্রয়োজনে তিনি তিনশোটি গীতিনাট্য (Cantata) রচনা

করেন। তাঁর অর্কেস্ট্রাবিষয়ক রচনা আছে ছয়টি, বেহালাসম্পর্কিত গীতিরচনা দুইটি, পিয়ানো বাদনের জন্য গীত রচনা করেছেন অসংখ্য। সংগীত বিষয়ে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা এবং কীর্তির বিশালতার কথা স্মরণ ক'রে তাঁকে সংগীতজগতের আদিপুরুষ হিসাবে গণ্য করা হয়।

---

**জোহানেস ব্রাহ্‌ম্‌স্ (Johannes Brahms)**

ব্রাহ্‌ম্‌স্ ছিলেন জার্মান সুর রচয়িতা। যন্ত্রসংগীতে বিশুদ্ধরাগের রোমাণ্টিক সুরস্রষ্টা হিসাবে তিনি উচ্চ সম্মানের আসনে আসীন। যদিও তাঁর সংগীত "ভবিষ্যত যুগের সংগীত"—পন্হীদের প্রধান আক্রমণের স্হল, তবু তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সুরস্রষ্ঠাদের অন্যতম ব'লে বিবেচিত হয়ে থাকেন। একমাত্র যাত্রাগান ছাড়া আর সব ধরনের সংগীতই তিনি সৃষ্টি করে গেছেন।

পিয়ানোর জন্য ব্রাহ্‌ম্‌স্ বহু পদ রচনা করেছেন। তিনি পিয়ানোর দ্বৈত সংগীত, অন্ততঃ দু'শো একক সংগীত, দ্বিপদী ও চৌপদী কন্ঠসংগীত, এবং বহুতর সমবেত সংগীত রচনা করে গেছেন। তাঁর উচ্চাঙ্গের উল্লেখযোগ্য অবদান হলো অন্ততঃ চারটি ঐকতানসংগীত, চারটি কনসার্টো, আত্মার মঙ্গলেচ্ছায় বহুতর স্তবমালা, ইত্যাদি।

ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর একান্ত আবেগপ্রবণ এবং টিউটন-ধর্মী রীতি সর্বসাধারণের রুচিকে সমানভাবে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। তাঁর নাম এবং তাঁর সংগীত আজো পর্য্যন্ত সংগীত মহলে বিতর্ক উত্থাপন করে। কিন্তু, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বারোজন সংগীত রচয়িতার নাম করতে গেলে ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর নামও সেই দলে যোগ করতে হবে। যত দিন যাচ্ছে, ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর জনপ্রিয়তা তত বেশি বেড়েই চলেছে।

জার্মানীর হামবুর্গ শহরে নিতান্ত দরিদ্র ঘরে ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর জন্ম। তাঁর পিতা 'বাস্' বাদ্য বাজাতেন। পিতার কাছেই ব্রাহ্‌ম্‌স্-এর সংগীতশাস্ত্রের হাতেখড়ি।

যখন তাঁর বয়স মাত্র নয় বছর, তখন থেকেই লোকে তাঁকে পিয়ানোর যাদুকর বলে চিনতো। অতি অল্পবয়সেই তিনি সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন এবং সংগীত রচনা করতে থাকেন। পনেরো বছর বয়সেই জনসমাবেশে তাঁকে কনসার্ট বাজাতে দেখা যায়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সের সময় তিনি পিয়ানোর জন্য যে-সমস্ত গান বেঁধে গেছেন, আজো পর্যন্ত সে সব গানের সুর বাজানো হয়।

জীবনের শেষ বিশ বছর যন্ত্রসংগীত বাজনা ছেড়ে দিয়ে ক্রমশঃ তিনি গীত রচনার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকেন। নিজের রচনাগুলি মঞ্চস্থ করবার জন্য তাঁকে ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমন করতে হয়েছে। সর্বত্রই তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা ও অসাধারণ সম্মান লাভ করেছেন।

---
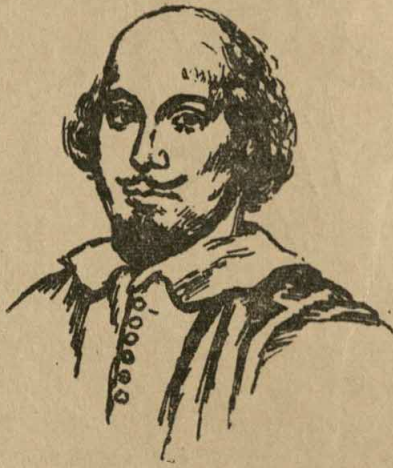
**উইলিয়াম সেক্‌স্‌পীয়ার (William Shakespeare)**

ইংরাজী ভাষায় সুললিত গীতি রচয়িতা সেক্‌স্‌পীয়ার ছিলেন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। সারা পৃথিবীতে এত বেশি দেশে এত বেশি বার আর কারো নাটক মঞ্চস্থ করা হয় নি; এত বেশি অঞ্চলের এত বেশি লোকও আর কারো কবিতা পড়েনি। একমাত্র বাইবেল ছাড়া যেকোনো গ্রন্থের তুলনায় সেক্‌স্‌পীয়ারের রচনাগুলি অধিকতর ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর বিভিন্ন কাব্য ও নাটকের অন্ততঃ পনেরো হাজারটি খণ্ড পৃথিবীর একটি বিখ্যাত পাঠাগারে রক্ষিত আছে। এই পনেরো হাজার গ্রন্থ হলো কেবলমাত্র সেক্‌স্‌পীয়ার লিখিত—সেক্‌স্‌পীয়ার সম্পর্কে বা তাঁর রচনা সম্পর্কে অপরের সমালোচনা গ্রন্থ নয়।

সেক্‌স্‌পীয়ারের রচনাগুলি পাঠ করলে তাঁর একটি অসাধারণ বিশিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রতিভা শুধু বিচিত্রগামী ছিল তাই নয়, সর্বত্রগামী ছিল। বলা যেতে পারে, মানুষের এমন কোনো জ্ঞাতব্য বিষয় নেই, যা তাঁর অজ্ঞাত ছিল। সংগীত, আইন, জাহাজ চালানো, ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান, যুদ্ধবিজ্ঞান, নাট্যমঞ্চ, চিত্র, রাজনীতি, ইতিহাস, মনস্তত্ত্ব, শিকার, সূত্রধরবৃত্তি, পশুপালন এবং ক্রীড়া—

সর্ববিষয়েই তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা ছিল। মানবসভ্যতায় শেক্‌স্‌পীয়ারের যেটি সবচেয়ে বড়ো অবদান সেটি সাধারণত লোকে বিস্মৃত হয়। সেটি হলো এই যে, আজও পর্যন্ত ইংরাজী ভাষার যে কাঠামো আমরা দেখতে পাই, সেটি সরাসরি সেক্‌স্‌পীয়ারের প্রভাবে গঠিত।

শেক্‌স্‌পীয়ারের জন্মভূমি হলো ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-অ্যাভন; লণ্ডন-নগর থেকে আশি মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি গঞ্জ। তাঁর পিতা জন শেক্‌স্‌পীয়ার একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ছিলেন; তাঁর দস্তানা, পশুচর্ম, পশম এবং শস্য-বীজের ব্যবসা ছিল। জন শেক্‌স্‌পীয়ারের আটটি সন্তানের তৃতীয় ছিলেন উইলিয়াম শেক্‌স্‌পীয়ার। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়, মৃত্যু হয় ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দের সাতাশে নভেম্বর তারিখে তিনি অ্যানি হাথ্‌ অ্যাওয়ে নামে এক মহিলাকে বিবাহ করেন। জন্ম থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত তাঁর জীবনকালের সঠিক বিবরণী আজো পর্যন্ত অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

শেক্‌স্‌পীয়ারের সৃজনশীল জীবনকে মোটামুটি চারটি পর্বে ভাগ করা যায়। ১৫৯৪ অথবা ১৫৯৫ সালে অর্থাৎ যেদিন তিনি লণ্ডন শহরে পদার্পন করলেন, বলা যেতে পারে সেদিন থেকেই প্রথম পর্বের সূত্রপাত। সেই যুগটি হলো পরীক্ষার যুগ। দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ ১৬০০ বা ১৬০১ সাল থেকে—এই সময়ে কাব্য ও নাটক উভয় ক্ষেত্রেই লেখক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠার সংকেত পান। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তৃতীয় পর্বের কাল; এই সময়ে হ্যামলেট, ম্যাকবেথ ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকগুলি লেখা হয়। চতুর্থ পর্বের সময়কাল হলো ১৬০৮ থেকে আরম্ভ ক'রে মৃত্যু পর্যন্ত; এই সময়ে তাঁর প্রতিভার তেজ মন্দীভূত হয়ে এসেছে; তাই চতুর্থ পর্বে লিখিত নাটকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম।

---

জন মিলটন (John Milton)

মিলটন ছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি এবং রাজনৈতিক লেখক। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম, মৃত্যু ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হলো 'হৃতস্বর্গ' (Paradise Lost); পৃথিবীর অন্যতম এই মহাকাব্যটি ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থটি এবং আরো দু'টি কাব্য 'পুনরার্জিত স্বর্গ' (Paradise Regained) এবং 'স্যামসন্ অ্যাগনিস্টেস্' (Samson Agonistes) যখন লেখা হয়, সে সময়ে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ।

ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে মিলটন ছিলেন পিউরিটান। ঈশ্বরে তাঁর গভীর ভক্তি ছিলো। বাইবেল ধর্মগ্রন্থটি তিনি সযত্নে পাঠ করেছিলেন এবং নিজের দৃঢ় বিশ্বাস-গুলি তিনি বাইবেলের অনুশাসন অনুসারে গড়ে তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের অধিকারী। সাহিত্য সম্পর্কে তিনি যে নীতি অনুসরণ করতেন, সেটি তাঁরই একটি বিখ্যাত উক্তি থেকে জানতে পারা যায়। তিনি বলতেন, লেখকের নিজের জীবনই হবে একটি "সত্যিকারের কবিতা"। তাঁর ভাষার রীতি ছিলো দৃঢ় ও আড়ম্বরপূর্ণ। তাঁর বিষয় নির্বাচনও ছিলো সুন্দর। প্রেম, রাজনীতি ও ধর্ম,—এই তিনটি বিষয়ে তিনি তাঁর অবিনশ্বর সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করে গেছেন।

কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজের ছাত্র থাকাকালীনই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিলো। যাতে গীর্জার যাজকের কাজে তিনি উপযুক্ত হ'য়ে গড়ে ওঠেন, সেই অনুসারে তাঁর বাল্যশিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিলো। কিন্তু ক্রমশ তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয় যে, "গীর্জা এমন একটি স্থান, যেখানে ধর্মের আবরণে নিষ্ঠুর স্বেচ্ছাচার চালানো যায়।" মিলটনের কাব্য থেকে মানুষ এবং তার নিয়তি সম্পর্কে পরিণতবুদ্ধি মানুষের ধারণাটি জানতে পারা যায়। তাঁর কাব্য আজও পর্যন্ত একজন মহান্ স্রষ্টার বিপুল কীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে।

**অ্যালিঘেরি দান্তে (Alighieri Dante)**

সম্ভবত দান্তে ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর জীবিত কালের পরিধি হলো ১২৬৫ থেকে ১৩২১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। সুন্দরী নারী বিয়াত্রিচে পোর্তিনারির প্রতি গভীর ভালবাসাই তাঁকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো নবজীবন (New life) এবং "স্বর্গীয় মিলন" (Divine comedy)।

দান্তে ইতালীয় সাহিত্যের জনক হিসাবে পণ্ডিতমহলে পরিচিত। তাঁর লেখার রীতি ছিলো স্বচ্ছ ও সরল, তাঁর ভাষা যেমন সুরুচিসম্মত ছিলো, তেমনই ছিলো কাব্যচেতনায় সমৃদ্ধ। চসার ও মিলটনের মতো অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকেরাও নানা ভাবে দান্তের লিখনরীতির অনুকরণ ক'রে গেছেন। কিন্তু পণ্ডিতমহলে দান্তে ছিলেন অপরিচিত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম কবিদের অন্যতম হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।

ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে দান্তের জন্ম। নিতান্ত বাল্যকালেই তিনি পিতামাতাকে হারান। তখন, ব্রুনেতো লাতিনি নামে এক রাজকর্মচারী তাঁর শিক্ষার ভার নেন। পণ্ডিতবর্গের ধারণা, বলোগ্না এবং পাদুয়াতে তিনি দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং ধর্মতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন প্যারিস নগরীতে।

---
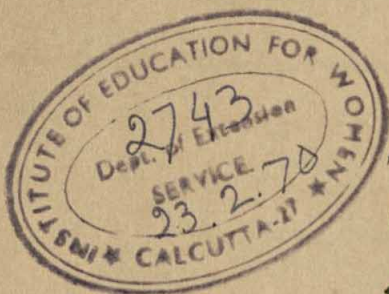
**ওয়াল্ট হুইটম্যান (Walt Whitman)**

হুইটম্যান ছিলেন আমেরিকা মহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ১৮১৯ থেকে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। তিনি কাব্যের মাধ্যমে বহুবার আমেরিকা ও স্বদেশের গণতন্ত্রব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করে গেছেন। ইউরোপের পন্ডিতবর্গের মতে, হুইটম্যানই হলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি।

লংআইল্যান্ডের ওয়েষ্ট হিল্‌স্‌ অঞ্চলে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ৩১শে মে তারিখে তাঁর জন্ম। ব্রুকলিন শহরে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং মাত্র তেরো বছর বয়স থেকে সংবাদপত্র ও ছাপাখানায় তিনি শিক্ষানবিসী সুরু করেন। পরে তিনি ছাপাখানায় টাইপ সাজানোর কাজ করেছেন, কতকগুলি ছোট ছোট সংবাদপত্র-মুদ্রন করেছেন এবং সংগে সংগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজও করেছেন।

১৮৪৮ থেকে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ "লীভ্‌স্‌ অব গ্রাস্‌" (Leaves of grass)-এর প্রস্তুতি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। বইটির আদর্শ পাকাপাকি ভাবে স্থির করবার বহু আগেই তিনি বইটির রচনার অংশ প্রস্তুত করতে আরম্ভ করেছিলেন। এই সময় তিনি কয়েকটি আলোচনা-সভার সক্রিয় সদস্য ছিলেন। থিয়েটার, কনসার্ট, বক্তৃতা এবং রাজনৈতিক সভা সর্বত্রই তাঁর যাতায়াত ছিলো। যে কোনো ধরণের জনসমাবেশ তাঁকে অবিমিশ্র আনন্দদান করতো। যে কারণে জনসমাবেশ সেদিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিলো না—উপস্থিত জনতা সম্পর্কে তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে ঘোড়ার গাড়ি বা ফেরী নৌকায় উঠতেন, গাড়ির চালক, মাঝি এবং যাত্রীসাধারণের সংগে আলাপ করবার উদ্দেশ্যে।

হুইটম্যানের রচনা সমসাময়িককালের কবি, সমালোচক ও ছাত্রদের গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। আমেরিকান আদর্শ যে মহৎ আদর্শ এবং সম্পূর্ণতা ও

স্বাধীনতার আদর্শ,—এ ছিলো তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। সেযুগের সকল আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো যে আমেরিকানরা ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ক্ষেত্রেই এমন একটি মহৎ আদর্শ স্থাপন করবে যেটি এখনো পর্য্যন্ত পৃথিবীর অন্য সব দেশে অজ্ঞাত রয়ে গেছে। হুইটম্যানের মনেও এই বিশ্বাস জাগরূক ছিলো, তাই স্বদেশের প্রতি তাঁর ভালবাসাও কোনোদিন মন্দীভূত হয়নি। মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত ঘরে ঘরে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে যেতে পারেন নি। হুইটম্যান রচিত "লীভ্‌স্ অব গ্রাস্" যে একটি অসামান্য যুগোত্তর সাহিত্য কীর্তি, এ বিষয়ে আজ আর পৃথিবীর কারো মনে কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই।

---

## জোহান ভোল্‌ফ্‌গাং ফন্ গ্যেটে (Johann Wolfgang Von Goethe)

জার্মানীর লেখক কবিকুলের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন গ্যেটে। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রাংকফুর্ট-অন-মেন প্রদেশে তাঁর জন্ম। গ্যেটের মৃত্যু হয় ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে। পাশ্চাত্যের সাহিত্যজগতে গ্যেটের কল্পনাশক্তি এবং তাঁর প্রতিভার বহুমুখিতার কোনো তুলনা নেই। গ্যেটের পিতা ছিলেন বিত্তশালী একজন বিচারক। তাঁর যোগ্যতাও ছিলো প্রচুর, যশও ততোধিক। ফ্রাংকফুর্টের পৌরপালের কন্যা ছিলেন গ্যেটের মাতা। আইন পড়বার জন্য গ্যেটেকে পাঠানো হয় লাইপ্‌ৎসিগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ে; কিন্তু আইনের প্রতি তাঁর বিশেষ মনোযোগ ছিলো না। কাব্য, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ ছিলো। আইন বিষয়ে ডিগ্রি অর্জন ক'রে তিনি ফ্রাংকফুর্ট শহরে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন; কিন্তু একাজে তাঁর কোনো উৎসাহ ছিলো না। অবশেষে ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে তিনি একটি বিয়োগান্ত নাটক রচনা করলেন; নাটকটির নাম "গট্‌স্ ফন্ বার্লিসিংগেন" (Gotz von Berlichingen)। মাত্র একবছর পরে, ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে তিনি "দি সরোজ্ অব ইয়ং ভেয়ার্দার" (The sorrows of young werther) নামে একটি উপন্যাস লিখলেন। এই দুইটি রচনা মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তাঁকে খ্যাতির শিখরে তুলে দিলো। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট এই বঞ্চিত ভালবাসার কাহিনী বহুবার পাঠ করেছেন। এই কাহিনী নেপোলিয়নকে এমন মুগ্ধ করেছিলো যে, তিনি গ্যেটের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন।

কার্ল অগাষ্টের আমন্ত্রণে গ্যেটে একটি দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদ গ্রহণ করেন এবং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এরপর দীর্ঘ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে তিনি ইটালি যান। ইটালি থেকে প্রত্যাবর্তন ক'রে তিনি সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে সাহিত্যরচনায় এবং প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যয়নে নিজেকে গভীরভাবে নিয়োজিত করেন।

জার্মানীর বাইরে নাট্যকারের হিসাবে গ্যেটের বিপুল খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁরই লেখা বিখ্যাত নাটক "ফাউষ্ট" (Faust)। এই বিয়োগান্ত নাটকটি লিখতে তিনি ষাট বছর ধ'রে অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন। নরক ও স্বর্গের উদ্দেশ্যে মানুষের দুঃখময় পদযাত্রা এই হলো ফাউষ্ট-এর বিষয়বস্তু। কখনো শয়তান (Devil) মানুষের সংগী হিসাবে রয়েছে, কিন্তু পরিশেষে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তাঁর শেষ যাত্রা। এই নাটকটি জার্মান সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। গ্যেটে আরো অনেক নাটক লিখে গেছেন; আজও পর্যন্ত জার্মান রঙ্গমঞ্চে তাঁর লেখা নাটকগুলি অভিনয় করা হয়। গ্যেটে এমন কতকগুলি কবিতা রচনা ক'রে গেছেন পৃথিবীর কোনো সাহিত্যেই যার কোনো তুলনা নেই। কবি হিসাবে আর কেউ বোধহয় তাঁকে অতিক্রম করতে পারেন নি।

---

## পি এম ডিরাক (P. M. Dirac)

ডিরাক হলেন একজন স্বনামধন্য ইংরাজ পদার্থবিদ। বিজ্ঞান জগতে তাঁর সবিশেষ পরিচিতির মূলে রয়েছে তখনও অনাবিস্কৃত পজিট্রনের (Positron) অস্তিত্ব সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী এবং তৎসংক্রান্ত তত্ত্ব। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিসটল সহরে। স্রোয়োডিঙ্গারের সংগে মিলিত ভাবে তিনি "তরঙ্গ বলবিদ্যা" (Wave mechanics) সৃষ্টি করেন। "রূপান্তর তত্ত্ব" (Transformation theory) সৃষ্টি ক'রে কোয়াণ্টাম মেকানিকসে তিনি নতুন দিগন্ত রচনা করেন। "প্রিন্সিপ্ল্ অফ কোয়াণ্টাম মেকানিকস্" (Principle of Quantum mechanics) নামে তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে। "ফের্মি-ডিরাক পরিসংখ্যান্ (Fermi Dirac statistics)-এর তিনি যুগ্ম আবিষ্কর্তা। বিকিরণের "কোয়াণ্টাম তত্ত্বের" প্রবর্তকও তিনি। তিনি ইলেকট্রন সম্পর্কিত যে "কোয়াণ্টাম তত্ত্ব" সৃষ্টি করেন তার সাহায্যে ব্যতিক্রান্ত "ম্যাগনেটিক" মোমেণ্ট, ঘূর্ণন প্রভৃতি ইলেকট্রন সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য অবগত হওয়া গেছে। ডিরাকের মতে, শক্তির বিভিন্ন অবস্থায় ইলেকট্রনের অভাব ধনাত্মক বস্তুকণারই নামান্তর মাত্র। এবং এই ধনাত্মক বস্তুকণাগুলি খুবই ক্ষণস্থায়ী। কার্ল এ্যাণ্ডারসন (Carl Aderson) কর্তৃক পজিট্রন আবিষ্কার ডিরাকের এই ধারণাকেই সমর্থন করে।

---

## নিকোলা তেস্‌লা (Nicola Tesla)

পৃথিবীর প্রথম তড়িৎ-বিষয়ক যন্ত্রবিদ্‌ (Engineer) ছিলেন তেস্‌লা—পরিবর্তী তড়িৎ আবেশ মোটর (Alternating current induction motor) আবিষ্কারের কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন তিনি। তেস্‌লার জন্মভূমি যুগোশ্লাভিয়া। ১৮৫৬ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। প্রাগ্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ ক'রে তিনি পদার্থবিদ্যা, গণিত এবং তড়িৎবিজ্ঞানে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপন ক'রে তিনি সরকারের অধীনে টেলিগ্রাফ-যন্ত্রবিদ্‌ হিসাবে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। পরে তিনি বুদাপেস্ত এবং প্যারিস নগরীতে তড়িৎ-বিষয়ক যন্ত্রবিদ্‌ হিসাবে কাজ করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়ে তিনি নিউজার্সির অরেঞ্জ শহরে অবস্থিত টমাস এডিসনের ল্যাবরেটারিতে গবেষণা সুরু করেন। তড়িৎবিষয়ক ক্ষেত্রে নানা উন্নয়নমূলক কাজে তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। অবশেষে নিউইয়র্ক নগরে তিনি তেসলা ল্যাবরেটারি প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই প্রথম পরিবর্তী তড়িৎ আবেশ মোটর আবিস্কৃত হয়। তেস্‌লা তাঁর মোটরের পরিকল্পনাটি জর্জ ওয়েষ্টিংহাউস্‌-এর নিকট বিক্রয় করেন; তিনি এই মোটর কারখানায় প্রস্তুত করেন এবং বাজারে প্রেরণ করেন। তেস্‌লা চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ঘূর্ণ চৌম্বক ক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা ক'রে গেছেন। তেসলা নতুন ধরনের ডাইনামো, ট্রান্সফর্মার, আবেশ কুণ্ডলী (Induction coils), শীতক যন্ত্র (Condenser), ভাস্বর আলোকবর্তিকা ইত্যাদি নানা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা করে গেছেন।

তেস্‌লা এমন একটি বৈদ্যুতিক জেনারেটার প্রস্তুত করেছিলেন যাতে তড়িৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রকে কাজে লাগানো হয়েছে। অবশ্য, এ যন্ত্রটি বিরাটকায়—কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারের অযোগ্য। সমসাময়িক কালে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ তড়িৎ বিষয়ক যন্ত্রবিদ্‌ এবং আবিষ্কারক।

---